রহস্যভেদী বাসব

(প্রথম খণ্ড)

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৩৫২

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : পার্থ চ্যাটার্জী : জুপিটার প্রিণ্টার্স

৫৫, মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা-৭০০০০৯

আমার স্নেহের কেন্দ্রবিন্দু—

গঙ্গা ও রঙ্গা

দীর্ঘজীবাষু

—: আমাদের প্রকাশিত লেখকের বই :—

রহস্যভেদী বাসব (২য় খণ্ড)

রহস্যভেদী বাসব (৩য় খণ্ড)

এখানে শ্বাপদ

মোমের আলোয় দেখা

লিঙ্কনের শেষ বিচার

মরণ দোলায় দোলা

পূর্বাভাষ

যখন আমরা গাছের ছাল পরে লজ্জা নিবারণ করতাম বা লজ্জা নিবারণের কোন প্রয়োজনই পড়ত না পশুর কাঁচা মাংসই যখন ছিল আমাদের প্রধান খাদ্য, সেই আদিম কালকে আমরা অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। ধাপে ধাপে এগিয়ে পৃথিবী আজ সভ্যতার আলোয় ঝলমল করছে। তবু একটা প্রশ্ন থেকেই গেছে, আমরা কি সত্যি পরিপূর্ণ সভ্য হয়ে উঠতে পেরেছি ?

একটি শব্দেই এই প্রশ্নের উত্তর—না। স্বীকার করতেই হবে, ভব্য বেশ আর সভ্য ব্যবহারের আড়ালে এখনও আমাদের মনের মধ্যে সে আদিম প্রবৃত্তি ধক ধক করে জ্বলছে। সামান্যতম স্বার্থের হানি ঘটলেই আমরা আমাদের প্রাগৈতিহাসিক রূপ প্রকাশ করে ফেলি। তবে সব সময় সোজাসুজি রক্তাক্ত ঘটনায় যাই না। ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে হয়, অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয়, কারণ আমরা সভ্য, আমরা বিংশ শতাব্দীতে বাস করি।

বাসবকে আপনারা চেনেন। অনেক শিহরণ জাগানো ঘটনার উপর সে বারংবার যবনিকা ফেলেছে। আপনারা—যাঁরা সুবুদ্ধি সম্পন্ন, তাঁদের মনে এনে দিয়েছে পরম স্বস্তি। এই আখ্যায়িকায় বাসবের কর্মতৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আপনারা আবার পাবেন। এখনও যারা আদিম হিংস্রতার মনোভাব নিয়ে, সভ্যতার কৌটিন্যে নিজেদের মুড়ে যে সমস্ত রক্তাক্ত ঘটনার অবতারণা করেছিল, তার মূলচ্ছেদ করা একমাত্র বোধহয় বাসবের পক্ষেই সম্ভব।

বিনীত—

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

ঃ সূচী ঃ

বিবস্ত্র মানব

হাল্কা চাঁদের আলোয় চারধার ঝাপসা হয়ে রয়েছে।

স্পাইরেলের সিঁড়ি বেয়ে সতর্কতার সঙ্গে ধীরে ধীরে নেমে এল তরুণ।

রাত্রি বেশ গভীর হয়েছে। এই বিরাট কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়িটার মধ্যে ঢোকা একরকম অসম্ভব বলেই ধরে নিয়েছিল ও। এখানে ঢোকার প্রধান পথ, কলাপ-সিবিল গেটটা বন্ধ হয়ে গেছে আগেই। অথচ আজ এই বাড়িতে ওর না ঢুকলেই নয়।

বেহালার শেষ প্রান্তে প্রায় এক বিঘা জমির উপর এই 'মিত্রভিলা'।

একসময় ধনশালী মিত্ররা বিলাসের সমুদ্রে অবগাহন করেছেন এই বাড়িতে। মূল্যবান ঝাড়লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলো আর নূপুরের নিক্কনে তখন সর্বদা মুখর থেকেছে মিত্রভিলা। অথচ—কে বিশ্বাস করবে আজকের নিস্তব্ধ বাড়িটা দেখে সেদিনের কথা। কালক্রমে মিত্রদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। থেমে গেছে নূপুরের নিক্কন। একে একে নিভে গেছে ঝাড়-লণ্ঠনগুলো।

তারপর—

তারপর: 'মিত্রভিলা' কলকাতার বাড়িভাড়ার সমস্যায় কিছুটা সহযোগিতা করবার জন্য এগিয়ে এসেছে। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থান এবাড়িতে হয়নি। এখানে বাসা বাঁধলেন সমাজের উচ্চবিত্তের মানুষেরা। এঁদের মধ্যে কেউ পদস্থ কর্মচারি, কেউ নামকরা ডাক্তার, কেউ ব্যবসাদার আবার কেউ বা চিত্রপরিচালক।

তরুণ সন্ধ্যাবেলায় একবার এখানে এসেছিল। কলাপসিবিল গেট তখন স্বাভাবিক ভাবেই খোলা ছিল। এমন কি ডাঃ হীরালাল নিজের ফ্ল্যাটেই ছিলেন, তবুও দেখা করতে পারেনি। বারান্দায় পা দেবার পরই সুরের মূর্ছনা ওকে সচকিত করে তুলেছিল। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে দরজার আধ ভেজান পাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখল, একটি মেয়ে গান গাইছে আর তাকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে বসে আছেন কয়েকব্যক্তি। সকলকে চেনা গেল না। এখান থেকে সকলের পিছন দিকটাই দেখা যাচ্ছে। তবে ডাঃ হীরালালকে চিনতে অসুবিধা হয় না।

মেয়েটিকেও তরুণ চিনতে পারছে। কয়েকবারই দেখেছে এখানে—দুলারী বাঈ। রসিক-সমাজে মীর্জাপুরী দুলারী বাঈ-এর কণ্ঠ ও দেহ বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। হীরালালের মত সুখ্যাত চিকিৎসকের প্রকাশ্যে বারবধূ নিয়ে নট ঘট করাটা ঠিক নয়। এতে তাঁর সুনাম কিছু ক্ষুন্ন হচ্ছে বলাবাহুল্য। সকলে তন্ময় হয়ে গান শুনছেন। তরুণ বুঝল এখন ডাক্তারকে একা পাওয়া যাবে না। একা পেতে হলে আসতে হবে গভীর রাত্রেই।

গভীর রাত্রেই এসেছে।

মিত্রভিলার পিছন দিকের বাউন্ডারি-ওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট

দেবদারু গাছ। তার বিস্তর ডালপালা পাঁচিলের ভিতর দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তরুণ সেই গাছটাকে অবলম্বন করে দোতলায় এসে নেমেছে। তারপর দেওয়ালের সঙ্গে প্রায় নিজেকে মিশিয়ে কার্নিশের উপর সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে স্পাইরেলের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সিঁড়ি পেয়ে যাবার পর একতলায় নামতে অবশ্য কোন কষ্ট হয়নি।

প্রেতপুরীর মত বাড়িটা নিস্তব্ধ, নিঝুম।

পকেট থেকে রুমাল বার করে তরুণ মুখ মুছে নিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুণ এই শীতেও ঘেমে উঠেছে। মনে মনে আন্দাজ করে নিল ওকে এবার বাড়ির কোন ধারে যেতে হবে।

একটা জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। কাচের জানলা ধাক্কা মেরে দেখল, বন্ধ ভিতর থেকে।

ও সতর্কতার সঙ্গে চারিধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তারপর পকেট থেকে একটা ভোজালি বার করে আনল। সংযত হাতে অস্ত্রটার বাঁট দিয়ে আঘাত করল জানলার কাচের উপর, সঙ্গে সঙ্গে অল্প একটু শব্দ তুলে কাচের কিছু অংশ ভেঙ্গে গেল। কারুর ঘুম ভেঙ্গে গেল নাকি?

তরুণ রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল। আগেকার মতই চারিধার চুপচাপ। শুধু ঝিল্লির ঐক্যরব একটানা রাতের নিস্তব্ধতায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে চলছে।

তরুণ আরামের নিশ্বাস ফেলে। কারুর কানে যায়নি শব্দটা তাহলে।

ভাঙ্গা জানলার ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ও পাল্লাটা খুলে ফেলল। গরাদহীন জানলা টপকে ঘরের মধ্যে এল তারপর।

ছোট ঘরখানা।

ঘরখানা তরুণের অপরিচিত নয়। কয়েকবার এসেছে। কাজেই অভ্যস্ত পায়ে ঘরের বাইরে এল। করিডর পেরিয়ে আরেকটা ঘরের মধ্যে গেল—বেডরুম ল্যাম্প জ্বলছে সেখানে। সেই অল্প আলোতেই বেশ বুঝতে পারা যায়, কোন অর্থশালী লোকের শয়নকক্ষ এটি।

বিছানার দিকে তাকাল। কেউ নেই।

নিভাঁজ শয্যা।

তরুণের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

ঘরের অন্যপ্রান্তে দৃষ্টি ফেরাল। কিন্তু ওকি·· ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল ও। স্তিমিত আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ওয়ার্ডরোবের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা দেহ। রক্তাক্ত বীভৎস দেহটা।

তরুণ আর একচুল নড়তে পারল না। নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে এই মর্মন্তুদ দৃশ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। মিনিট কয়েক এইভাবে কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ ওর সম্বিৎ ফিরে এল। ব্যাকুল ভাবে চিন্তার আশ্রয় নিল—এখন ওর কি কর্তব্য।

না—আর এক মুহূর্ত এখানে থাকবে না। তরুণ দরজার দিকে দ্রুত সরে এল

বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু বেরিয়ে আসা আর হল না। ঠিক দরজার সামনে পিছন থেকে কে ওর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল। চিৎকার করবার কণামাত্র অবকাশ পেল না—টলে মাটিতে পড়ে গেল ও।

ঘরখানা ভাল করে পরীক্ষা করবার পর মুখ তুললেন অমিতাভ গাঙ্গুলী।

স্থানীয় থানার তিনিই ও. সি।

বিজ্ঞ অফিসার হিসাবে তাঁর সুনাম আছে। চেহারা দেখলেই আঁচ পাওয়া যায়, সবসময় একটা কিছু করবার উৎসাহ তাঁর রয়েছে।

তখনও রক্তাক্ত মৃতদেহটা ওয়ার্ডরোবের কাছে পড়ে রয়েছে।

মুখ তুলেই ইন্সপেক্টর ফটোগ্রাফারের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি ছবিগুলো তুলে নাও, তপন। বেলা বাড়ছে, বডি পোস্টমর্টমে পাঠাতে হবে।

ফটোগ্রাফার তপন মজুমদার আর কালবিলম্ব না করে পর পর গোটা কয়েক স্ন্যাপ নিল মৃতদেহের। নানা অ্যাঙ্গেল থেকে ঘরেরও কয়েকখানা ছবি তুলল।

অমিতাভ গাঙ্গুলী মৃতদেহের দিকে আর তাকালেন না।

বহু খুনের তদন্ত তাঁর হাতে এসেছে, তবে এরকম বীভৎস হত্যা তিনি এর আগে আর দেখেননি। হত্যাকারী নির্মমভাবে তলপেটের কিছু অংশ কেটে বার করে নিয়েছে মৃতের শরীর থেকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ইন্সপেক্টর।

বারান্দায় তখন মিত্রভিলার অন্যান্য বাসিন্দারা উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মৃত ব্যক্তির পরিচয় অবশ্য অমিতাভ গাঙ্গুলীর অজানা নয়। এ অঞ্চলের বিখ্যাত চিকিৎসক হীরালাল আম্বাণ্ট। ভদ্রলোক অবাঙ্গালী ছিলেন। অর্থবান, ভদ্র এবং অমায়িক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল।

ইন্সপেক্টরকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।

বললেন, কি হল ইন্সপেক্টর? লোকটির জ্ঞান ফিরে এসেছে।

—কোন লোকটির?

—মৃতদেহের কাছে যে লোকটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে তার কথা বলছি।

—না, এখনও জ্ঞান ফেরেনি।

ভদ্রলোক বললেন, কি অদ্ভুত ব্যাপার। এই ফ্ল্যাট বাড়িতে যে এরকম একটা কাণ্ড ঘটতে পারে কল্পনাই করা যায় না। তারপর ডাঃ হীরালালের মত লোক—শেষ পর্যন্ত তিনি—

ইন্সপেক্টর তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, আপনিই কি থানায় ফোন করেছিলেন?

—হ্যাঁ।

আপনি কোন তলায় থাকেন?

—আমি হীরালালের পাশের ফ্ল্যাটে থাকি।

—আপনি খুনের কথা জানতে পারলেন কিভাবে?

—আজ সকালে বেড়াতে বেরুচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়ল ডাক্তারের ফ্ল্যাটের সামনে-

কার দরজাটা হাট করে খোলা।

—তারপর ?

— আমি অবাক হলাম।

—এতে অবাক হবার কি আছে।

—অবাক হবার যথেষ্ট কারণ আছে। ডাক্তার অত্যন্ত সাবধানী লোক—এভাবে দরজা খোলা রাখবার লোক তিনি নন। অবাক হয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারতেই দেখলাম রক্তাপ্লুত অবস্থায় একধারে পড়ে আছেন ডাঃ হীরালাল, আর তাঁরই কিছু দূরে একটা লোক অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে।

—তারপর আপনি কি করলেন ?

—আমি প্রথমে ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। তারপর কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ফোন করলাম থানায়।

ভদ্রলোক এক টিপ নস্যি নাকে দিলেন।

ইন্সপেক্টর গাঙ্গুলী আনমনে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

তারপর আবার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে অমিতাভ বললেন, আপনি কিভাবে স্থিরনিশ্চিত হলেন দ্বিতীয় লোকটি মারা যায়নি, শুধু অজ্ঞান হয়ে গেছে ?

—না .. মানে ...আমার মনে হল। থতমত খেয়ে ভদ্রলোক কোন রকমে নিজের কথাটা শেষ করলেন।

— কিন্তু মনে হওয়ার একটা সঙ্গত কারণ থাকা চাই ত।

— আমার কেমন মনে হল।

— হুঁ। আপনার নাম কিন্তু এখনও জানতে পারিনি আমি ?

—মলয় গাঙ্গুলী।

— কি করেন আপনি ?

—স্টুয়ার্ট অ্যান্ড মর্গানে কাজ করি।

— গোটাকতক প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে চাই।

এক টিপ নস্যি নিয়ে মলয় গাঙ্গুলী বললেন, নিশ্চয়ই। বলুন - ?

— কাল রাত্রে কোনরকম শব্দটব্দ পেয়েছিলেন ?

—না। তাছাড়া আমার ঘুম একটু গাঢ়।

ও। যে লোকটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, তাকে কখনও আগে দেখেছেন ?

একটু চিন্তা করে মলয় গাঙ্গুলী বললেন, মনে হচ্ছে যেন আগেও দেখেছি লোকটাকে।

— কোথায় ?

— কোথায় ঠিক—

—ভেবে বলুন কোথায় দেখেছেন ?

হ্যাঁ—হ্যাঁ মনে পড়েছে, ডাঃ হীরালালের চেম্বারেই দেখেছি কদিন আগে।

— ডাক্তারের সঙ্গে উত্তেজিত গলায় কথা কইছিল।

—আর আপনি—ইন্সপেক্টর বললেন, আপনি সে সময় ওখানে কি করছিলেন ?

রয়ে

—আমার শরীর ভাল ছিল না ঔষধ আনতে গিয়েছিলাম।

—ডাঃ আম্বাণ্টের ফ্ল্যাটে আর কাউকে দেখছি না ত?

গাঙ্গুলী বললেন, আমি যতদূর জানি ওঁর আত্মীয় বলতে কেউ নেই। তবে ওঁর একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে এই ফ্ল্যাটে থাকতে দেখেছি। তাছাড়া ঠিকে চাকর আছে একটা। সেই সমস্ত কাজকর্ম রান্নাবান্না করে দিয়ে যায়।

—কিন্তু তাঁর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট গেল কোথায়?

মলয় গাঙ্গুলী অবশ্য এর কোন উত্তর দিলেন না। এই সময় অ্যাম্বুলেন্সের লাকেরা মৃতদেহ বয়ে নিয়ে গেল! ইন্সপেক্টর আবার কথার খেই ধরলেন।

—অ্যাসিস্ট্যাণ্টের নাম বলতে পারেন?

যতদূর মনে পড়ছে প্রদ্যোত হালদার।

—ওয়েল মিঃ গাঙ্গুলী, আপনি তো হীরালালবাবুর সঙ্গে একই বাড়িতে অনেকদিন ধরে বাস করছেন—বলতে পারেন, তাঁর কোন শত্রু ছিল কিনা?

—না। তিনি এত ভাল লোক ছিলেন যে কারুর পক্ষে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

—আচ্ছা, গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে বিশেষ কেউ কি দেখা করতে এসেছিল? আপনি এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?

মলয় গাঙ্গুলীর মুখে বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল।

—আপনি আমাকে বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করেছেন ইন্সপেক্টর। ডাঃ হীরালালের কাছে বিশেষ ব্যক্তি কে তা কি আমার পক্ষে জানা সম্ভব।

—গত সন্ধ্যায় তাহলে তাঁর কাছে কেউ আসেননি?

—কে ঠিক এসেছিল জানি না। তবে নিজের ঘরে বসেই গান শুনতে পাচ্ছিলাম। কাজেই না দেখেই বলতে পারি দুলারী বাঈ এসেছিল।

—ঠিক ধরেছেন। ওই দোষটুকু ছাড়া ডাঃ হীরালালের সব ভাল ছিল।

এরপর ইন্সপেক্টর বাড়ির অন্যান্য সকলকে কিছু কিছু প্রশ্ন করলেন। কিন্তু নতুন কোন তথ্য সংগ্রহ করা গেল না। সকলেই ডাঃ হীরালালের অমায়িক স্বভাবের প্রশংসা করলেন, অজ্ঞান লোকটির বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং ডাঃ হীরালালের সহকারীর অন্তর্ধানের বিষয় কিছুই বলতে পারলেন না।

সকলকে বিদায় দিয়ে ইন্সপেক্টর গাঙ্গুলী আবার ফিরে এলেন ডাঃ হীরালালের শয়নকক্ষে। বিয়োগান্ত নাটকের নীরব সাক্ষী হয়ে ঘরের প্রতিটি আসবাব দাঁড়িয়ে রয়েছে। চিন্তাকুল মনেই অমিতাভ গাঙ্গুলী চারিদিক ভাল করে দেখে নিলেন। এগিয়ে টেবিলের দেরাজটা টানলেন, খুলে গেল। চেকবুক, ডায়েরী, হিসাবের খাতা ইত্যাদি রয়েছে সেখানে। ডায়েরীটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখলেন।

টেবিলের উপর রাখা রয়েছে সোনার ব্যাণ্ড যুক্ত রোলেক্স ঘড়ি। টেবিলের হাত কয়েক দূরেই দেওয়াল ঘেঁসে রয়েছে আলনা। সার্ট, পাঞ্জাবি, ট্রাউজার ইত্যাদি ঝুলছে। পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম লাগান। ইন্সপেক্টর পকেট হাতড়ে দেখলেন খানকয়েক দশ টাকার নোট রয়েছে। ওয়ার্ডরোবের হ্যাণ্ডেলটা টানতেই

বুঝতে পারা গেল, চাবি লাগান।

এতক্ষণে একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন ইন্সপেক্টর।

হত্যা চুরি করার উদ্দেশ্যে হয়নি। তাহ'লে ঘড়ি ও বোতাম থাকত না। রোবের পাল্লা ভেঙ্গে ঝুলতে থাকত এক পাশে। অবশ্য অজ্ঞান অবস্থায় প..ড় থাকা লোকটির সম্পর্কেও নিশ্চিত না হলেও মোটামুটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। এ লোকটি বোধহয় হত্যাকারী নয়। কারণ হত্যা করার পরে হত্যাকারী নিশ্চিন্ত-ভাবে ওখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে না। তবে এই রক্তাক্ত ব্যাপারের সঙ্গে ওই লোকটির কিছু না কিছু সম্বন্ধ যে আছে তাতে সন্দেহ নেই।

ঘর থেকে অমিতাভ বেরিয়ে এলেন। আর এখানে থেকে লাভ কি? ঘরে তালা লাগিয়ে শীল করলেন। তারপর সেখানে একজন কনস্টেবল মোতায়েন করে থানায় ফিরে গেলেন। তবে ফেরার আগে মিত্রভিলার বোর্ডারদের সতর্ক করে এলেন, পুলিসের অনুমতি ছাড়া এখন কেউ যেন কলকাতার বাইরে পা না দেন।

ঘণ্টাখানেক হল তরুণের জ্ঞান ফিরেছে।

হাসপাতালের বেডে আচ্ছন্নের মত পড়ে রয়েছে ও। মাথার পিছন দিকটা এখনও টনটন করছে। কেটে গিয়েছিল, মাথা ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হয়েছে। ওর একে একে মনে পড়ে যাচ্ছে সমস্ত ঘটনা। ডাঃ হীরালাল নিষ্ঠুরভাবে নিহত বলে তরুণ বিন্দুমাত্র দুঃখিত নয়, বরং ডাক্তারের আরো শত্রু ছিল বুঝতে পেরে অত্যন্ত আশ্চর্য হচ্ছে।

ইন্সপেক্টর গাঙ্গুলী ওর বেডের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন, কেমন আছেন?

মাথায় ব্যথা তো ছিলই। এবার কেমন ঝিমঝিম ভাব এল। পরীক্ষা আরম্ভ হচ্ছে। একটা উৎকণ্ঠা ওকে সাপটে ধরল। পুলিস কি ওকে চিহ্নিত করেছে?

শ্রান্ত গলায় বলল, ভালই।

—আমি আপনাকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে অ-..

—না। বলুন?

—আপনার নাম?

—তরুণ মুখার্জী।

—আপনাকে দেখে শিক্ষিত লোক বলে মনে হচ্ছে। আপনি কি—

—আমি পাটনা ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট।

—কলকাতাতেই থাকেন? কোন কাজটাজ করেন বোধহয়।

এই সময় একজন অমিতাভকে টুল দিয়ে গেল।

তিনি বসলেন।

আমি ভাগলপুরে থাকি। কাজ করি ওখানেই। কয়েকদিন হল এখানে এসেছি।

— আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আপনার বিরুদ্ধে কত গুরুতর অভিযোগ

রয়েছে ?

অভিযোগ ! তরুণ বিস্ময়ের ভান করে।

ইন্সপেক্টর নড়েচড়ে বসলেন।

—ডোণ্ট বি সিলি, মিঃ মুখার্জী। ওয়েল, আপনি যদি নেহাতই বুঝতে না পেরে থাকেন তাহলে শুনুন, 'মিত্রভিলা'র হীরালালকে হত্যা করার অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটা পুলিস হসপিটাল।

—হত্যার অপরাধ ! এবার সত্যি তরুণ ভেঙ্গে পড়ল।

—আপনি নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না ঘটনাস্থলে আপনার উপস্থিতি ? ওই উপস্থিতিই হল আপনার বিরুদ্ধে প্রধান এভিডেন্স। যে রক্তমাখা ভোজালিটা ওখানে পাওয়া গেছে—তার বাঁটের উপর বোধহয় আপনারই হাতের ছাপ। সুতরাং—

—ভোজালিটা অবশ্য আমারই। বিশ্বাস করুন, খুন সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। আমার পক্ষে কখনই জানা সম্ভব নয়। ওর গলা দিয়ে একরাশ মিনতি ঝরে পড়ল।

—আপনি তাহলে ওখানে গিয়েছিলেন কেন ?

—আমি ...মানে ...

—বলুন—বলুন—কেন গিয়েছিলেন ওখানে ?

—আমি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাঁর সঙ্গে।

—মাঝরাত্রে ? ভোজালি সঙ্গে নিয়ে—?

—আমি আপনাকে কিভাবে বোঝাব, ইন্সপেক্টর। ওখানে গিয়েছিলাম ঠিকই,

—কে ‹.

কাজেই না দেখেছ গাঙ্গুলী।

—ঠিক ধরেছেন ঝাবার চেষ্টা করলে নিশ্চয় বুঝব। বলুন, আমাকে

রে ঘামছিল। তার জীবনে এরকম দুর্বিপাক আসবে কখনও ভেবেছিল কি : অবৃ পুলিসের সন্দেহকে দোষ দেওয়া চলে না। আসল কথাটা বলে দেওয়াই ভাল। কিন্তু তার কথা কি পুলিস বিশ্বাস করবে ? কয়েকবার ঢোক গিলেও, প্রথমে সন্ধ্যাবেলা এবং মাঝরাত্রে 'মিত্রভিলা'য় ঢোকা থেকে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত বলল এবার।

—আপনি মাথায় আঘাত পাওয়ার পূর্বমুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলেন ঘরে কারুর উপস্থিতি ?

—না।

—কিন্তু মিঃ মুখার্জী, একটা প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে। আপনি কেন ওরকম কষ্ট করে ডাঃ হীরালালের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তা এখনও আমার কাছে একটা বড় রকমের প্রশ্ন।

তরুণ চুপ করে রইল। একটা উৎকন্ঠা, একটা ভয় দ্রুত কুরে কুরে খাচ্ছে.

ওর ভেতরটা। কি উত্তর দেবে? অত্যধিক উত্তেজিত হয়ে কিভাবে ডেকে এনেছে তা একমাত্র নিজেই বুঝছে।

— উত্তর না দিলে মারাত্মক বিপদেরই ঝুঁকি নেবেন। পরিষ্কার কিছু আমার কাছে বলে ফেলাই বোধহয় ভাল।

তরুণ মনস্থির করে নিয়ে বলতে আরম্ভ করল, আমি যা বলব বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, তবে নিশ্চিত জানবেন মিথ্যার নামগন্ধ এর মধ্যে নেই। ডাঃ হীরালাল মুঙ্গেরের লোক ছিলেন। ভাগলপুর ও মুঙ্গের প্রায় পাশাপাশি শহর। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল বহুদিন থেকেই। উনি যখন মুঙ্গেরে প্র্যাকটিশ করতেন তখন আমাদের বাড়ির কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ওঁকে কল দিয়ে ভাগলপুরে আনা হত। উনি এলেন কলকাতায় প্র্যাকটিস করতে। আমার সঙ্গে বহুদিন ওঁর সঙ্গে আর দেখাসাক্ষাত হয়নি। গত সপ্তাহে আমি জামাইবাবুর টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতায় আসি। গুরুতর অসুস্থা দিদি। পেটে কি একটা অপারেশন হওয়ার আয়োজন হচ্ছে। দেখলাম দিদিকে ট্রিটমেণ্ট করছেন ডাক্তার হীরালাল। সার্জারিতে তাঁর ভাল হাত। তবুও জামাইবাবু বললেন, শহরের আরো বড় কয়েকজন ডাক্তার ডেকে পরামর্শ করতে। ডাঃ হীরালাল রাজী হলেন না। তাঁর মত হল, গুরুতর কিছু নয় যে হৈ হৈ করতে হবে। মাইনর অপারেশন, তিনি নিজেই সামলে নেবেন। তাঁর নার্সিং হোমেই অপারেশনের ব্যবস্থা হল। কিন্তু দিদিকে বাঁচান গেল না। তারপর—

কান্নায় তরুণের গলা বুঁজে এল।

—ভেরি স্যাড। তারপর কি হল?

—আমি দিদিকে বড় ভালবাসতাম, ইন্সপেক্টর। তাঁর মৃত্যুতে পাগলের মত হয়ে গেলাম। ডাঃ হীরালালের কাছে গিয়ে এর কৈফিয়ৎ চাইলাম। কেন তিনি সমস্ত দায়িত্ব নিয়েও বাঁচাতে পারলেন না। তিনি একরকম হাঁকিয়ে দিলেন আমাকে। অপারেশনের জন্য ওঁকে চার হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। খরচ হয়েছিল পৌনে দু-হাজারের মত। মন একটু শান্ত হবার পর, গত পরশুদিন ওঁর কাছে গিয়ে বাকী টাকাটা চাইলাম। কি জানি কেন, আমার দাবী সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন আর আমাকে ডাক্তারখানা থেকে বার করে দিলেন। একে দিদির মৃত্যুতে ওঁর উপর দারুণ অবিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, তারপর এই ধরনের ব্যবহারে আমি হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হলাম। আমার সমস্ত বিবেচনাবোধ লোপ পেল। ভোজালি নিয়ে সন্ধ্যার সময় ওঁর ফ্ল্যাটে গেলাম, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করব। গানবাজনা চলছিল বলে আবার গেলাম মাঝরাতে। তারপর যা হয়েছে তা আপনি আগেই শুনেছেন।

তরুণ থামল। হাঁপাচ্ছিল।

—হুঁ। ওই যে দুলারী বাঈ-এর কথা বললেন, তার ঠিকানা জানেন?

—বৌবাজারের দিকে কোথায় থাকে শুনেছি—আপনি বোধহয় আমার সব কথা বিশ্বাস করলেন না?

রয়েছে ? বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলাতেই আমাদের সব সময় দুলতে হয়, তরুণ-
অভিযোগ আপনার সমস্ত কথার সত্যতা যদি প্রমাণিত হয়, কখনই আপনাকে ধরে
ইন্সপেক্টর না। ভাল কথা, আপনার জামাইবাবুর ঠিকানাটা কি ?

— ডোণ্ডা ঠিকানা দিল।

অমিতাভ উঠলেন।

—এখন বিশ্রাম করুন। পরে আবার আমি আসব।

তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন ঘর থেকে।

সন্ধ্যার পর পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পাওয়া গেল।

প্রথমে হত্যাকারী গলা টিপে ডাক্তারকে অজ্ঞান করে ফেলে। তারপর তলপেটের কিছু অংশ কেটে বার করে নেয়। যদিও পেটের কাটা জায়গায় খুব অপটু হাতেই ছুরি চালান হয়েছে, তবুও রিপোর্টে জোর দিয়ে বলা হয়েছে ক্ষতস্থান ভোজালি দিয়ে সৃষ্টি হয়নি।

ইন্সপেক্টর গভীরভাবে ভাবতে থাকেন।

ডাঃ হীরালালকে গলা টিপেই হত্যা করা যেত। বুকে আঘাত করবারও কোন অসুবিধা ছিল না। তবু এইভাবে তাঁকে হত্যা করা হল কেন ?

আর কি উদ্দেশ্যেই বা হত্যা করা হল ?

রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, হত্যা সংঘটিত হয়েছে রাত এগারটা থেকে বারটার মধ্যে।

এমন কিছু রাত্রি নয়।

সে সময় হয়ত 'মিত্রভিলা'র অনেকে জেগেই ছিলেন।

তরুণ মুখার্জীর কথা বিশ্বাস করলে—খুনের প্রায় দুঘণ্টা পরে উনি দুর্ঘটনার স্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ল।

সত্রাসে টেলিফোন বেজে উঠল এই সময়।

রিসিভারটা তুলে নিলেন অমিতাভ, হ্যালো—

—ও সি বেহালা, প্লিজ—

—গুড মরনিং স্যার। কথা বলছি।

সংযতকন্ঠে কথাটা শেষ করলেন ইন্সপেক্টর। গলার আওয়াজ চিনতে তাঁর কষ্ট হয়নি লাইনের অপর প্রান্তে ডি. সি সাউথ অরুণ চন্দ্র।

গতকালই ডাঃ হীরালালের হত্যা সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিলেন ডি. সি.। মনে হয় এখন উনি ওই বিষয়েই কিছু বলবেন।

অমিতাভ গাঙ্গুলীর অনুমান মিথ্যে হল না।

মিঃ চন্দ্র বললেন, শুনুন ইন্সপেক্টর, তরুণ মুখার্জী সুস্থ হয়ে উঠলেই তাকে ছেড়ে দিন।

—ছেড়ে দেব স্যার !

—আমার মনে হয় ওতেই কাজ হবে। ছেড়ে দেবার পর তার উপর একটা ওয়াচ রাখবেন। কোথায় যায় না যায়, কার সঙ্গে মেলামেশা করে ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট যেন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

— তাই হবে, স্যার।

টেলিফোন ছেড়ে দিলেন অরুণ চন্দ্র।

ইন্সপেক্টর গাঙ্গুলী ভেবে দেখলেন, এ পরিকল্পনা মন্দ নয়। সত্যিই যদি তরুণ মুখার্জী হত্যাকারী হয়, তাহলে এই ফর্মুলায় কিছু তথ্য সংগৃহীত হবার সম্ভাবনা আছে। অবিলম্বে তিনি তাকে ছেড়ে দেবার এবং তার উপর ওয়াচ রাখবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করলেন। তারপর তাঁকে বেরুতে হল থানা থেকে।

বৌবাজারে অনুসন্ধান চালিয়ে দুলারী বাঈ-এর ঠিকানা সংগ্রহ করা খুব কঠিন হয়নি। অবশ্য সে পেশায় বাঈজী হওয়ার দরুণই এত অল্প আয়াসে তার ঠিকানার সন্ধান পাওয়া গেছে। গতকাল সন্ধ্যায় বিশেষ ব্যস্ত থাকায় অমিতাভ ওখানে যেতে পারেননি। এখন যাবেন।

বেহালা থেকে বৌবাজারে পেঁছাতে বেশ কিছুটা সময় গেল। বাড়িটি তেতলা - নিজের সাঙ্গোপাঙ্গোদের সঙ্গে দোতলার খানতিনেক ঘর নিয়ে থাকে দুলারী বাঈ। ইতিমধ্যে পুলিস আরো বহু সংবাদ সংগ্রহ করেছে। দুলারী বাঈ-এর মা জিল্লোবাঈ উত্তরপ্রদেশস্থ মীর্জাপুরের প্রসিদ্ধা বারাঙ্গনা ছিল। মেয়ের ব্যবসায়ে নামার মত বয়স হবার পরই তাকে কিন্তু ওখানে রাখেনি। পাঠিয়ে দিয়েছে কলকাতায়। মা ও মেয়ের কর্মক্ষেত্র এক হোক তা হয়ত সে চায়নি।

গুণের দিক থেকে জিল্লোবাঈ-এর চেয়ে এক ধাপ উপরে দুলারী। সুন্দর মুখশ্রী, সুঠাম দেহ তো আছেই ; কণ্ঠসম্পদটিও অনবদ্য। কলকাতায় এসেই রাতারাতি কিভাবে সে প্রতিষ্ঠা পেল তা অবশ্য জানা যায় না। তবে "কলকাতার বহু ধনী ব্যক্তি তার চারপাশে গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছেন—এ অতি প্রচারিত সংবাদ।

ঘরের মধ্যে থেকে গানের সুর ভেসে আসছিল। দুলারী রেওয়াজ করছে। রজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আধবুড়ো লোকটিকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে অমিতাভ ঘরে প্রবেশ করলেন।

আচম্বিতে পুলিসের আগমনে গান থেমে গেল। সচকিত দুলারী উঠে দাঁড়াল।

অমিতাভ বললেন, তবলচিকে বাইরে যেতে বলুন। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

হাতের ইসারায় দুলারী তবলচিকে বাইরে যেতে বলল। সে বাইরে চলে যাবার পর ইন্সপেক্টর নিজের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন।

দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে দুলারী বলল, ডাঃ হীরালালের মৃত্যুতে সত্যি আমার খুব কষ্ট হয়েছে। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন। কিন্তু আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন বুঝতে পারছি না। তাঁর খুনের ব্যাপারে আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি ?

ইন্সপেক্টর বুঝলেন মেয়েটি বাকপটু।

—তাঁর পরিচিত সকলের সঙ্গেই আমাদের দেখা করতে হচ্ছে। আপনাদের কোন কথাটা কাজে লেগে যাবে বলা তো যায় না। তিনি খুন হবার আগের দিন সন্ধ্যায় আপনি তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন।

—সেদিনকার আসরে আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের আপনি চেনেন?

—ডাঃ হীরালালকে বাদ দিয়ে আরো দুজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে চিনি।

—কে তিনি?

—ডাঃ অসিত ব্যানার্জী।

অমিতাভ অবাক হয়ে গেলেন। ডাঃ অসিত ব্যানার্জী অতি খ্যাতিমান চিকিৎসক। তিনিও বাঈজীর গান শুনতে অভ্যস্ত! কথাটা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

—আপনি কতক্ষণ ওখানে ছিলেন?

—রাত দশটা পর্যন্ত।

—আপনি চলে আসার সময় কি বাকী দুজন ডাঃ হীরালালের কাছে রয়ে গেলেন?

—না। তাঁর আধঘন্টাটাক আগেই চলে গিয়েছিলেন।

—হুঁ। ডাঃ হীরালালের সঙ্গে আপনার আলাপ কতদিনের?

—বছর দুয়েকের কিছু বেশি।

কিভাবে আলাপ হয়েছিল? উনি কি এখানে এসেছিলেন, না ...

—ব্যবসার গোপন কথা আমাকে প্রকাশ করতে বলবেন না। চা খাবেন?

—না।

অমিতাভ লক্ষ্য করছেন, দুলারীর কথাবার্তা আর দশজন সাধারণ বাঈজীর মত নয়। ভদ্রঘরের মেয়েদের মতই, পরিচ্ছন্ন ও সংযত।

—সেদিন রাত্তিরটা ওখানে থেকে যেতে ডাঃ হীরালাল আপনাকে বলেননি? ক্ষমা করবেন আমার এই ধরনের প্রশ্নের জন্য।

মনে হল, দুলারী একটু লাল হয়ে উঠল।

—ওই রকমই একটা কথা ছিল আগে থেকে! কিন্তু উনি বললেন, কে একজন বিশেষ দরকারী কাজে একটু রাত করে আসবে। তাই ....

—কে আসবে তার নাম বলেছিলেন?

—না।

—আমি এখন চললাম। আবার এখানে আসতে হতে পারে। এখন কিছুদিন আপনি আমাদের অনুমতি ছাড়া কলকাতার বাইরে যাবেন না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অমিতাভ স্থির করলেন, কাল সকালেই যাবেন ডাঃ ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর কাছ থেকে কোন নতুন তথ্য পাওয়া

অসম্ভব নয়।

কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণতা লাভ করল না। সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে আরেকটি হত্যাকান্ড সংঘটিত হল।

আবার একটা খুন।

ভোরে ঘুম থেকে উঠেই শহরবাসীদের চোখে পড়ল দৈনিক সংবাদপত্রের দ্বিতীয় পাতায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা এক হত্যাকাহিনী—

মধ্য কলিকাতায় মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ড

গতকাল রাত্রে মধ্য কলিকাতার সুবিখ্যাত চিকিৎসক অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়কে কে বা কাহারা নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। তাঁহার ন্যায় ভদ্র ও প্রখ্যাত ব্যক্তির জীবন যে এইভাবে শেষ হইবে তাহা কে কল্পনা করিয়াছিল।

রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় তাঁহাকে শেষবারের মত জীবিত দেখা যায়। তখন তিনি লাইব্রেরী কক্ষে প্রবেশ করিতেছিলেন। রাত্রে আর কিছু জানা যায় নাই। প্রাতে বাড়ির পুরাতন ভৃত্য তাঁর মৃতদেহ উক্ত কক্ষের মেঝের কার্পেটের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখে। কে বা কাহারা তাঁহার তলপেটের কিছু অংশ কাটিয়া ফেলিয়াছে। পুলিস মহলের ধারণা, ক্ষতস্থান হইতে বহুল পরিমাণে রক্তপাত হইবার ফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

জনসাধারণের অবশ্যই স্মরণ আছে, মাত্র কয়েকদিন পূর্বে বেহালার প্রখ্যাত চিকিৎসক হীরালাল আম্বাণ্টও ঠিক এইভাবেই মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। পরপর দুইটি মর্ম্মন্তুদ ঘটনা শহরবাসীকে আতঙ্কিত করিবে সন্দেহ নাই। পুলিসের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ লইয়া রক্তলোলুপ আততায়ীর দল তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

মৃত ডাঃ বন্দোপাধ্যায় সার্জারিতে প্রভূত জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি স্বদেশ ও বিদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। ঢাকার সুবিখ্যাত বন্দোপাধ্যায় বংশে তিনি ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ·· ইত্যাদি।

একটা প্রবল ধাক্কায় ঘুম ভেঙ্গে গেল শৈবালের।

ও ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বিছানায়।

সামনেই দাঁড়িয়ে সোনা।

শৈবাল বিরক্তির সুরে বলল, কি ব্যাপার?

শীতের সকালের ঘুম বেশ আরামদায়ক। সে আরামে ব্যাঘাত ঘটলে একটু বিরক্ত বোধহয় বৈকি।

সোনা দৈনিক সংবাদপত্রখানা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, পড়ে দেখ ডাঃ ব্যানার্জী মারা গেছেন।

কি বললে।

ক্ষিপ্র হাতে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে শৈবাল দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

ডাঃ ব্যানার্জীর হত্যাকাণ্ডে স্তম্ভিত হয়ে গেল ও। সার্জারিতে ওর যা কিছু শিক্ষা, তা সমস্তই তিনি ওকে হাতে-কলমে শিখিয়েছিলেন।

শৈবাল তাঁকে পরমপূজ্য গুরু হিসেবে শ্রদ্ধা করত।

এ কি হল—এ যে ভাবা যায় না।

দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল শৈবাল। ট্যাক্সি করে সোজা চলে এল ধর্মতলা স্ট্রীটে ডাঃ ব্যানার্জীর বাড়িতে। লোকে লোকারণ্য। এখনও মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়নি।

গেটের গোড়াতেই পুলিস ওকে বাধা দিল। সৌভাগ্যক্রমে ইন্সপেক্টর সুকুমার পোলে তখন এদিকেই আসছিলেন। শৈবালকে দেখেই চিনতে পারলেন। বছর-খানেক আগে একটা হত্যারহস্যের তদন্তের সময় সুকুমারবাবুর সঙ্গে বাসব ও শৈবালের পরিচয় হয়েছিল।

তিনি ওকে ভেতরে নিয়ে চললেন।

ডাঃ ব্যানার্জী বিখ্যাত ডাক্তারই ছিলেন না, প্রচুর ধনীও ছিলেন।

শৈবাল দেখতে পেল লবিতেই গণ্যমান্য ব্যক্তি ও প্রখ্যাত চিকিৎসকবর্গ উপস্থিত রয়েছেন। এঁরা সকলেই মৃতের প্রতি সম্মান দেখাতে এসেছেন। সকলের মুখেই বিষাদের ছায়া।

শৈবাল একপাশে গিয়ে দাঁড়াল। পুলিসের পক্ষ থেকে তখন বাড়ির লোকেদের ও চাকরবাকরদের জেরা করা শেষ হয়েছে। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়েনি।

শৈবাল না ভেবে পারে না, সংবাদপত্রের তৎপরতা সত্যি বিস্ময়কর। কত তাড়াতাড়ি সংবাদ সরবরাহ করেছে তারা।

মেডিক্যাল এসোশিয়েসানের সেক্রেটারি তিনি। পার্ক স্ট্রীটে তাঁর ক্লিনিকটি যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন।

শৈবাল বলল, কি বিশ্রি ব্যাপার ঘটে গেল বলুন তো?

ডাঃ হিরণ্ময় ভারি গলায় বললেন পরপর দুটো ঘটনা।

আমার মনে হয় পুলিসের পক্ষে হত্যাকারীকে ধরা সম্ভব হবে না।

—দুটো মার্ডারেরই কি অদ্ভুত সিমিল্যারিটি লক্ষ্য করেছেন?

তাইতো বলছি। তাছাড়া দুক্ষেত্রেই দুজন ডাক্তার নিহত হয়েছেন।

—আপনি কি বলেন? প্রাইভেট এনকোয়ারি করানোটা কি খুব যুক্তিযুক্ত হবে?

—ডাঃ সেন, ডাঃ চক্রবর্তী—এঁরাও আমায় বলছিলেন, পুলিস যা করছে করুক। ওই সঙ্গে আমরাও ডাঃ ব্যানার্জী ও ডাঃ আম্বাণ্টের হত্যারহস্যের যদি কিছু করতে পারি, মন্দ কি।

শৈবাল চিন্তিত গলায় বলে, প্রস্তাবটা মন্দ নয়। কিন্তু—

ডাঃ গাঙ্গুলী আবার বললেন, আপনি এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে

পারেন।

—আমি।

আপনার বিশিষ্ট বন্ধু……

—ও বাসবের কথা বলছেন? বেশ তো। ওর হাতে এখন কোন কেস নেই। আমার মনে হয় ও অবশ্যই এ তদন্তভার গ্রহণ করবে।

বেশ কিছুদিন থেকে বেকার বসে আছে বাসব। হাতে কোন কেস নেই।

রেডিও শুনে আর শৈবালের সঙ্গে গল্প করে ওর দিন কেটে যাচ্ছে।

সন্ধ্যা হয়েছে।

পেসেন্স খেলায় ব্যস্ত ছিল বাসব।

এই সময় শৈবাল ঘরে প্রবেশ করল ডাঃ গাঙ্গুলীকে সঙ্গে নিয়ে।

বাসব সাদরে অভ্যর্থনা করল হিরন্ময়কে।

তারপর শৈবালের দিকে তাকিয়ে বলল, ডাঃ ব্যানার্জীর হত্যার ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করতে পারি?

—আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন বাসববাবু—ডাঃ হিরন্ময় বললেন, আমরা ওই কারণেই এসেছি।

বাসব এবার ডাঃ গাঙ্গুলীকে ভাল করে লক্ষ্য করল।

উচ্চতায় বেশ কিছুটা তিনি। গায়ের রং না-ফরসা না-কালোর মাঝামাঝি। একমাথা ঘন চুল। একপাশ করে টেরিকাটা। মুখশ্রী চলনসই।

বয়স পঞ্চাশের উপরে। হাতে রুপার মুঠাযুক্ত ছড়ি।

—আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। বলুন, কি রকম সাহায্য চান?

এবার মেডিক্যাল এসোশিয়েসানের পক্ষ থেকে এই হত্যা দুটির সম্পূর্ণ তদন্তভার আনুষ্ঠানিকভাবে বাসবের উপর অর্পণ করলেন ডাঃ হিরন্ময়।

বললেন, আমরা পুলিসের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছি। তারাও আপনার প্রয়োজন মত আপনাকে সাহায্য করবে।

বাসব মৃদু হেসে বলল, ওই সঙ্গে আপনাদের সহযোগিতাও আমার কাম্য।

—অবশ্য পাবেন।

বাহাদুর ঘরে এল তিন কাপ কফি নিয়ে।

শৈবাল বলল, বাহাদুরের কর্তব্যনিষ্ঠা অতুলনীয়। বাড়িতে অতিথি এলে কফি থেকে বঞ্চিত হবার উপায় নেই।

বাসব বলল, বাহাদুরের এই রকম বাহাদুরী না থাকলে ভদ্রসমাজে আমার পক্ষে বাস করা কঠিন হয়ে উঠত, ডাক্তার।

কফি শেষ করে ডাঃ হিরন্ময় বিদায় নিলেন।

শৈবালও অনুগামী হল তাঁর।

সহর্ষে ক

বেং... ন'টা।

ইন্সপেক্টর অমিতাভ গাঙ্গুলী অফিসে বসে চিন্তা করছিলেন।

তাঁর এলাকায় ডাঃ হীরালাল নিহত হলেন। আবার একইভাবে মধ্য কলকাতায় নিহত হয়েছেন ডাঃ ব্যানার্জী। দুটো হত্যার মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে—

তরুণ মুখার্জীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। কিন্তু তার ব্যবহারে এখনও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি। এদিকে হীরালালের সহকারী প্রদ্যোত হালদারই বা কোথায় উবে গেল! সপ্তাহখানেক পার হতে চলেছে, এখনও তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

—স্যার—

তাঁর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল।

মুখ তুলে ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন কিছু বলছ মহিম?

—আপনার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান। বিশেষ প্রয়োজন আছে নাকি।

—পাঠিয়ে দাও।

মিনিট কয়েক পরে এক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন।

একহারা শ্যামবর্ণ দেহ! বুদ্ধির আভাযুক্ত মুখ।

অচেনা লোকটির দিকে ইন্সপেক্টর বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন।

আগন্তুক নিজের পরিচয় দিলেন, আমি প্রদ্যোত হালদার।

সোজা হয়ে বসলেন অমিতাভ গাঙ্গুলী।

তিনি কি ভুল শুনছেন? তা তো নয়। জলজ্যান্ত মানুষটা তাঁরই সামনে দাঁড়িয়ে।

উনি বসতে অনুরোধ করলেন প্রদ্যোত হালদারকে।

বললেন, আপনিই কি ডাঃ হীরালালের সহকারী?

—হ্যাঁ।

—এতদিন আপনি ছিলেন কোথায়?

—সে কথা বলতেই আপনার কাছে ছুটে এলাম। ডাঃ হীরালাল মারা যাওয়ার দিন দুয়েক আগেই একটা চিঠি আসে। তাতে লেখা ছিল, চিঠি পাওয়া মাত্র আমাকে যেন ভাগলপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যে ওষুধের নমুনাটা ডাক্তার ওখানে পাঠিয়েছিলেন, তা নাকি গ্যাংগ্রিনের আশ্চর্য রকমের ফলদায়ক। পেটেন্ট নেওয়া চলতে পারে। আমিও বিষয় খোঁজ নেবার জন্যে পরদিনই ভাগলপুরে রওনা হই।

—ওই পেটেন্ট নেওয়ার কথাটা কিন্তু আমার কাছে পরিষ্কার হল না।

—ডাঃ হীরালাল গ্যাংগ্রিনের একটা ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন। তার নমুনা পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন ভাগলপুরের ইউনিয়ন ড্রাগে। এই কারখানাটি তাঁর এক আত্মীয়ের। আমি ভাগলপুরে গিয়ে অবাক হলাম। ও'রা

কেউ চিঠি লেখেননি—চিঠিটা জাল।

—চিঠিখানা আপনার কাছে আছে ?

প্রদ্যোত হালদার পকেট থেকে বার করে দিলেন চিঠিটা। অমিতাভ সেখানা হাতে নিয়ে মন দিয়ে পড়লেন। উল্টেপাল্টে খুঁটিয়ে দেখলেন।

—এখানা থাক আমার কাছে।

—বেশ।

—তারপর কি হল ?

—আমি কলকাতায় ফিরে এলাম পরের দিন।

—তার মানে খুন হয়ে যাওয়ার দিন সকালে আপনি ফিরে এলেন।

—হ্যাঁ।

—এ ক'দিন ছিলেন কোথায় ?

গলা পরিষ্কার করে নিয়ে হালদার বললেন, সেই কথাই তো এবার বলব। হাওড়া থেকে ট্যাক্সি করে বেহালায় ফিরছিলাম। হঠাৎ কেমন যেন ঘুম ঘুম ভাব এল। তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরে আসতে দেখলাম, আমি হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি।

—বলেন কি! এ তো রীতিমত ডিটেক্টিভ উপন্যাস হয়ে উঠল। তারপর—?

—বেশ ঘাবড়ে গেলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এটা চন্দননগরের সরকারী হাসপাতাল। আমি নাকি গঙ্গার ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলাম। স্থানীয় লোকেরা আমায় হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ওখান থেকে ছাড়া পেয়েই বেহালায় এসে শুনলাম, ডাঃ হীরালালের খুন হওয়ার কথা। আমার মনের অবস্থা কি রকম হল সে বর্ণনা দিয়ে আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। একটু সামলে নিয়েই এখানে সোজা চলে এসেছি।

এরপর অমিতাভ গুটিকয়েক প্রশ্ন করলেন তাঁকে। কিন্তু আশাপ্রদ কিছু জানা গেল না। তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হল, তিনি যেন 'মিস্টিভিলাতেই' থাকেন এবং পুলিসের বিনা অনুমতিতে তিনি যেন কলকাতার বাইরে পা না দেন।

প্রদ্যোত হালদার বিদায় নিলেন।

ইন্সপেক্টর চিন্তা করতে লাগলেন। লোকটার অতি স্মার্ট ভাবটা যেন ইচ্ছাকৃত। তাছাড়া ডাঃ হীরালালের মৃত্যুতে শোকে কাতর হয়ে পড়েছে বলেও মনে হল না। উনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে এক্সচেঞ্জকে বললেন, চন্দননগরের সরকারী হাসপাতালের ইনকোয়ারির সঙ্গে সংযোগ করতে। রিসিভার নামিয়ে রেখে সবে একটা ফাইল টেনে নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছেন রাগ[illegible] শৈবাল ঘরে প্রবেশ করল। তাঁর বিস্ময় জিজ্ঞাসায় পতিত হবার আগে নিজেদের পরিচয় দিল। ইন্সপেক্টর পূর্বাহ্নেই নির্দেশ পেয়েছিলেন বাসব সহযোগিতা করতে। তাছাড়া এই তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন খ্যাতিমান ব্যক্তিটির [illegible] তাঁর অজানা নয়।

সহর্ষে অমিতাভ বললেন, আপনার নাম ও কার্যকলাপের বহু প্রশংসা আমি শুনেছি। আজ চাক্ষুস আলাপে আনন্দিত হলাম। বসুন বসুন—

এরপর কাজের কথা আরম্ভ হল।

বাসব 'মিত্রভিলা'র প্রত্যেকের স্টেটমেণ্ট খুঁটিয়ে পড়ল।

ইন্সপেক্টর দুলারীর কথাও বললেন। অন্যান্য বিষয় যা আঁচ করেছিলেন তাও জানালেন। প্রদ্যোত হালদার প্রসঙ্গও বাদ গেল না।

বাসব সমস্ত ঘটনা গভীর মনোযোগ সহকারে শোনবার পর বলল, আপনার আপত্তি না থাকলে ডাঃ হীরালালের ডায়েরী ও প্রদ্যোতবাবুর চিঠিখানা আমার প্রয়োজন হত!

সেকি! এতে আপত্তি করার কি থাকতে পারে? নিশ্চয় দেব।

চিঠি আর ডায়েরী ইন্সপেক্টর বার করে দিলেন।

টেলিফোন বেজে উঠল এই সময়।

নিশ্চয় চন্দননগরের সরকারী হাসপাতালের লাইন পাওয়া গেছে। ইন্সপেক্টরের অনুমানই ঠিক। রিসিভার তুলে নিলেন তিনি। গোটাকয়েক প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমেই প্রদ্যোৎ হালদারের কথার সত্যতা প্রমাণিত হল।

— কি হল?

— হাসপাতাল থেকে তো সংবাদ পেলাম হালদার আমার কাছে যা বলেছে তা মিথ্যে নয়।

বাসব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি ও বিষয় অবশ্য নিশ্চিত ছিলাম। তিনদুপুরে এতগুলো ডাহা মিথ্যা কথা বলা যায় না। আমি এখুনি কিন্তু একবার মিত্রভিলায় যেতে চাই। আপনি কি—

— অবশ্য চলুন।

মিনিট পনেরর বেশি লাগল না তিনজনের মিত্রভিলা পোঁছতে। এমনিতে বাড়িটা নিস্তব্ধ। এখন তো সকলেই যে যার কাজে বেরিয়ে গেছেন। কনস্টেবল যথা নিয়মে মোতায়েন আছে। ডাঃ হীরালালের শয়নকক্ষের দরজা খুলে দিলেন ইন্সপেক্টর।

বাসব একাই ঘরে ঢুকল।

ঘরের যেখানে যা ছিল ঠিক একইভাবে আছে।

বাসব খুঁটিয়ে দেখতে লাগল চারিধার। বেশ বুঝতে পারা যায় অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন রুচির লোক ছিলেন। ও টেবিলের কাছে গিয়ে ড্রয়ার খুলে তার মধ্যেটা দেখতে লাগল। এটা ওটা নাড়া চাড়া করে তুলে নিল চেকবইটা। চেকবইটা পরীক্ষা করতেই দেখা গেল, মারা যাবার চারদিন আগে শেষবারের মত টাকা তোলা হয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে। টাকার অঙ্ক বেশ মোটা — সাত হাজার।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টর শৈবালের সঙ্গে কথা বলছেন।

বাসব টেবিলের পাশ থেকে সরে ওয়ার্ডরোবের পাশে এসে দাঁড়াল। ও শুনেছে এখানেই ডঃ হীরালালের মৃতদেহ পড়েছিল। বাসব হাঁটু গেড়ে বসে জায়গাটা ভাল করে দেখল। ছাপকা ছাপকা রক্ত কালো হয়ে জমে রয়েছে এখানে।

তারপর মুখ প্রায় কার্পেটের সঙ্গে সাঁটিয়ে ওয়ার্ডরোবের তলাটা দেখল।

কি একটা চকচক করছে না!

হাত চালিয়ে জিনিসটা বার করে আনল। একটা ছোট্ট ফুটো পয়সার মত গোল এলুমিনিয়ামের চাকতি। এক ধারটা ঘসে গেছে, টোল খেয়েছে। বাসব কিছুক্ষণ চাকতিটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল। কি হতে পারে জিনিসটা? কোন কিছু থেকে খসে পড়েছে সন্দেহ নেই। এই মুহূর্তে কোন সমাধানে পৌঁছান যাবে না বুঝতে পেরে, চাকতিটা পকেটে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বারান্দায় পা দিয়েই বাসব বলল, প্রদ্যোত হালদার তো এখানে রয়েছেন। তাঁকে একবার ডেকে পাঠান, ইন্সপেক্টর।

হালদারকে কিন্তু পাওয়া গেল না। আধ ঘণ্টাটাক আগে তিনি বেরিয়েছেন। তবে মলয় গাঙ্গুলীর সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি নিজের ফ্ল্যাটেই আছেন। অসুস্থতার দরুণ আজ অফিস যাননি।

খবর আর পাঠাতে হল না। তিনি নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। গায়ে একটা চাদর জড়ান। মুখে অমায়িক হাসি। কিন্তু তাঁকে দেখে অসুস্থ বলে মনে হল না।

শৈবাল ভাল করেই দেখল তাঁকে। গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যবান তার দেহ। মাথায় ঘন কালো চুল। তবে চিরুণীর শাসন সেগুলি বিশেষ মানে বলে মনে হয় না। মুখচোখ সাদামাটা। তবে সমস্ত মিলিয়ে একটা দম্ভের ভাব যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

— আপনি [illegible] আবার অসুস্থ শরীর [illegible] উঠে এলেন কেন? আমরাই যেতাম আপনার [illegible] কাছে। বাসব বলল কথাটা।

— মলয় গাঙ্গুলীর হাসি বিস্তার লাভ করল।

ইন্সপেক্টর বললেন, ইনি বেসরকারীভাবে এই হত্যাতদন্তের ভার গ্রহণ করেছেন। আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারেন।

—বেশ তো। আমার আপত্তি নেই।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আপনার অসুখটা কি?

আমার কলিক পেন আছে। মাঝে মাঝে ভীষণ কাবু করে ফেলে। তখন বিছানা নিতে হয়।

কলিক পেন অতি বিশ্রী রোগ— আপনার সঙ্গে প্রদ্যোত হালদারের কতদিনের আলাপ? আচমকা এই প্রশ্নে কেমন থতমত খেলেন মলয়বাবু।

—আলাপ ·· মানে আলাপ আর কি। মুখ চেনাচিনি আছে।

—আপনি পুলিসকে যা বলেছেন, সে সব বিষয় আর তুলতে চাই না। তবে আমাদের সাহায্য হয় এরকম আর কোন কথা যদি আপনারি জানা থাকে তাহলে—

—আমি যা জানি তা সবই বলেছি। তবে

—বলুন?

—খুনের সঙ্গে ঘটনাটির কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। আমার মনে হয়েছে গতকাল রাত্রে কে যেন ডাঃ হীরালালের ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

ইন্সপেক্টর বললেন, তা কিভাবে সম্ভব? ঘরের দরজা শীল করা ছিল।

তাছাড়া বাইরে চাঁ

মলয় গাঙ্গুলীর ক রে ফিরে গথিক পদ্ধতিতে নির্মিত দুর্ভেদ্য দুর্গের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওর সন্ধ বাড়ির সামনেকার প্রশস্ত জমির উপর সুন্দর ফুলের বাগান। ইন্সপেক্টরও চলে এসেছে ওয়াল দশ ফিটের কম হবে না উচ্চতায়। তার উপরে কাঁটা করে রাখা হয়েছে মাত্র

বাসব আবার পুরো ইন্সপেক্টর সুকুমার পোলের সঙ্গে বাসব ও শৈবাল ডাঃ

—এক-টা বোধহ ন হয়েছিলেন সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। আসার পথে সুকুমার

আপনি জেগে, নিয়ে এসেছে ওরা। ঘরখানা বেশ প্রশস্ত। লাইব্রেরী রুম।

বললাম না, শর আলমারিগুলিতে বই ঠাসা। ঘরের মেঝে পুরু কার্পেটে

আপনি ডাঃ হীরা সুদৃশ্য চেয়ার খানদশেক এখানে ওখানে। একটা ডিভানও

মলয় গাঙ্গুলী মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। ও

সহজভাবে বললেন, প্রথমে বেশ ঘাবড়ে গেলাম। তারপর অবস্থায় পড়েছিলেন। জানলা দিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে বাগানের দিকে তাকি ডভানের মাঝামাঝি জায়গায় পরেই দেখলাম, একজন লোক বাগানের মধ্যে দিয়ে অ সজাগ চোখ আরও তীক্ষ্ন হয়ে

বাসব পাইপে বারকয়েক ঘন ঘন টান দেবার পর টো পয়সা চেপে চেপে ছাপ নিশ্চয় আপনি চাঁদের আলোয় লোকটিকে চিনতে পে

—চিনতে পারিনি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। তবে নিশ্চয় এঘরে ঢোকেনি।

—বলুন বলুন?

—আমার মনে হল, যে লোকটি ডাঃ হীরালালের ঘরে অ গোল দাগ কার্পেটের সেই যেন - ণ দাগগুলোর দিকে

বাসব আর কোন প্রশ্ন করল না। শৈবাল ও সুকুমার

অন্যমনস্কভাবে কি যে ভাবতে লাগল।

—আমি যেতে পারি? ল?

অন্যমনস্কভাবেই ও বলল, অ্যাঁ -

—আমি এখন যেতে পারি?

—যাবেন? যান। - আমারও এখানকার কাজ শেষ হয়েছে, ইন্সপেক্টর। চলুন, ফেরা যাক।

হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের সুবিখ্যাত অন্যতম বাড়িটি হল, দুশো একচল্লিশের কে। এই বাড়িরই স্থায়ী বাসিন্দা বাসব। বিকেল উতরে যাবার পর শৈবাল ওখানে এল। বাসব তখন ড্রইংরুমের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। ওর মুখের উপর চিন্তার মেঘ।

শৈবাল কিছু না বলে, কোচে গিয়ে বসল। সেন্টার টপের উপর থেকে একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। সে জানে এই সময় চিন্তাস্রোতে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। মিনিট দশেক পরে বাসব একটা কোচে এসে বসল। মৃদু হাসল তারপর।

তারপর মুখ প্রায় কার্পেটের সঙ্গে সাঁটিয়ে ওয়ার্ডরোবের তলাটা দেখল।

কি একটা চকচক করছে না! ুমি স্বীকার করবে

হাত চালিয়ে জিনিসটা বার করে আনল। একটা ছোট্ট ফুটো বললে সত্যের অপলাপ এলুমিনিয়ামের চাকতি। এক ধারটা ঘসে গেছে, টোল খেয়েছে

চাকতিটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল। কি হতে পারে জি

কিছু থেকে খসে পড়েছে সন্দেহ নেই। এই মুহূর্তে কোন সম্ভবে একটা জিনিস যাবে না বুঝতে পেরে, চাকতিটা পকেটে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুজনেই সার্জারিতে

বারান্দায় পা দিয়েই বাসব বলল, প্রদ্যোত হালদার তো এখানে যায়নি। দুজনেরই একবার ডেকে পাঠান, ইন্সপেক্টর।

হালদারকে কিন্তু পাওয়া গেল না। আধ ঘণ্টাটাক আগে খুন দুটির পিছনে তবে মলয় গাঙ্গুলীর সন্ধান

স্থতার দরুণ আজ অফিস যানয় গাঙ্গুলীকে তোমার কেমন লাগল, বল?

খবর আর পাঠাতে হল না। ল না। আচ্ছা, সত্যি চোর এসেছিল হীরালালের চাদর জড়ান। মুখে অমায়িক হাসি

শৈবাল ভাল করেই দেখল তাঁকে। তবে এখানে প্রশ্ন আছে। মলয় গাঙ্গুলী এই কালো চুল। তবে চিরুণীর শাসন সে বললেন, না পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করার সাদামাটা। তবে সমস্ত মি কি নিতে এসেছিল তা অবশ্য আমি বুঝতে পেরেছি।

— আপনি আবার অস

আপনার কাছে। বাসব র অনুমান, তবে বিশ্বাস করি এই অনুমান পরে অভ্রান্ত

— মলয় গাঙ্গুলীর হা চোর এসেছিল ডাঃ হীরালালের ডায়েরীটা চুরি করতে।

ইন্সপেক্টর বল

ক কিছু এই ডায়েরীটায় আমি এক আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করেছি।

— জিনিস?

ডায়েরীর শেষের কিছু পাতায় নিয়মিত হিসাব রাখার জন্য ঘর কাটা রয়েছে। ডাঃ হীরালাল ওখানে আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখতেন। এমনকি যখনই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলেছেন—তার নোট রেখেছেন। কিন্তু মৃত্যুর চারদিন আগে যে সাত হাজার টাকা তুলেছিলেন তার উল্লেখ কোথাও নেই।

— হয়ত লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন।

— সাত হাজার টাকাটা ভুলে যাওয়ার মত অঙ্ক নয়, ডাক্তার। তাছাড়া মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসেব রয়েছে ডায়েরীতে। শুধু ওই সাত হাজার টাকার কোন হদিস মিলছে না।

—ডায়েরীতে আর কিছু পেলে?

— না। কাজে লাগতে পারে এমন কোন কথা আর নেই। চল, ওঠা যাক।

— কোথাও যাবে নাকি?

— ডাঃ অসিত ব্যানার্জীর বাড়িতে যাব।

ধর্মতলা স্ট্রীটের উপরে নয়, একটু ভেতর দিকে ডাঃ ব্যানার্জীর বাড়ি। বাসব

শৈবাল দেখছিল ঘুরে ফিরে গথিক পদ্ধতিতে নির্মিত দুর্ভেদ্য দুর্গের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িখানা। বাড়ির সামনেকার প্রশস্ত জমির উপর সুন্দর ফুলের বাগান। চারিপাশের বাউণ্ডারি ওয়াল দশ ফিটের কম হবে না উচ্চতায়। তার উপরে কাঁটা তারের সতর্কতা।

লবি পার হয়ে ইন্সপেক্টর সুকুমার পোলের সঙ্গে বাসব ও শৈবাল ডাঃ ব্যানার্জী যে ঘরে খুন হয়েছিলেন সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। আসার পথে সুকুমার পোলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ওরা। ঘরখানা বেশ প্রশস্ত। লাইব্রেরী রুম। দেওয়ালের সঙ্গে যুক্ত আলমারিগুলিতে বই ঠাসা। ঘরের মেঝে পুরু কার্পেটে আচ্ছাদিত। গদিমোড়া সুদৃশ্য চেয়ার খানদশেক এখানে ওখানে। একটা ডিভানও রয়েছে একপাশে, তারই ঠিক মাথার ধারে স্ট্যাণ্ড-লাইট।

সুকুমার পোলে বললেন, ডাঃ ব্যানার্জী এখানেই মৃত অবস্থায় পড়েছিলেন।

বাসব ঝুঁকে ডিভানটা পরীক্ষা করতে লাগল। ডিভানের মাঝামাঝি জায়গায় রক্তের ছোপ। কার্পেটের উপর দৃষ্টি পড়তেই ওর সজাগ চোখ আরও তীক্ষ্ন হয়ে উঠল। কিসের গোল গোল দাগ। যেন, ফুটো পয়সা চেপে চেপে ছাপ ফেলেছে কেউ।

—মিঃ পোলে, ডেড-বডি নিয়ে যাবার পর আর কেউ নিশ্চয় এঘরে ঢোকেনি।

নিশ্চয় না। দেখলেন তো দরজা শীল করা ছিল।

বাসব আবার পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করল। ওই গোল গোল দাগ কার্পেটের আরো কয়েক জায়গায় রয়েছে। বিচিত্র ব্যাপার। কিছুক্ষণ দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে কি চিন্তা করল ও। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শৈবাল ও সুকুমার পোলেও বাইরে এলেন।

বাসব প্রশ্ন করল, পোস্টমর্টমের রিপোর্ট আপনি দেখেছেন, মিঃ পোলে?

—হ্যাঁ, দেখেছি।

—রিপোর্টে কি আছে মোটামুটি বলুন তো?

—ডাঃ ব্যানার্জীকে প্রথমে ক্লোরোফর্ম করে অজ্ঞান করে ফেলা হয়—তারপর তিনি খুন হন। সাড়ে এগারটা থেকে দেড়টার মধ্যে ঘটনাটা ঘটেছে। তলপেটের কিছু অংশ তীক্ষ্নধার অস্ত্র দিয়ে অপটু হাতেই কাটা হয়েছে বলে সার্জনদের অভিমত।

-তাঁর আত্মীয়পরিজন কে কে আছেন?

—উনি অকৃতদার ছিলেন। একমাত্র ভাইপো ছাড়া নিজের বলতে আর কেউ নেই।

—ভাইপো কি এই বাড়িতেই থাকেন?

—হ্যাঁ।

—তিনি নিশ্চয় উত্তরাধিকারী?

—হ্যাঁ।

—কি নাম ভদ্রলোকের?

— তনুজা ব্যানার্জী।

—নামের বৈচিত্র্য আছে। সেই চাকরটিকে ডাকান তো, খুন হয়ে যাবার প ডাঃ ব্যানার্জীকে যে প্রথম দেখতে পেয়েছিল।

সুকুমার পোলে নির্দেশ দিতেই একজন কনস্টেবল চাকরটিকে ডেকে আনল। বুড়ো লোক। মাথার চুল প্রায় সবই সাদা হয়ে গেছে। মুখে ভীত ভাব।

—বাবু আমায় ডেকেছেন? আমি আর কিছু জানি না। যা বলবার····

—ভয় পাবার কিছু নেই। বাসব বলল, গোটাকয়েক প্রশ্ন শুধু করব। তোমার নাম?

—আজ্ঞে, রামতারণ।

—সেদিন এত সকালে লাইব্রেরী ঘরে তুমি কেন এসেছিলে, রামতারণ?

—আজ্ঞে বাবু, আমি প্রথমে লাইব্রেরী ঘরে ঠিক আসিনি। গিয়েছিলাম বাবুর শোবার ঘরে। দেখলাম বাবু নেই, তাই ওখানে গেলাম। ভোরবেলা ঘুম ভেঙ্গে গেলে বাবু লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে পড়াশুনা করতেন।

রামতারণের বলার ভঙ্গীতে বড়লোক বাড়ির কেতাদুরস্ত ভৃত্যেরই ছাপ।

—ঘরে ঢুকেই বোধহয় দেখতে পেলে বাবু পড়ে রয়েছেন।

—সে দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল।

—তোমার বাবু যেদিন মারা যান তার আগের দিন রাত্রে কি কেউ দেখা করতে এসেছিল?

—রাত্রে কেউ আসেনি। তবে সন্ধ্যাবেলায় ··

সন্ধ্যাবেলায় কি?

—দুলারী বাঈ এসেছিল। বাবু গানবাজনায় সময় কাটিয়েছিলেন কিছুক্ষণ।

শৈবাল সবিস্ময়ে বললেন, এখানেও দুলারী বাঈ!

বাসব বলল, এখানেও ঠিক মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তার উপস্থিতি।

ইন্সপেক্টর বললেন, আমি দুলারী বাঈ-এর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কথাবার্তা ·

—ও সম্পর্কে পরে আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছে, ইন্সপেক্টর। আচ্ছা রামতারণ, তোমার সঙ্গে তাঁর শেষ কথা হয়েছিল কটায়?

—বোধহয় তখন দশটা হবে, বাবু। উনি আমার কাছে দাদাবাবুর খোঁজ করেছিলেন।

—তারপর?

—দাদাবাবু বাড়ি নেই শুনেই রেগে উঠলেন। গজ গজ করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

—সে সময় কি বলছিলেন, তোমার মনে আছে কিছু?

—আজ্ঞে ·· দাদাবাবু কি নিয়ে যেন গোলমাল করেছিলেন, সেই কথাই বলছিলেন।

—সামনের গেট ছাড়া বাড়িতে ঢোকার আর কোন পথ আছে কি?

— আর নেই, বাবু।

— সেদিন রাত্রে কোন শব্দটব্দ পেয়েছিলে ?

না। আমি কানে একটু কম শুনি, বাবু।

—তোমার দাদাবাবু বাড়ি আছেন তো ? তাঁকে পাঠিয়ে দাও গিয়ে।

রামতারণ নিষ্ক্রান্ত হল।

বাসব পাইপ ধরাবার পর বলল, গেট ছাড়া ভেতরে ঢোকার পথ নেই। আর এটাও নিশ্চিত, গভীর রাতে গেট খোলা থাকবে না। তাহলে হত্যাকারী বাড়ির মধ্যে ঢুকল কোন পথ দিয়ে ?

শৈবাল বলল, গেট বন্ধ হবার আগেই হয়ত হত্যাকারী বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

—কিন্তু ডাক্তার, তোমার কথা মেনে নিলেও একটা ফাঁক যে থেকেই যাচ্ছে। কাজ শেষ করে হত্যাকারী বেরিয়ে গেল কিভাবে ? লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়, গেটটি কলাপসিবিল। রাত্রে তাতে তালা লাগান থাকাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে ...

এই সময় তন্ময়জী ঘরে এল।

একহারা লম্বা শরীর। ধারাল মুখ। ঝাঁকড়া ঝাঁবড়া চুলগুলো উস্কখুস্ক। কয়েকদিন না কামানোর দরুণ, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি মুখময়। দুচোখের তলায় কালী পড়েছে। কাকার মৃত্যুতেই বোধহয় সারা মুখে বিষাদ ছেয়ে রয়েছে। বয়স ২৮ ২৯ এর মধ্যেই।

— আপনাকে এসময় বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, তন্ময়জীবাবু। আমি ডাঃ ব্যানার্জীর মৃত্যুর তদন্তভার বেসরকারীভাবে গ্রহণ করেছি।

ইন্সপেক্টর বাসবের পরিচয় দিলেন।

~~—তাই তো~~ .....

~~খোঁজাখুঁজি করতেই বাহাদুরকে রান্না ঘরে পাওয়া গেল অজ্ঞান অবস্থায়।~~

— আমার কাছ থেকে কি জানতে চান, বলুন ?

তন্ময়জীর গলায় ক্লান্ত সুর।

—আপনি দুর্ঘটনার দিন বাড়ি ফিরেছিলেন কটায় ?

—আন্দাজ সাড়ে দশটা।

—আপনি বাড়ি ঢোকার পরই বোধহয় গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ?

— প্রতিদিন তাই হয়। আমি ফিরে এলেই দারোয়ান গেটে তালা দিয়ে বিশ্রাম করতে যায়।

— সেদিন রাত্রে আপনি কোন শব্দ পেয়েছিলেন বা বাড়িতে কেউ এসেছে এরকম কোন আন্দাজ ?

একটু ইতস্ততঃ করে তন্ময়জী বলল, আমি গেট খোলার শব্দ পেয়েছিলাম। কিন্তু ও নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাইনি, কারণ কাকা মাঝে মাঝে বাইরে যেতেন রাত্রে।

— ওঁর কাছে গেটের একটা ডুপ্লিকেট চাবি থাকত বোধহয় ?

— হ্যাঁ।

—আপনার কাছে গেটের কোন চাবি থাকে ?

— না। গেটের দুটোই চাবি। একটা দারোয়ানের কাছে থাকে আর অন্যটা কাকার কাছে

— আপনি কি করেন, মিঃ ব্যানার্জী ?

—পার্ক স্ট্রীটে আমার একটা স্টুডিও আছে। ছবির কারবার করি।

—প্লীজ ডোণ্ট মাইণ্ড, কাকার মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি আপনি তাহলে পাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ। আমি ছাড়া কাকার আর কেউ নেই।

—সম্পত্তির পরিমাণ কি রকম ?

—ব্যাঙ্কে ওঁর লাখ পাঁচেক টাকা আছে, আর এই বাড়িখানা।

—তাঁর কোন শত্রু ছিল কিনা জানেন ?

—না। তাঁর মত লোকের শত্রু আছে একথা কল্পনাই করা যায় না।

—দুর্ঘটনার দিন কটায় ঘুমতে যান, মনে আছে ?

—সাড়ে এগারটা হবে। একটা পোট্রেটে রিটাচ সেরে তবে ঘুমতে যাই।

বাসব বলল, ধন্যবাদ মিঃ ব্যানার্জী, আমার আর কোন প্রশ্ন নেই। চলুন, সুকুমারবাবু—

ওখান থেকে ফেরবার পথে বাসব বলল, আচ্ছা ডাক্তার, ডাঃ ব্যানার্জীকে তো তুমি গুরুর মত শ্রদ্ধা করতে, ও বাড়িতে তোমার নিশ্চয়ই যাওয়া-আসা ছিল ?

শৈবাল ট্যাক্সির সীটে একটু হেলে বসে বলল, বিলক্ষণ। বছর দশেকের ওপর আমি ও বাড়িতে যাওয়া-আসা করেছি।

—তাহলে এই ভাইপো রত্নটির সঙ্গে তোমার আলাপ থাকার কথা, কিন্তু সে রকম কিছু মনে হল না তো ?

—মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। যেহেতু ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার মোটেই আলাপ নেই। আমি ডাঃ ব্যানার্জীর কাছে গেছি, কাজ হয়ে যাওয়া মাত্র চলে এসেছি।

—উনি নিজের ভাইপো সম্বন্ধে কখনও কিছু বলতেন না ?

—বলতেন বই কি। মাঝে মাঝে আক্ষেপ করতেন।

—আক্ষেপ ? কি রকম ?

—অম্বজীবাবু নাকি ইদানিং রেসের মাঠে যাওয়া-আসার মাত্রাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন—তাই নিয়েই আক্ষেপ আর কি।

ট্যাক্সি হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে প্রবেশ করল।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে।

বাসব ট্যাক্সি থামাবার নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে।

শৈবাল বলল, এখানে নামছ কেন ? বাড়ির সামনে নামলেই তো হয়। এই বৃষ্টির মধ্যে—ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বাসব বলল, না। এখানেই নামতে হবে।

দেখছ না বাড়ির অপর ফুটে একটা গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। এদিকে গেটটাও খোলা। মনে হচ্ছে আমাদের অনুপস্থিতিতে কোন মহাপ্রভুর আগমন হয়েছে।

ও— দ্রুত এগিয়ে গিয়ে এমন এক জায়গায় দাঁড়াল, যেখানে বেশ অন্ধকার। একেইত রাস্তায় লোক চলাচল একটু কম, তার উপর বৃষ্টি হচ্ছে। অন্ধকার।

ও—র বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না।

মিনিট খানেক পরেই একটা ছায়ামূর্তি দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসল — সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট নিল গাড়িখানা।

ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকল এবার।

শৈবাল ও সঙ্গে গেল।

বলল, কি সর্বনাশ। এই সন্ধ্যাবেলায় চোর এসেছিল?

বাসব হেসে বলল, মোটরে চড়ে কি চোর আসে, ডাক্তার?

— তবে, কারা এরা?

— বুঝতে পারছ না, ডাঃ হীরালালের ডায়েরীটা চুরি করবার জন্যই কোন শ্রীমান এখানে হানা দিয়েছিলেন।

শোবার ঘরে গিয়ে দেখা গেল সমস্ত তচনচ হয়ে পড়ে আছে। বলাবাহুল্য, ডায়েরীটা নেই।

শৈবাল বলল, কিন্তু বাহাদুর কি কিছুই বুঝতে পারেনি? সে গেল কোথায়—?

— তাই তো ...

খোঁজাখুঁজি করতেই বাহাদুরকে রান্না ঘরে পাওয়া গেল অজ্ঞান অবস্থায়। মুখে জলের ছিটে দিতে ওর জ্ঞান ফিরে এল। বাসবের দেওয়া ব্রাণ্ডি খেয়ে বাহাদুর ক্রমে চাঙ্গা হল। তারপর ও যা বলল তার সারমর্ম হল, বাহাদুর রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় অতর্কিতে পিছন থেকে কে ওকে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল ও। বসার ঘরে এসে বাসব বলল, আমি শুধু ডায়েরী-চোরের কথা ভাবছি। প্রথমবার সে ডাঃ হীরালালের ঘরে গিয়ে ডায়েরীটা চুরি করতে পারেনি। কোনক্রমে সে জানতে পেরেছিল, ডায়েরীটা আমার কাছে আছে। তারপর নিশ্চয়ই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল আমার উপর। আজ তাই আমার অনুপস্থিতিতে কাজ সেরে চম্পট দিয়েছে। আমি আরো একটা কথা ভাবছি। শৈবাল সাগ্রহে বলল, কি কথা?

— আমি বুঝতে পারিনি, ডাক্তার। ডায়েরীতে এমন কিছু নিশ্চয়ই ছিল যা অত্যন্ত মূল্যবান। নইলে ওখানা চুরি করবার জন্যই বা এত হুড়োহুড়ি কেন?

— তুমি গাড়ির নম্বরটা লক্ষ্য করেছিলে কি? আমি কিন্তু ব্যাক লাইটের আলোয় ডায়েরী-চোরের গাড়ির নম্বরটা দেখে রেখেছি।

— বল কি? মনে আছে তোমার?

— আছে বইকি। ডব্লু বি, আর 3469.

বাসব টেলিফোন রিসিভারটা তুলে নিয়ে কতকগুলো নম্বর ডায়েল করল।

—হ্যালো এ, এ, বি—পুট মি টু সৌমেন্দ্র কুমার বক্সী প্লীজ।—কে সৌমেন,

আমি বাসব—ভাই বিশেষ প্রয়োজনেই তোমার স্মরণ করছি—দেখতো লি
বি আর 3160 কার গাড়ির নম্বর—ঠিক আছে— আমি হোল্ড করছি— র অনাট

শৈবালের দিকে তাকিয়ে বাসব বলল, আমার কলেজের বন্ধু সেরা মোবাইল এসোশিয়েশান অফ বেঙ্গলের অন্যতম কর্তাবিশেষ। ওদের ক এ লিল্ট আছে। তাই থেকেই - হ্যালো.—কি বললে—গাড়ির মালিওদে হীরালাল আম্বাণ্ট—বেহালায় বাড়ি—হ্যাঁ হ্যাঁ সম্প্রতি খুন হয়েমা তাহলে আচ্ছা—ধন্যবাদ ভাই। শুনলে তো, ডাঃ হীরালালের গাড়ি। । বাসব

শৈবাল উত্তর দেবার আগেই কলিং বেল বেজে উঠল।

বাহাদুর দরজা খুলে দিল।

প্রদ্যোত হালদার ঘরে প্রবেশ করলেন।

বাসব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি বললেন, আমি প্রদ্যোত হালদার।

—আপনিই?—বসুন।

—আপনি আজ সকালে আমার খোঁজ করেছিলেন মিত্রভিলায়, তাই শুনে দেখা করতে এলাম।

—ভাল আছেন? বাসব বলল, এখন কি করবেন ঠিক করলেন?

আচমকা এই ধরনের প্রশ্নে বিব্রত হলেন হালদার।

বললেন, আমি আপনাকে ঠিক ফলো করলাম না?

—এখন আপনি কি কাজকর্ম করবেন স্থির করলেন?

কিছু ঠিক করিনি। ডাঃ হীরালালের দূরসম্পর্কের আত্মীয়রা যদি মেডিক্যাল স্টোরটা চালায় তাহলে ওখানে কাজ করতে পারি।

—তাঁর আত্মীয়রা কি সব এখানে এসে পড়েছেন?

—না। তাঁরাই আমাকে মুঙ্গেরে ডেকেছেন?

—আচ্ছা, ডাঃ হীরালালের মোটরখানা কোথায়?

—মোটর!

ওখানা কি এখনও মিত্রভিলাতেই আছেন?

উনি মারা যাবার দিনকয়েক আগে মেরামতের জন্য গাড়িখানাকে পাঠিয়েছিলেন। তারপর থেকে ওখানেই রয়ে গেছে।

—কোন গ্যারেজে আছে?

—রায় অ্যান্ড সিনহা। সার্কুলার রোড। গাড়িটা সম্বন্ধে এত কথা জানতে চাইছেন কেন?

মৃদু হেসে বাসব বলল, নিছক কৌতূহল বলতে পারেন। ভাল কথা, মিত্রভিলার কম্পাউন্ডে ঢোকবার সামনের গেট ছাড়া আর কোন পথ আছে?

—মালি, মেথর এদের আসা-যাওয়া করার জন্য ছোট একটা প্যাসেজ আছে।

দুলারী বাঈ সম্পর্কে আমায় কিছু বলতে পারেন?

প্রদ্যোত হালদার একটু যেন সচকিত হলেন।

—ডাঃ হীরালাল গানবাজনা ভালবাসতেন। দুলারী মাঝে মাঝে আসত

দেখছ না'ন শোনাতে।

খোলা। মেয়েটির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল কিভাবে?

ও—আমি যতদূর জানি, ডাঃ ব্যানার্জী দুলারীর সঙ্গে ডাঃ হীরালালের পরিচয় একেইয় দেন।

—হুঁ। তাহলে আপনি বিস্তারিতভাবে দুলারী সম্পর্কে জানেন না।

ছা, ডাঃ হীরালাল কি অত্যন্ত অগোছাল স্বভাবের লোক ছিলেন?

— ঠিক তা নয়। তিনি একটু অন্যমনস্ক ধরনের লোক ছিলেন।

দেওয়াল-ঘড়ি নটা ঘোষণা করল।

বাসব বলল, আপনাকে আর রাত করিয়ে দেব না।—নমস্কার।

প্রদ্যোত হালদার প্রতিনমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন।

দিন দুয়েক পরে।

ডাঃ হিরন্ময়ের বাড়িতে আমন্ত্রণ ছিল বাসব ও শৈবালের। তাঁর জন্মদিন। পূর্বব্যবস্থা মত শৈবাল সন্ধ্যার সময় বাসবের বাড়িতে গেল। দুজনে একসঙ্গে যাবে। বাড়িতে বাসবকে পাওয়া গেল না। সময় সময় কোথায় যে ডুব মারে।

কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করার পর শৈবাল একাই গেল ডাঃ হিরন্ময়ের বাড়ি। বহু বিখ্যাত চিকিৎসক ও গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়েছেন দেখা গেল। ডাঃ হিরন্ময় স্বয়ং অতিথিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপর দৃষ্টি রাখছেন।

শৈবালকে দেখে প্রশ্ন করলেন, বাসববাবু আসেননি?

—কাজে কোথাও আটকে পড়েছে। এখুনি এসে পড়বে হয়ত।

ক্রমে নটা বেজে গেল।

ডিনারের সময় হয়ে গেছে। বাসবের এখনও কিন্তু দেখা নেই। শৈবাল উৎকণ্ঠিতভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। এরকম তো না হয় বড় একটা। এই সময় বাসবকে দ্রুতপায়ে তারই দিকে আসতে দেখা গেল।

—এত দেরি হল তোমার?

—হবে না! কাজ কি একটা ছিল!

—কাজ হল?

—মোটামুটি হয়েছে! সারাটা দুপুর তো কেটেছে ব্যাঙ্কে। তারপর বেহালায় গেলাম ইন্সপেক্টর অমিতাভর কাছে। সেখান থেকে ডাঃ হীরালালের ডাক্তারখানায়। আর এখন চন্দননগরের সরকারী হাসপাতাল থেকে সোজা চলে আসছি।

—কিছু সুবিধা করতে পারলে?

—গুটি গুটি পা পা করে কাজ সুবিধার দিকেই এগোচ্ছে।

বাসব পকেট থেকে একটা কাগজ টেনে বার করল।

সাদা কাগজ। লেটার-প্যাড থেকে ছেঁড়া।

—এই কাগজটা দেখছ?

—দেখবার কি আছে ? সাদা কাগজ।

—দেখবার অনেক কিছু আছে, ডাক্তার। এখানা দুপুরে। আমার তো মনে হয় অনেক কাজে লাগবে।

এই সময় ডাঃ হিরণ্ময় সকলকে ডিনারে যাবার অনুরোধ করলেন। বাসবকে দেখে বললেন, আপনার এত দেরি হল ?

আর বলেন কেন, এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম।

তারপর একটু থেমে বলল. আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি, ডাঃ গাঙ্গুলী। আপনার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক, এই আমার প্রার্থনা।

নিজের হস্তস্থিত ছড়িটা দোলাতে দোলাতে ডাঃ হিরণ্ময় বললেন, ধন্যবাদ। আসুন, ডিনার রেডি।

ডিনারের পর আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব সেরে বাসব ও শৈবাল ওখান থেকে বিদায় নিল। তখন এগারটা প্রায় বাজে। শীতের রাত্রি। পথে লোকজন নেই বললেই চলে। সারাটা সন্ধ্যা টিপটিপ করে বৃষ্টি হয়েছে। এখন অবশ্য হচ্ছে না। তবে আকাশের যা অবস্থা তাতে মনে হয়, যে কোন মুহূর্তে ঝমঝমিয়ে আসতে পারে।

বাসব পাইপ ধরাল।

—আজ আর তোমার বাড়ি ফিরে কাজ নেই, ডাক্তার। চল, রাতটা আমার এখানেই আজ কাটিয়ে দেবে।

গতকাল সোনা শ্যামবাজারে গেছে। ওখানে তার মামার বাড়ি। কাজেই ওদিক দিয়ে কোন অসুবিধা নেই। স্বচ্ছন্দে অন্যত্র থেকে যেতে পারে। ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। অগত্যা দুজনে হেঁটেই চলল। তাছাড়া এখান থেকে বাসবের বাড়ি বিশেষ দূরেও নয়।

বাড়ি ফিরে ওরা সবে শোবার আয়োজন করছে—টেলিফোনের ঝঙ্কার উঠল। এই অসময়ে আবার কে ফোন করছে ! বাসব রিসিভার তুলে নিল।

—হ্যালো ব্যানার্জী স্পিকিং—

অপর প্রান্ত থেকে ডাঃ হিরণ্ময়ের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কে বাসববাবু ? অ্যাট ওয়ান্স চলে আসুন আমার বাড়ি—ভয়ানক বিপদ—কুইক প্লীজ—

—হ্যালো কি হয়েছে—

—এখানে একজন ....

তাঁর কথা শেষ হল না। একটা আর্তরব শোনা গেল শুধু। তারপর গুরুভার কিছু পতনের শব্দ। রিসিভার নামিয়ে রেখে বাসব বলল, ডাঃ হিরণ্ময়ের বাড়িতে গুরুতর কিছু ঘটেছে ডাক্তার। আমাদের এখুনি যাওয়া দরকার।

দুজনেই দ্রুতপায়ে রাস্তায় নেমে এল। সৌভাগ্য বলতে হবে, একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল মোড়ের মাথায়। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ওরা পৌঁছাল ডাঃ হিরণ্ময়ের বাড়ি। বাসব আগেই শুনেছিল, তাঁর আত্মীয়-পরিজনরা এখানে কেউ নেই মধুপুর গেছেন সকলে। চাকর-বাকররা তখন ছুটোছুটি করছিল। তাদে

দের নিয়ে চলল উপরে।

দে

খোল।

য় তখন নিজের শয়ন কক্ষে, টেলিফোন-স্ট্যাণ্ডের পাশে পড়েছিলেন। সংগ্রহ কধার দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। শৈবাল তাড়াতাড়ি তাঁর শুশ্রূষায় একেইয় দেন। ীব্র আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে। এই সময় একজন —হু। ফলেন। তাঁকে চাকররাই বোধহয় খবর দিয়েছিল।

ছা, ... চাকরের সঙ্গে কথা বলে এইটুকু জানতে পারল, হঠাৎ কর্তার তীব্র ...ারে তারা হকচকিয়ে গিয়েছিল। উপরে ছুটে এসে দেখে এই কাণ্ড। এই সময় বাগানের মধ্যে দিয়ে একজন লোককে কেউ কেউ দৌড়ে চলে যেতে দেখেছে। তার মাথায় হ্যাট ও গায়ে ওভারকোট থাকায় তাকে চিনে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

টেলিফোনের রিসিভারটা তখনও ঝুলছিল। দুলছিল এদিক ওদিক। বাসব যথাস্থানে সেটাকে রেখে দিল। শৈবাল ও স্থানীয় চিকিৎসক রায়চৌধুরী ততক্ষণে অনেকটা এগিয়েছেন। দেখা গেল, জ্ঞান ফিরে আসছে তাঁর। একসময় চোখ মেলে তাকালেন ডাঃ গাঙ্গুলী।

ওদের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বললেন, আপনারা এসেছেন—

ডাঃ রায় চৌধুরী একটা বলকারক ওষুধ গেলাসে ঢেলে, জল মিশিয়ে তাঁকে দিলেন। ওষুধ খেয়ে ফেলার পর ডাঃ হিরণ্ময় একটু চনমনে হলেন। তাঁকে আগেই বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বাসব বলল কি হয়েছিল ব্যাপারটা, বলুন তো?

মাথার ব্যাণ্ডেজে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন, নিমন্ত্রিতরা চলে যাবার পর চেম্বারে বসে আমি কতকগুলো জরুরী কাজ সেরে নিচ্ছিলাম। এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। রাত্রে মাঝে মাঝে পেশেণ্ট আসে। আমি পোর্টিকোতে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওভারকোটে ঢাকা শরীর, মাথায় ফেল্ট হ্যাট। হ্যাট আবার এমনভাবে নামান যে মুখ মোটেই দেখা যাচ্ছে না। আমাকে দেখেই আগন্তুক কেমন এক অদ্ভুত গলায় বলল, আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে। পেশেণ্টের অবস্থা ভাল নয়।

আগন্তুকের ভাবভঙ্গী দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

বললাম, এখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। বরং

উত্তর হল, আপনার আপত্তি আমি শুনব না। যেতে আপনাকে হবেই। তৈরি হয়ে নিন।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। অসম্ভব ভয় করতে লাগল। প্রস্তুত হবার অজুহাতে উপরে উঠে এলাম। আপনাকে ফোন করলাম তাড়াতাড়ি। কিন্তু বুঝতে পারিনি আগন্তুকও আমার পিছু পিছু চলে এসেছে। তারপর কি হয়েছে আপনারা তো জানেনই!

ডাঃ হিরণ্ময় কথা শেষ করে হাঁপাতে লাগলেন।

— কি অস্ত্র দিয়ে আপনার মাথায় আঘাত করা হয়েছিল, বলতে পারেন?

—ছোরার বাঁট দিয়ে বোধহয়।

এইবার ডাঃ রায়চৌধুরী বিদায় নিলেন।

শৈবালের দিকে তাকিয়ে বাসব বলল, তুমি উপরেই থাক। আমি নিচেটা একবার ঘুরে আসি।

বাসব নিচে নেমে এল। সতর্কতার সঙ্গে ওর চোখ ঘুরতে লাগল চারিধারে। পোর্টিকো থেকে যে সুরকি ঢালা পথ গেটের দিকে চলে গেছে, পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বার করে নিয়ে ওই রাস্তাটার উপর এসে দাঁড়াল। বৃষ্টি হওয়ার দরুণ বেশ ভেজা।

টর্চের আলো ফেলে কয়েক পা এগিয়ে যাবার পরই ওকে থামতে হল। গোল-গোল পয়সার মত দাগ ছড়িয়ে রয়েছে চারিধারে। ঝুঁকে দাগগুলো পরীক্ষা করল। ভিজে মাটির উপর বেশ পরিষ্কার আকার নিয়ে দাগগুলো পড়েছে।

কিছুক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল। এই দাগগুলোর রহস্যময় উপস্থিতি পরিস্থিতিকে ক্রমেই জটিল করে তুলছে। ও আর ওখানে অপেক্ষা করল না। উপরে চলে এল। ডাঃ হিরণ্ময় তখন আরও একটু সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

বাসব বলল, আজ রাত্রে আপনার একা থাকাটা ঠিক হবে না। শৈবাল আপনার কাছেই থাকবে। আপনি কোনরকম দুশ্চিন্তা না করে ঘুমবার চেষ্টা করুন। আমি এখন চলি—

পরের দিন আকাশের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হল। রাত্রে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। আকাশে এখন ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ঘোরাফেরা করছে। তবে ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর জমিয়ে যাচ্ছে। বহুদিন এমন জমজমে শীত কলকাতায় পড়েনি।

বাসব বেলা আটটার সময় বাড়ি থেকে বেরুল।

হাঁটতে হাঁটতেই এল পার্ক স্ট্রীটে তন্নজীর স্টুডিওতে। স্টুডিও তখন সবে খুলেছে। ট্রাউজার ও ফ্লাইংসার্ট পরা এক ছোকরা দোকান ঝাড়া-পোঁছা করছে। বাসব আসতেই সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল।

তন্নজীবাবু আসেন কখন?

—এখুনি এসে পড়বেন। কি দরকার বলুন?

—ব্যক্তিগত প্রয়োজন আছে। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি কি?

বেশ তো। বসুন।

বাসব বসল।

ছোকরা আবার নিজের কাজে মন দিল। আর দশটা স্টুডিওর মতই এটি সাজান। চারদিকের দেওয়ালে বড় বড় ল্যান্ডস্কেপ আর পোর্ট্রেট টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। একধারে রামকৃষ্ণদেবের বিরাট অয়েলপেণ্টিং ঝোলান। হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল, অয়েলপেণ্টিংটার পিছন দিকের দেওয়ালের ধার ঘেঁষে কি যেন একটা বেরিয়ে রয়েছে। গজাল-টজাল হতে পারে।

বাসব পাইপ ধরে ঘন ঘন টান দিতে লাগল।

প্লাইউডে মোড়া কাউন্টার নয়নরঞ্জক। কাউণ্টারের উপর রাখা রয়েছে একটা সুদৃশ্য বাস্কেট। ওর দৃষ্টি তীক্ষ্ম হয়ে উঠল। ছোট ছোট চাকতির মত ওখানে কি রয়েছে না? ছোকরা তখন পিছন ফিরে একটা ছবির ফ্রেম পুঁছতে ব্যস্ত। বাসব ছোঁ মেরে একটা চাকতি তুলে নিল।

আরো মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর বলল, তন্নজীবাবু এখনও তো এলেন না। আমি উঠলাম। পরে এসে দেখা করব।

ছোকরা নীরবে ঘাড় নাড়ল।

বাসব ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা সুকুমার পোলের অফিসে গিয়ে উপস্থিত হল। তিনি তখন অফিসেই ছিলেন। দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলি নিয়ে আলোচনা চলল।

বিদায় নেবার আগে বাসব মনে করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, ভাল করে খোঁজ করবেন। অন্য এরিয়ায় দরকার নেই, আপনার এলাকাটুকু হলেই চলবে।

শৈবালের সঙ্গে বাসবের দেখা হল বিকেলে।

—আজ সকালে এসে তোমার দেখা পাওয়া গেল না—কোথায় উধাও হয়েছিলে?

—বুনোহাঁসের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি, ডাক্তার।

মৃদু হেসে শৈবাল বলল, বুনোহাঁসরা তোমায় দৌড় করাচ্ছে জেনে খুশি হলাম। তবে অরুণ মুখার্জীর পিছনেও একটু ছুটোছুটি করলে ভাল হত না কি?

—ওর পিছনে ছোটবার কিছু নেই। ফেউ এর মত পুলিস লেগে আছে। আমি শুধু তার কার্যকলাপের সত্যতা সম্পর্কে মাথা ঘামাচ্ছি। কথাবার্তাও হয়েছে ওর ভগ্নীপতির বাড়িতে। এইতো কিছুক্ষণ আগে দুলারী বাঈ-এর সঙ্গে দেখা করে এলাম।

—তাই নাকি! ওই রহস্যময় মেয়েটিকে নেড়েচেড়ে কি বুঝলে!

—সুন্দরী দেহবিলাসিনীরা যেমন হয়, ঠিক সে রকম নয়। একটু উন্নত শ্রেণীর। রহস্যময় কথাটা ওর নামের আগে জুড়ে দিতে আমি কিন্তু মনের মধ্যে তেমন সায় পাচ্ছি না। সুকুমারবাবুর কাছে ও যা জবানবন্দী দিয়েছিল, তা তুমি শুনেছ। ডাঃ ব্যানার্জী মাঝে মাঝে ওকে নিজের কাছে ডাকতেন। সেদিন গিয়েছিল ওই রকমই এক আহ্বানে। হীরালাল মারা যাবার পর থেকেই পুলিস খর দৃষ্টি রেখেছে দুলালীর উপর। তারপর ডাঃ ব্যানার্জী মারা গেলেন। সেদিন ও দশটার সময় বাসায় চলে গিয়েছিল এবং ওর পরবর্তী অ্যাক্টিভিটি পুলিসের দৃষ্টিতে সন্তোষজনক। তাছাড়া, একজন মেয়েমানুষের পক্ষে দুজন লোককে ওইরকম নৃশংসভাবে খুন করা সম্ভব নয়।

—সে নিজে করেনি। কাউকে দিয়ে খুন দুটো করিয়ে থাকতে পারে তো?

—তা পারে। তবে অনর্থক কেউ লোক লাগিয়ে খুন করাবার রিস্ক নিতে

চায় না। একটা মোটিভ থাকা চাই। দুলারীই যদি পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে থাকে, তাহলে ওর মোটিভ কি? এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কিন্তু বিপরীত সম্ভাবনাই মনকে নাড়া দেবে। ডাঃ হীরালাল ও ডাঃ ব্যানার্জী বেঁচে থাকলে দুলারীর লাভ বেশি। নিয়মিত আয়ের পথ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধ করে দেবে কেন? আমার কি মনে হয় জান ডাক্তার, দুই ক্ষেত্রেই খুনের আগে দুলারীর উপস্থিতি একটা কে য়ান্সিডেন্স। খুনের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্কই নেই।

—কেসটা বেশ কমপ্লিকেটেড দেখা যাচ্ছে।

—ঠিকই বলেছ। কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা এখন মোটেই আন্দাজ করা যাচ্ছে না। আশার আলো দেখছি, আর নিভে যাচ্ছে। আজ সকালকার কথাই ধর না। তন্নজীবাবুর স্টুডিওতে গিয়ে কতকগুলো এলুমিনিয়ামের চাকতির সন্ধান পেলাম। ভাবলাম, যে গোল দাগগুলো জায়গায় জায়গায় দেখতে পাওয়া গেছে তার বুঝি সুরাহা হল। এখন আবার মনে হচ্ছে, কোন কাজের জিনিসই নয়। এই দেখ না -

বাসব পকেট থেকে চাকতিটা বার করে দেখাল।

—এ যে বনাত বা প্লাইউডের উপর ছবি আটকাবার লিংক।

- আমারও তাই মনে হচ্ছে। সন্দেহজনক দাগগুলোর সঙ্গে এই লিংকের সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক নয়। তাই বলে আমি যে কোথাও আশার আলো দেখতে পাইনি, একথা ভেবে আমার উপর আবার অবিচার কর না, ডাক্তার।

শৈবাল হেসে বলল, সে আলোর একটা রেখাও কি আমাকে দেখান যায় না?

—নিশ্চয় যায়।

বাসব পাইপ ধরাল।

—তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, প্রদ্যোত হালদার একটা চিঠি পেয়ে ভাগলপুরে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে জানা গেল চিঠিখানা জাল?

—মনে আছে।

—কাল তোমাকে একটা লেটার প্যাডের কাগজ দেখিয়েছি। ওটা আমি বিশেষ এক জায়গা থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলাম। পরীক্ষা করে দেখছি, জাল চিঠির কাগজের সঙ্গে এই লেটার-প্যাডের কাগজের কোন পার্থক্য নেই।

– লেটার প্যাডের কাগজখানা তুমি সংগ্রহ করেছিলে কোথা থেকে?

ডাঃ হীরালালের ডাক্তারখানা থেকে। তারপর শোন, আমি বুঝতে পেরেছি হত্যাকারীর একজন সহকারী আছে। তৃতীয়তঃ, ডাঃ হীরালাল গত দুমাসের মধ্যে চল্লিশ হাজার টাকা ড্র করেছিলেন ব্যাংক থেকে যার রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার। চতুর্থতঃ, প্রদ্যোত হালদারের হাওড়া থেকে ট্যাক্সি করে ফেরার পথে অজ্ঞান হয়ে যাবার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

- তার মানে? শৈবালের গলায় বিস্ময়ের আমেজ।

পাইপে বারকতক ঘন ঘন টান দিয়ে বাসব বলল, তার মানে, মিত্রভিলার

এক মালির সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে তার কাছ থেকে জানতে পেরেছি, খুন হওয়ার পরের দিন ভোরে একজনকে সে কম্পাউন্ডের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখেছিল। বেরিয়ে যাবার সময় ভাল করে দেখে, তিনি প্রদ্যোত হালদার।

বাসবের ওখান থেকে ফিরে সাড়ে নটার মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরেই শুয়ে পড়েছিল শৈবাল। লেপের মধ্যে গরম বিছানায় ঘুম আসতে বিশেষ বিলম্ব হয়নি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল কে জানে। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল নিচে একটানা কলিং বেল বেজে চলেছে।

এতরাত্রে আবার কে এল? অনিচ্ছার সঙ্গেই শৈবাল বিছানায় উঠে বসল। বাড়িতে সে একলাই আছে। সোনা এখনও ফিরে আসেনি শ্যামবাজার থেকে। চাকরটাও বাড়ি নেই। কাজকর্ম সেরে প্রতিদিনই সে চলে যায়। অগত্যা ওকে উঠতে হল। একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, নিচে নেমে এসে বারান্দায় আলো জেলে দরজা খুলল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে দেখেই শৈবাল চমকে উঠল। ওভালটিন কালারের ওভারকোটে সারা দেহ আচ্ছাদিত আগন্তুকের। মাথার ফেল্ট হ্যাট যতদূর সম্ভব নামান। মুখের নিম্নাংশের দাড়ির আভাস পাওয়া যাচ্ছে শুধু।

ডাঃ হিরণ্ময়ের বাড়িতে যে আগন্তুকের আগমন হয়েছিল, তার সঙ্গে সাদৃশ্যে কোথাও যেন গরমিল নেই।...তবে কি...

শৈবালকে সচকিত করে আগন্তুক বলল খনখনে গলায় আমি বোধহয় ডাঃ রায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

—হ্যাঁ, আমিই শৈবাল রায়।

—আপনাকে এখুনি যেতে হবে আমার সঙ্গে। পেশেন্টের কন্ডিশন খুব সিরিয়াস।

শৈবাল কাঁপা গলায় বলল, আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করি না।

—জানি। আপনি একটি হাসপাতালের সার্জিকাল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। আপনি রেডি হয়ে নিন।

—আমার পক্ষে হয়ত কোন জটিল রোগের ডাইগোনিসিস করাই সম্ভব হবে না।

—সে জন্য আপনাকে চিন্তিত হতে হবে না।

আগন্তুক একরকম জোর করেই ঘরে প্রবেশ করল। শৈবালের দেহে অবশ্য শক্তির অভাব নেই তবে ও যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। ঘরের জিরো পাওয়ারের মিটমিটে আলোতে আগন্তুককে আরও ভয়াবহ দেখাতে লাগল।

এবার শৈবাল নিজেকে ফিরে পেল।

দৃঢ় গলায় বলল, আপনি ভুল করেছেন। এত রাত্রে আমার পক্ষে কল অ্যাটেন্ড করা কোনমতে সম্ভব হবে না।

—ভুল অবশ্য আমি করিনি। স্বেচ্ছায় আপনি যাবেন না, তা আমি জানি।

দেখছেন, আমার হাতে কি আছে ?

শৈবাল দেখল, আগন্তুকের দস্তানা মোড়া হাতে একটা রিভলভার শোভা পাচ্ছে।

— কাজেই ডাঃ রায়, যেতে আপনাকে হবেই।

আগন্তুক এগিয়ে গিয়ে চেয়ারের উপরে রাখা গ্রেটকোটটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল। যন্ত্রচালিতের মত কোটটা পরে নিল শৈবাল।

আগন্তুক আদেশের সুরে বলল, চলুন। বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে।

রাস্তায় অপেক্ষমান গাড়িতে এসে শৈবাল ও লোকটি বসল। কাচগুলো সব তোলা। আরো সাবধানতার জন্য পর্দা টানা রয়েছে তার উপর। বাইরের কিছু নজরে পড়বার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। এমনকি ড্রাইভারকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না, মাঝে পর্দা থাকার দরুণ। আগন্তুক নিজের হাঁটুর উপর রিভলবার সমেত হাত রেখে নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

শৈবাল চিন্তার জালে ক্রমেই জড়িয়ে পড়তে লাগল। এমন দুর্বিপাকে মানুষ পড়ে? দ্রুতগতিতে গাড়ি এগিয়ে চলল। কোন পথ দিয়ে কোথায় চলেছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মিনিট কুড়ি কাটল এইভাবে। শৈবালের মনে হল, শহরের কেন্দ্রস্থলকে পিছনে ফেলে ওরা শহরতলীর দিকে এগিয়ে চলেছে। কোন-দিকের শহরতলী? এই সময় গাড়ির গতি মন্দীভূত হয়ে এল। তারপর থেমে গেল।

শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল আগন্তুক। চারিধার নিবিড় অন্ধকার। থেকে থেকে নাম-না-জানা পোকারা ডেকে উঠছে। সেই অন্ধকার মধ্যেই শৈবাল অনুভব করল, ওরা কোন বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

আগন্তুক বাঁহাত দিয়ে পকেট থেকে বার করে আনল একটা টর্চ। টর্চের বোতাম টিপতেই ছড়িয়ে পড়ল এক ঝলক আলো। শৈবাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আলোর বিস্তারের দিকে। ওর অনুমান মোটামুটি সত্যি। কোনকালে সেখানে বাগান নিশ্চয় ছিল বর্তমানে তার সে রূপ নেই। বর্তমানে অযত্নে বর্ধিত গাছ পালা যত্রতত্র।

—এগিয়ে চলুন। খনখনে গলায় আগন্তুক আদেশ দিল।

হাত পনের এগোবার পরই একটা দরজা পাওয়া গেল।

একইভাবে রিভলভার হাতে চেপে আগন্তুক বলল, দরজার হাতলটা টানুন।

হাতলের উপর টর্চের আলো এসে পড়ল।

শৈবাল হাতল ধরে টানতেই দরজা খুলে গেল। ও প্রবেশ করল ভিতরে, পিছু পিছু আগন্তুকও –। ঘরে জোরাল আলো না থাকলেও পরিষ্কার সমস্ত কিছু দেখা যায়। সুন্দরভাবে সাজান। কোন ধনী ব্যক্তির ড্রইংরুম বলেই মনে হয়।

— বসুন।

সোফায় বসল শৈবাল।

—পেশেণ্টের কাছে যাওয়ার আগে আপনার একটা কথা জেনে নেওয়া দরকার। ওষুধপত্র দিয়ে সুস্থ করে তোলার মত কোন রোগ রুগীর হয়নি। তার প্রয়োজন একটা অপারেশনের। তলপেটের বিশেষ দিক থেকে একটা গ্ল্যান্ড কেটে বার করে দিতে হবে। আর তার জায়গায় বসিয়ে দিতে হবে নতুন একটা গ্ল্যান্ড। আশ্চর্য হচ্ছেন বোধহয়। অপারেশনটা একটু নতুন ধরনের। চলুন—

বিস্মিত শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে লোকটি এগিয়ে চলল। করিডর অতিক্রম করে মাঝারি সাইজের একটি ঘরে এল ওরা। এই ঘরে বিশেষ আসবাবপত্র নেই। ঘরের ঠিক মাঝখানে অপারেশন টেবিলের উপর কে একজন শুয়ে আছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। সমস্ত শরীর কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা। সিলিং থেকে ঝোলান বিরাট মুভিং লাইটটা অপারেশন টেবিলের কয়েক হাত উপরেই রয়েছে। অপারেশনের সুবিধার জন্যই এই ব্যবস্থা, শৈবাল বুঝতে পারল। ঘরের এক কোণে আরো একটি ছোট টেবিল রয়েছে। সেই টেবিলের উপরকার ট্রেতে রাখা রয়েছে অপারেশনের প্রয়োজনীয় সমস্ত যন্ত্রপাতি। ওষুধপত্রও রয়েছে কিছু। আধগামলা জলও রয়েছে। জল থেকে ধোঁয়া উঠছে; সুতরাং গরম। দস্তানা জোড়া রাখা রয়েছে গামলার পাশেই।

ব্যবস্থাপনায় কোথাও কোন ফাঁক নেই। ওকে এখানে আনা নিশ্চিতভাবে সম্ভব হবে, এ সম্পর্কে যেন এদের কোন সন্দেহ ছিল না। অনিচ্ছার সঙ্গে শৈবাল এবার দৃষ্টি ফেরাল আগন্তুকের দিকে।

সমস্তই রেডি রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এবার আপনাকে কাজ আরম্ভ করতে হবে। কোনরকম চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না, মৃত্যু অবধারিত তাহলে।

–সমস্তই আমার গোলমেলে ঠেকছে। অপারেশন কিভাবে···

—সেজন্য চিন্তিত হবেন না। পেশেণ্ট এখন সেন্সলেস। পেটের উপরকার কাপড় সরালেই দেখতে পাবেন, চামড়ার এক জায়গায় লাল রঙের চৌকো দাগ। ওই দাগ দেওয়া স্থানটুকু কেটে আপনাকে গ্ল্যান্ডটা বার করে আনতে হবে।— এধারে দেখুন, ওই তাকের উপর একটা জার দেখতে পাচ্ছেন?

আগন্তুক আঙুল তুলে একটা তাক নির্দেশ করল। শৈবাল সেদিকে তাকিয়ে দেখল, তাকের উপর রাখা একটা জারে স্পিরিট বা অন্য কিছুর মধ্যে ডোবান আছে কিছু। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

সেই লোকটা আবার নিজের খনখনে গলায় বলল, বিশেষ এক আরকে গ্ল্যান্ড দুটো ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। ওর মধ্যে থেকে একটা নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে। আর দেরি করবেন না, এবার কাজ আরম্ভ করুন।

হলিউডের কি একটা ছবি দেখেছিল শৈবাল—তাতে রিভলবার দেখিয়ে নায়ককে সমস্ত কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেদিন নায়কের ব্যবহার ওর মনে হয়েছিল কাপুরুষোচিত - আর আজ, ওরই জীবনে ঠিক একই দুর্বিপাক নেমে এসেছে।

গ্রেটকোট খুলে ফেলল শৈবাল। জারটা নামিয়ে এনে টেবিলের উপর রাখল।

দাস্তানা গলিয়ে নিল হাতে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল জ্ঞানহীন লোকটির কাছে। পেটের উপরকার কাপড় সরিয়ে দিল ও। তলপেটের একটু উপরে লালরঙের চৌকো দাগ কাটা। এই জায়গাতেই চালাতে হবে ছুরি। এরকমভাবে অপারেশন কেউ কখনও বোধহয় করেনি।

শৈবাল মুখ ফিরিয়ে দেখল, ওর পাহারাদার রিভলবার হাতে স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। দাড়ির কিছু অংশ ছাড়া মুখের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

সে বলল, নার্স নিয়ে কাজ করাই আপনাদের অভ্যাস। এখানে আপনাকে একলাই সব সামলাতে হবে।

শৈবাল আর বাক্যব্যয় না করে কাজে মন দিল।

কেটে যেতে লাগল মিনিটের পর মিনিট।

তারপর

ঘর্মাক্তকলেবর শৈবাল সোফায় বসেছিল। অপারেশন শেষ করে পরিশ্রম ও ক্লান্তিতে এই শীতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছে। সত্যিই, এরকম অপারেশন কেউ কখনও করেনি। ডাক্তার রুগীর মুখ পর্যন্ত দেখতে পেল না, অথচ মারাত্মক কাটাছেঁড়া হয়ে গেল।

রিভলবার হাতে অদূরে দাঁড়িয়ে লোকটি।

—আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। টিপয়ের উপর এক গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াস রাখা আছে। খেয়ে ফেলুন, ক্লান্তি দূর হবে।

শৈবাল হাত বাড়িয়ে গেলাস তুলে নিল। গলা শুকিয়ে উঠেছিল। এক নিঃশ্বাসে পানীয়টুকু শেষ করল। কিন্তু একি! শরীর এমন গুলিয়ে উঠছে কেন? মাথার উপর নেমে আসছে হাজার মনের বোঝা! ও সোফায় এলিয়ে পড়ল ধীরে ধীরে।

ভোর হয়ে যাবার পর শৈবালের জ্ঞান ফিরল।

ও চোখ মেলে তাকাল। এখনও মাথা ঝিমঝিম করছে।

মনে পড়ে গেল একে একে সব। কোথায় শুয়ে আছে এখন? কোনরকমে উঠে বসল শৈবাল। একি, এ যে নিজের বাড়ির বারান্দাতেই এতক্ষণ শুয়েছিল। অজ্ঞান হয়ে যাবার পর তারা এখানে ওকে রেখে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে শৈবাল বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। কালকের ঘটনা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে এখন। শৈবাল টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়েল করল—কিছুক্ষণ পরে অপর প্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল, হ্যালো –

কে, বাসব – আমি ডাক্তার কথা বলছি—এখুনি চলে এস আমার এখানে –

শৈবাল বিছানায় শুয়ে রয়েছে।

ধীরে ধীরে ও কালকের অভিজ্ঞতার বর্ণনা শেষ করল!

বাসব ওর সামনে একটা চেয়ারে বসে শুনে যাচ্ছিল। শৈবালের বলা শেষ হলে শান্ত গলায় বলল, আমি শুধু ভাবছি, কি দুরন্ত দুঃসাহস লোকটার।

—কেন ?

—বুঝতে পারছ না ? তুমি যে-কাজটা করে এলে তা অন্য কাউকে দিয়ে করান যেত, তবু তারা তোমাকে নিয়ে গিয়ে চরম স্পর্ধার সঙ্গে জানিয়ে দিল যে, তারা আমাকে কেয়ারের মধ্যেই আনে না।

বাসব চেয়ার থেকে উঠে বার-দুই পায়চারি করল।

শৈবালের সামনে এসে আবার বলল, তবে স্পর্ধার উত্তর আমি দেব।

—কিভাবে ?

—সমস্ত কিছুই ক্রমশঃ প্রকাশ্য। যাক, কালকের ঘটনায় গোটাকতক ..ভ কিন্তু আমাদের হয়েছে।

—যথা ?

যথা এক নম্বর, যে দুটো খুন হয়েছে তাতে হত ব্যক্তির শরীর থেকে গ্ল্যাণ্ড সংগ্রহ করা খুনীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। দু নম্বর, কোন বিশেষ শারীরিক অসুস্থতার দরুণ, হত্যাকারীদের একজনের এই গ্ল্যাণ্ডের প্রয়োজন ছিল। তিন নম্বর, দুষ্কৃতকারীরা অন্তত দুজনের একটি দল। চার নম্বর, সমস্ত জিনিস যেভাবে সাজান ছিল—এমনকি তোমার পানীয়টুকু পর্যন্ত, তাতে মনে হয়, ওরা একরকম নিশ্চিত ছিল তোমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে।

শৈবাল বলল, ডাঃ হিরণ্ময়কেও এরা এইভাবে অ্যাটেম্পট নিয়েছিল—কিন্তু তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেনি। কারণ, বাড়িতে বহু চাকরবাকর ছিল এবং সকলেই সে সময় সজাগ ছিল। রাত্রি আরো গভীর হলে, তাঁকেও

ওকে থামিয়ে বাসব বলল, আচ্ছা ডাক্তার, ওই গ্ল্যাণ্ড অপারেশনের বিষয় মেডিক্যাল সায়েন্স কি বলে ?

— এখানে মেডিক্যাল সায়েন্স ফেল করেছে, ভাই। অবশ্য জ্ঞান আমার খুবই অল্প। কাজেই বলা শক্ত, এ ধরনের অপারেশনের কি উপকারিতা।

—আরেকটা জিনিস এখানে লক্ষণীয়, গ্ল্যাণ্ড দুটো যে কোন সাধারণ লোকের দেহ থেকেই সংগ্রহ করা যেত, কিন্তু তা হয়নি। দুজন ডাক্তারকে হত্যা করা হয়েছে এর দরুণ।

– দুটো গ্ল্যান্ড কেন ? একটাতেই তো কাজ মিটে গেছে।

—বোধহয় একটাতে অপারেশন সাক্সেসফুল না হলে দ্বিতীয়টা কাজে লাগাবার জন্যেই দুটো গ্ল্যাণ্ড সংগ্রহ করা হয়েছিল।

বাসব পাইপ ধরাল।

বারকতক টান দিল তাতে। চেয়ারে এসে বসল।

শৈবাল এবার দ্রুত গলায় বলল, একটা কথা বলতে তোমায় ভুলে গেছি। আমি কাল ওদের চোখ বাঁচিয়ে একটা ছুরি নিয়ে এসেছি ওখান থেকে।

—ছুরি ?

—হ্যাঁ।

—দেখি—

—অপারেশন করবার সময় একটা ছুরি আমি কায়দা করে নিজের পকেটে ফেলে দিই। যদি কোন ক্লু পাওয়া যায় তার থেকে···

—ভালই করেছ। কোথায় ছুরিখানা ?

—ওভারকোটের পকেটে রয়েছে, বার করে নাও।

বাসব উঠে গিয়ে আলনায় রাখা ওভারকোটের পকেট থেকে ছুরিখানা বার করল। ইঞ্চি তিনেক লম্বা হবে ছুরিখানা।

স্টীলের বাঁট। বাঁটের একপাশে ছোট অক্ষরে লেখা রয়েছে 'মেড ইন ইংলণ্ড'।

বাসব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

দিন-দুই ভীষণ ব্যস্ত ছিল বাসব।

ওর সঙ্গে শৈবালের মোটেই দেখা হচ্ছিল না।

সশব্দে সাতটা বাজল।

বাসব ঘরে প্রবেশ করল।

শৈবাল সোফায় বসে আমেরিকান ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছিল। ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল বাসব। নিজের ক্লান্ত দেহটাকে সোফার উপর ঢেলে দিল।

—তোমার দেখা পাওয়া ক্রমেই ভার হয়ে উঠছে। শৈবাল বলল, কি ব্যাপার বল তো ? বাসব নিজের ঠোঁটের ফাঁকে পাইপটা গুঁজে দিতে দিতে বলল আমার মনে হয়, কাল-পরশুর মধ্যেই হত্যাকারী ধরা পড়বে।

—বল কি ? কে কে সে ?

—সে যে কে—জানি, আবার জানিও না। অনুমানের উপর ভেসে বেড়াচ্ছি এখনও। তবে আমার অনুমান যদি সঠিক প্রমাণিত হয়, তবে একটু আশ্চর্যই হব। দেখ ডাক্তার, পাশব মনোবৃত্তি, নগ্নতা ও বিবস্ত্রতার যুগ কাটিয়ে আমরা হাজার হাজার বছর এগিয়ে এসেছি। তবু আমরা সভ্যতার চরম শিখরে উঠেও সময় সময় নিজের মনের পশুভাবটাকে চেপে রাখতে পারি না। এই হত্যা দুটোর কথাই ধর না। কত নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এতে !

—সত্যি, খুন দুটোর কথা ভাবলেও গা ঘিনঘিন করে।

যাক্ ও কথা। আমি 'রায় এ্যাণ্ড সিনহা মোটার্সে' গিয়েছিলাম।

—কি বললে ওরা ?

—ওরা বললে, ডাঃ হীরালালের গাড়ি এখনও সেখানে বে-মেরামত অবস্থায় পড়ে আছে ; জটিল যান্ত্রিক গোলযোগের দরুণ একফুটও চলবার ক্ষমতা নেই ও গাড়ির।

—তবে যে সেদিন ? তাহলে কি অন্য গাড়িতে ডাঃ হীরালালের গাড়ির নম্বর

লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

—একজ্যাক্টলি। তোমার চুরি করে আনা ছুরিটা সম্বন্ধেও জানতে পেরেছি দু' একটা কথা। গোটা কয়েক সার্জিক্যাল দোকানে খোঁজ নিয়েছিলাম। 'সেন অ্যাণ্ড সন্স' থেকে হপ্তাদুয়েক আগে একজন কিছু ইন্সট্রুমেন্ট কিনে নিয়ে যায়। এই ছুরিটা তার মধ্যেই ছিল। ক্রেতার সম্বন্ধে তাঁরা বলেছেন, তাঁদের যতদূর মনে পড়ছে, একজন ড্রাইভার শ্লিপ দেখিয়ে জিনিসগুলো কিনে নিয়ে যায়।

তারপর ?

—তারপর আর কি। কাল সন্ধ্যার পর সকলকেই ডেকেছি একবার এ বাড়িতে। নাটক শেষ হবার আগে যেমন শেষ চরম নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি হয়, হিসেবে ভুল না হলে তেমনি একটি দৃশ্যের অবতারণা হবে কাল।

সেণ্টার টপের উপর পাইপটা রেখে বাসব আবার বলল, কাল সকালে ইন্সপেক্টর পোলের সঙ্গে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যাবে। কি বিষয়ে খোঁজ নিতে হবে, আমি তোমাকে আগেই বলেছি—

শৈবাল ঘাড় নাড়ল।

অবশ্য আজ রাত্রেও একটা প্রোগ্রাম আছে। তোমাকে থাকতে হবে আমার সঙ্গে।

শৈবাল প্রশ্ন করল, প্রোগ্রাম ?

—হ্যাঁ হে—নৈশ-বিহার।

মৃদু হাসল বাসব।

দুটো সাইকেল সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল আগে থেকে।

সাড়ে এগারটার পর বাসব ও শৈবাল হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীট থেকে বেরুল।

শীতের রাত্রি।

দুজনের গায়ে প্রচুর গরম কাপড় রয়েছে. তবু ঠাণ্ডায় ওদের হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। কলকাতায় শীত এবার পড়েছেও জব্বর।

দুজনে নীরবে সাইকেল চালিয়ে চলল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সাইকেল থেকে নামল ওরা।

পথ সম্পূর্ণ জনমানব শূন্য।

বাসব তবু চাপা গলায় বলল, ডাক্তার, তুমি সাইকেল দুটো নিয়ে এখানে অপেক্ষা কর। আমি কাজটা সেরে আসি।

—কিন্তু....

—ভয় নেই, আমি তাড়াতাড়িই ফিরব।

—আমি বলছিলাম, তুমি ভিতরে ঢুকবে কিভাবে ?

বাসব পকেট থেকে একগোছা চাবি বার করল।

—এই গোছার একটা না একটা চাবি আমাকে সাহায্য করবেই।

—এদিকে বীটের কনেস্টবল যদি দৈবাৎ আমাকে দেখে ফেলে, তখন ?

—তখন ঝামেলা অবশ্য একটু হবে। যদিও থানায় আমি আগেই এ বিষয়

আলোচনা করে এসেছি। যাই হোক, তুমি নজর রাখ। কেউ এসে পড়লেই আমাকে ইশারা করবে।

শৈবাল দোতলা একটা বাড়ির দেওয়াল ঘেঁসে সাইকেল দুটো নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর সতর্ক দৃষ্টি চারিধারে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে।

বাসবের দেখা নেই।

শেষে প্রায় এক ঘণ্টা পরে বাসব ফিরে এল। কাগজে মোড়া কি একটা ওর হাতে রয়েছে।

—ওটা কি? শৈবাল প্রশ্ন করল।

—পরিশ্রমের পুরস্কার! চল—

বাসবের সঙ্গে সুকুমার পোলের দেখা হল দুপুরবেলা।

—বাসবই গিয়েছিল থানায়।

ওকে দেখে ইন্সপেক্টর প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

—অনেক কথা আছে, মশাই।

—কথা?

অনেক ব্যাপার ঘটেছে আর কি। আপনি না এলে আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই টেলিফোন করতাম।

বলুন, শুনি।

- তার আগে আপনাকে একটা জিনিস দেখাই।

সুকুমার পোলে চেয়ার ছেড়ে ঘরের এক প্রান্তে চলে গেলেন। সেখানে একটা আলমারি ছিল। আলমারির মধ্যে থেকে বাঁধান বই-এর মত কি একটা বার করে নিয়ে আবার ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে বাসব পাইপ ধরিয়েছে।

—এটা চিনতে পারেন?

সবিস্ময়ে বাসব বলল, একি! এ যে ডাঃ হীরালালের ডায়েরী দেখছি?

- এই ডায়েরীখানাই তো আপনার বাড়ি থেকে চুরি গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। আপনি পেলেন কোথা থেকে?

একটু ভারিক্কি চালে হেসে ইন্সপেক্টর বললেন, চুপচাপ যে বসে নেই, দেখতেই পাচ্ছেন। ডায়েরীটা উদ্ধার করেছি অনেক কায়দা করে। বলতে পারেন, মালসমেত আসামীকে ধরেছি।

- আগ্রহ আমার ক্রমেই বেড়ে চলেছে, ইন্সপেক্টর। খুলে বলুন ব্যাপারটা।

সুকুমার পোলে এবার বললেন, সমস্ত কথা।

তিনি যা বললেন তা সাজালে এই রকম দাঁড়ায়—

প্রদীপ বেশ চটপটে ছেলে। বছর দুয়েক হল পুলিসে ঢুকেছে—ইতিমধ্যেই উপরওয়ালাদের বেশ বিশ্বাসভাজন। ওকেই নিয়োগ করা হল দুলারী বাঈয়ের

মুভমেণ্ট চেক করার কাজে। প্রদীপ বেশ উৎসাহের সঙ্গেই এই কাজের ভার নিয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই হাঁপিয়ে উঠতে লাগল একঘেয়ে ডিউটির আওতায় পড়ে।

সন্দেহজনক কিছু চোখেই পড়ে না। এমনকি নতুনত্বেরও কিছু নেই। দুলারী বাঈ যে বাড়িতে থাকে, সেই বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে ব্যবস্থা করে রাত নটা থেকে দুটো পর্যন্ত তার ঘরে বসে থাকে। দারোয়ানের ঘর সিঁড়ির প্রায় মুখে—উপরে কারা যাচ্ছে এবং কারা নামছে অনায়াসে দেখা যায়। বলাবাহুল্য, প্রদীপের গায়ে পুলিসের পোশাক থাকে না। দেখলে মনে হবে, দারোয়ানের কোন আত্মীয়।

দোতলা থেকে একটানা গানের সুর ভেসে আসতে থাকে। ঐ সঙ্গে প্রদীপের কানে এসে বাজে, বাহবা—কেয়া খুব—কেয়া খুব ইত্যাদি। দুলারীর সুরলহরী আর শ্রোতাদের প্রশংসাসূচক ধ্বনি কানে বাজতে থাকে প্রায় সাড়ে এগারটা পর্যন্ত।

তারপর চুপচাপ।

এবার যাঁরা আসেন, তাঁরা গান শুনতে নয়। তাঁরা আসেন, দুলারী বাঈ-এর সৌন্দর্যমণ্ডিত দেহটিকে সম্পূর্ণ নিজের করে পেতে। নানা জাতের মানুষের আসা-যাওয়া। এদের মধ্যে মধ্যবয়স্ক লোকের সংখ্যাই অধিক। প্রদীপের হতাশ হবারই কথা। ডাঃ হীরালাল বা ডাঃ ব্যানার্জীর সঙ্গে যাঁরা নানা সূত্রে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে কাউকেই দেখতে পাওয়া যায় না।

গতকাল রাত্রে কিন্তু সমস্ত একঘেয়েমির অবসান ঘটল।

প্রদীপের ভাষায় এত অপেক্ষার পর বাঘকে গুটিগুটি ফাঁদের দিকে এগোতে দেখা গেছে। রাত তখন পৌনে একটা। আজ দুলারীর কোঠায় লোকের আনাগোনা অনেক কম। প্রদীপের মনে হল, এই মাত্র মোটাসোটা যে মাড়োয়াড়িটি নেমে গেল - সেই বোধহয় দুলারীর ঘরে আজকের শেষ মানুষ।

প্রদীপ হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙ্গল। আজ আর দুটো পর্যন্ত থাকবে না, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। সিগারেট ধরিয়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছে, সিঁড়ির মুখের আলো নিভে গেল। কি রকম হল যেন? বাড়িতে ঢোকার দরজার পাশেই সুইচ আছে। কেউ কি ভেতরে পা দিয়েই আলো নিভিয়ে দিয়েছে? প্রদীপ ভালভাবে চিন্তা করে দেখার আগেই লক্ষ্য করল, সিঁড়ি বেয়ে একজন উপরে উঠে যাচ্ছে। উপরের বারান্দায় আলো জ্বলতে থাকায় সিঁড়ি অন্ধকারে ডুবে যায়নি। আবছা অন্ধকারের মধ্যে আগন্তুককে চেনা গেল না।

আগন্তুকের সতর্কতা লক্ষ্য করে প্রদীপের মনে হল, ওর আকাঙ্ক্ষিতদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়। আগন্তুক অদৃশ্য হয়ে যাবার পরই ও উপরে উঠে গেল। দুলারীর ঘরের পর্দা নড়ছে। ঐ ঘরেই ঢুকেছে নিঃসন্দেহে। দরজাও বন্ধ হয়ে গেল এই সময়। প্রদীপ নিরুপায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের মধ্যে দুজনের কি ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে কোনমতেই আর শোনবার উপায় নেই। অনিচ্ছার সঙ্গে প্রদীপ

নিচে নেমে এল। জোরাল আলোর মধ্যে ওখানে সং-এর মত দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি ?

নামতে নামতে একবার ওর মনে হল, এমনও হতে পারে, ওর সন্দেহ অমূলক। দুলালীর কোন ধনী মক্কেল, সকলের চোখ বাঁচিয়ে এইভাবে হয়ত আসা-যাওয়া করে। দারোয়ানের ঘরের সামনে এসে ও আরো একটা কথা চিন্তা করল, নিচেকার আলো আবার জেলে দিলেই তো হয়। আগন্তুক নিচে নামলেই তার মুখ দেখতে পাওয়া যাবে।

আলো জ্বালাবার অবসর কিন্তু প্রদীপ পেল না। সুইচের দিকে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে – ঝড়ের মত আগন্তুক ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। না, আর কোন সন্দেহ নেই। দুলালীর কোন মক্কেল হলে কি এত তাড়াতাড়ি চলে যেত ?

তাড়াতাড়ি প্রদীপ রাস্তায় চলে এল। বলাবাহুল্য, আগন্তুকের চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না। আর সাতপাঁচ ভেবে কি হবে থানায় খবর দেওয়াই ভাল। এত রাত্রে ট্রাম-বাস তো নেই, ট্যাক্সির অপেক্ষায় বৃথা দাঁড়িয়ে না থেকে হেঁটেই চলল।

এর পরের ইতিহাস হল, রাত্রেই পুলিস হানা দিল দুলালীর কোঠায়। সন্দেহ-জনক আগন্তুক সম্পর্কে সে অজ্ঞতা প্রকাশ করল। এমনকি পুলিসের পুনঃ পুনঃ আগমনের জন্য সে বিলক্ষণ বিরক্ত হল। তার এই ধরনের কথাবার্তা পুলিসের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। তারা তৈরি হয়ে এসেছিল। এরপর খানাতল্লাসি চালান হল। খাটের গদির তলা থেকে পাওয়া গেল ডাঃ হীরালালের ডায়েরীটা।

সুতরাং পুলিস দুলারীকে গ্রেপ্তার করে এনেছে।

সমস্ত শোনার পর বাসব বলল, নাটক বেশ ভালই জমেছে, কি বলেন ?

ইন্সপেক্টর হেসে বললেন, তা আর বলতে।

—দুলারীর পেট থেকে অনেক জরুরী কথা বার করা সম্ভব হয়েছে নিশ্চয় ?

—এখনও তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়নি। সমস্ত কিছু সারতেই তো ভোর হয়ে গেল। ওকে লক আপে রেখে বিশ্রাম করতে গিয়েছিলাম। এই তো ফিরছি কোয়া-র্টার থেকে। আপনি এসে পড়ায় ভালই হয়েছে। চলুন, ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক।

সুকুমার পোলে বাসবকে সঙ্গে নিয়ে লক-আপে এলেন।

গরাদে-দেওয়া দরজার এ প্রান্ত থেকেই দুলারীকে দেখা গেল। মুহ্যমান অব-স্থায় বসে রয়েছে। জমকালো পোশাক ও অনিন্দ্য চেহারার অধিকারিণীকে ঐ ছোট খুপরির মধ্যে অত্যন্ত বেমানান মনে হচ্ছে। তালা খুলে দুজনে ভেতরে ঢোকবার পরই সে উঠে দাঁড়াল।

সুকুমার বললেন, এবার আপনার উচিত আমাদের সমস্ত কথা পরিষ্কার করে বলা।

শ্রান্ত গলায় দুলারী বলল, যা বলবার আমি গতরাত্রেই বলেছি।

—একগাদা মিথ্যা কথা বলে আমাদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছেন। ডাঃ হীরালালের ডায়েরী যখন আপনার কাছে পাওয়া গেছে তখন দায়িত্ব অস্বীকার

করতে পারেন না।

বাসব বলল, যদি আপনি প্রকৃত তথ্য আমাদের না জানান তবে দুটো খুনের ব্যাপারেই গভীরভাবে জড়িয়ে পড়বেন। একবার কেস কোর্টে ওঠার পর সহজে যে রেহাই পাবেন না বুঝতেই পারছেন।

দেখুন আমি বিশেষ কিছুই জানি না। একজন ডায়েরীটা আমার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। পরে এ নিয়ে এত ব্যাপার হবে, বুঝতে পারিনি।

ইন্সপেক্টর বললেন, সেই লোকটি কে?

ক্ষমা করবেন। তাঁর নাম আমি বলতে পারব না।

কেন?

একটু দৃঢ়তার সঙ্গে দুলারী বলল, আমাদের ব্যবসার এই রেওয়াজ। উনি আমাকে নানারকম সাহায্য করেন।

—নামটা বললে ভাল হত?

—বলতে পারলে নিশ্চয়ই বলে দিতাম।

বাসব বলল, ওই লোকটিই কি ডাঃ হীরালালের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল?

হ্যাঁ।

ডাঃ ব্যানার্জীর সঙ্গে?

ডাঃ হীরালাল।

আসুন ইন্সপেক্টর, আমরা বাইরে যাই। এখানে সময় নষ্ট করে আর লাভ নেই।

কি একটা বলতে গিয়েও বললেন না সুকুমার পোলে। বাসবকে অনুসরণ করে বাইরে এলেন।

দরজায় তালা লাগিয়ে, অফিসরুমের পথে আসতে আসতে তিনি বললেন, কোন কথাবার্তাই তো হল না। অবশ্য আমি জানি, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। শেষ পর্যন্ত অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

—আপনাকে কিছুই করতে হবে না। লোকটিকে আমি আন্দাজ করে ফেলেছি।

আপনি কার কথা বলছেন? আমার পরিচিত কেউ কি?

নিশ্চয়ই। চলুন, আগে গিয়ে বসা যাক অফিসে, তারপর বলছি।

অফিস ঘরে এসে বসবার পর, বাসব পাইপ ধরিয়ে বলল, ডাঃ হীরালালের সঙ্গে দুলারীর পরিচয় কার করিয়ে দেওয়া সম্ভব, একবার ভেবে দেখুন।

- ডাঃ হীরালালের খুব কাছাকাছি লোক।

একজ্যাক্টলি। আমাদের জানা লোকেদের মধ্যে একজনকে ডাঃ হীরালালের কাছাকাছি দেখতে পাচ্ছি—প্রদ্যোত হালদার। দুলারীর সঙ্গে হয়ত তাঁর আগে থেকে পরিচয় ছিল। রসিক ডাক্তারের মনের সন্ধান পেয়ে তাঁকে ভিড়িয়ে দিয়েছিলেন তার সঙ্গে।

—কিন্তু ডায়েরীটা চুরি করার কি অর্থ?

, — সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আমি আগেই এসে পেঁছেছি। আজ সন্ধ্যায় সমস্ত কিছু জানতে পারবেন। সকলকে অনুগ্রহ করে জানিয়ে রাখবেন, সাড়ে ছ'টার মধ্যেই প্রত্যেকে যেন আমার হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে আসেন। এখন আমি উঠি। ভাল কথা, আমার অনুমানের সত্যতা সম্পর্কে একটা পরীক্ষা চালান যেতে পারে। ডায়েরীর উপর থেকে ফিঙ্গারপ্রিণ্ট তোলবার ব্যবস্থা করুন। ডাঃ হীরালাল ছাড়া এই ডায়েরীতে হাত দিয়েছে পাঁচজন অমিতাভ গাঙ্গুলী, আমি, আপনি, দুলারী ও চোর। সুতরাং এই ডায়েরী থেকে যদি প্রদ্যোত হালদারের ফিঙ্গারপ্রিণ্ট ওঠে তাহলে বুঝতে হবে, এরই নাম দুলারী করতে চাইছে না এবং এই ব্যক্তিই ডায়েরী চোর।

—হুঁ। দুলারীকে নিয়ে এখন কি করব—বলুন তো ?

—এখন যেভাবে আছে, থাক। চলি—

বাসব বিদায় নিল।

সাড়ে ছটা তখনও বাজেনি।

একে একে আসছেন সকলে।

প্রথমে সুকুমার পোলে এলেন। তারপর মলয় গাঙ্গুলী ও প্রদ্যোত হালদারকে আসতে দেখা গেল। তরুণ মুখার্জী এল। এরপর এলেন ডাঃ হিরণ্ময়। এবং তন্নজী এল তার মিনিট কয়েক পরে। বাহাদুর সকলকে কফি পরিবেশন করে গেল।

বাসব ও শৈবাল বসেছিল পাশাপাশি।

বেহালা থেকে অমিতাভ গাঙ্গুলীও এই সময় এসে উপস্থিত হলেন। শৈবাল পর্যায়ক্রমে সকলের মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। অনেকের মুখে পরিষ্কার অসন্তোষের ছাপ।

সকলের কফি পান শেষ হয়েছে লক্ষ্য করে বাসব শান্ত গলায় বলল, এইভাবে আহ্বান করে আপনাদের অনেকের মনে বিরক্তির উদ্রেক করার জন্য আমি মর্মাহত। তবে এ বিষয়ে নিশ্চয় আপনাদের দ্বিমত থাকা উচিত নয় যে, কত গুরুদায়িত্ব আমার স্কন্ধে চাপান হয়েছে। এবং সে দায়িত্ব নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে গেলে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে তা সম্ভব নয়, এ কথা পূর্বেই জানিয়েছি। আজকের আহ্বান সেই সূত্রেই।

তরুণ বলল, আমি যা জানি তা আপনাকে জানিয়েছি। এবং আমার ধারণা, আর সকলে নিজের নিজের কথা আপনাকে জানিয়ে থাকবেন।

তন্নজী বলল, আমারও ঐ কথা।

প্রদ্যোত হালদারের গলা পাওয়া গেল, আমারও—

বাসব বলল, আপনারা সকলেই আমাকে বলেছেন কিছু কিছু কথা, অস্বীকার করি না ; তবে প্রকৃত সত্যটা অনেকেই লুকিয়ে গেছেন— যার জন্য এক সময় আমার পক্ষে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

করবার আগে, ঘটনা দুটির সারাংশ আমি আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই।

কেউ কিছু বললেন না।

— ডাঃ হীরালাল ও ডাঃ ব্যানার্জী যেভাবে খুন হয়েছেন, সভ্য পৃথিবীতে এর চেয়ে নিষ্ঠুরভাবে খুন হওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। অবশ্য, এই ভয়াবহ হত্যা দুটির নেপথ্যে আছে একটি চমৎকার পরিকল্পনা। এক ঢিলে দুই পাখি মারার পরিকল্পনা। কোন গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার দরুণ হত্যাকারীর একটি গ্ল্যান্ডের প্রয়োজন হয়। তখন সে দুটি ডাক্তারকে বেছে নেয় টার্গেট হিসাবে। দুজনেই সুবিখ্যাত এবং ধনশালী। হত্যাকান্ডও সম্পন্ন হয় অতি নিখুঁতভাবে। হত্যাকারী দুজনেরই অত্যন্ত পরিচিত। কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য সে নিহতদের সঙ্গে আলাদাভাবে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করে। অ্যাপয়েন্টমেণ্টের সময় অবশ্য রাত দশটার পর স্থির হয়।

—আমি বুঝতে পাচ্ছি না—প্রদ্যোত হালদার বললেন, পুরানো কথা আলোচনা করে কি লাভ? নতুন কিছু যদি আপনার বলার থাকে, বলুন?

– বিষয়বহির্ভূত অবশ্য কিছু বলিনি। বেশ, এবার অন্য কথায় আসা যাক। এবার একে একে আপনারা বলুন যে যা আমাদের কাছে লুকিয়ে গেছেন।

চুপ করে রইলেন সকলে।

বাসব আবার বলল, এইভাবে মুখ বন্ধ করে থাকলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটবে। প্রদ্যোতবাবু, আপনি কিছু বলুন?

—আমি! আমি আবার কি বলব? যা বলবার আগেই বলেছি।

– কই আর বলেছেন? আপনি নিজের জবানবন্দীতে বলেছেন, আপনি নাকি ডাঃ হীরালালের মারা যাওয়ার পরের দিন সকালে ভাগলপুর থেকে কলকাতায় ফেরেন। এবং হাওড়া থেকে বেহালা যাবার পথে ট্যাক্সিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

—ঠিকই বলেছি।

—আপনি মিথ্যা কথা বলেছিলেন। অজ্ঞান হয়ে পড়েননি আপনি, বরং সুস্থ শরীরেই মিত্রভিলায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

থতমত খেলেন হালদার।

—না… …কখনই না……

—প্রমাণ পেয়েই কথাটা বলছি। মিত্রভিলার বাগানের মালী সেদিন ভোরে আপনাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিল।

প্রদ্যোত চুপ করে রইলেন।

—আপনি আমাদের মিথ্যা কথা বলেছিলেন কেন?

—দেখুন....মানে....আমি মিথ্যা কথা বলতে চাইনি। কেমন নার্ভাস হয়ে বলে ফেলেছিলাম। সেদিন সত্যই মিত্রভিলায় এসেছিলুম স্টেশন থেকে। কিন্তু তার-পরেই ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। অজ্ঞান হয়ে যাই ট্যাক্সিতে। হাসপাতালে যে ছিলাম তার প্রমাণ নিশ্চয় পেয়েছেন?

—তা পেয়েছি। কিন্তু ঐ সময় মিত্রভিলায় এসে আবার চলে যাবার কারণ কি। যে ক্ষেত্রে ডাঃ হীরালাল খুন হয়েছেন আপনি বুঝতে পেরেছিলেন।

প্রদ্যোত হালদার আবার নীরবতা অবলম্বন করলেন।

— বলুন, মিঃ হালদার ?—বলবেন না। অবশ্য না বললেও আমার আর বিশেষ অসুবিধা হবে না।

ডাঃ হিরণ্ময় বললেন, আমার মতে এখন প্রত্যেকের উচিত বাসববাবুকে পরিষ্কারভাবে সমস্ত কথা বলা। ওকে আমরা যতটা সাহায্য করতে পারি ততই ভাল।

বাসব বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন ডাঃ গাঙ্গুলী। মলয়বাবু, আপনি ?

কাঁপা গলায় তিনি বললেন, আমি আর কিছু জানি না।

—অনেক কিছু জানেন। যেমন ধরুন, ডাঃ হীরালালের ব্যাঙ্ক একাউন্টের কথা।

—এ সমস্ত আপনি কি বলছেন ? তাঁর ব্যাঙ্ক একাউন্টের বিষয় আমার তো কিছুই জানবার কথা নয়।

—ওখানেই তো মজা। জানবার কথা নয়, অথচ জানেন। আমার কাছে প্রমাণ আছে, আপনি ডাঃ হীরালালের একাউণ্ট থেকে চেক—

এবার ভেঙ্গে পড়লেন মলয় গাঙ্গুলী।

প্লিজ—প্লিজ—মিঃ ব্যানার্জী।

—আমায় ক্ষমা করবেন মলয়বাবু, চুপ করে থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি ডাঃ হীরালালের চেক জাল করে তাঁর একাউণ্ট থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ড্র করে নিয়েছেন।

ঘরের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠল।

সকলে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন মলয় গাঙ্গুলীর দিকে।

—অবশ্য প্রদ্যোত হালদার এবিষয়ে আপনাকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করেছেন। টাকার ভাগও পেয়েছেন নিশ্চয়ই।—নো, নো, রং স্টেপ নিচ্ছেন, তন্নজীবাবু। ঘরের বাইরে আপনার এখন যাওয়া চলতে পারে না।

বাসবের কথায় সকলে একযোগে দরজার দিকে মুখ ফেরালেন।

দরজার প্রায় কাছে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তন্নজী।

বাসব বলল, আপনি এসে বসুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

অসহিষ্ণু গলায় তন্নজী বলল, স্টুডিওতে আমার কাজ রয়েছে।

আমার কথার উত্তর দিয়ে, তবে যান।

—বলুন ?

—জাস্ট এ মোমেণ্ট—ইন্সপেক্টর মলয়বাবু ও প্রদ্যোতবাবুর উপর একটু দৃষ্টি রাখবেন। মলয় গাঙ্গুলী বসে বসে ঘামছিলেন।

প্রদ্যোত হালদারের অবস্থাও তথৈবচ।

— ওয়েল মিঃ ব্যানার্জী, আমি জানতে পেরেছি আপনার কাকা যে রাত্রে মারা যান, অস্বীকার করলেও আপনি আপাদের মেন-গেট খুলে সে সময় একবার বাইরে গিয়েছিলেন।

দৃঢ় গলায় তন্নজী বলল, গেট আমি খুলিনি। গেটের চাবি আমার কাছে থাকে না, আপনাকে আগেই বলেছি।

—তা বলেছিলেন। কিন্তু আসল না থাকলেও ডুপ্লিকেট চাবি থাকতে নিশ্চয় বাধা নেই।

—আপনি কি বলতে চাইছেন?

—পুলিস একজন চাবিওয়ালার সন্ধান পেয়েছে। মোমের ছাপের সাহায্যে আপনি তার কাছে থেকে একটা চাবি তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন।

চাবি আমি একটা তৈরি করিয়েছিলাম ঠিকই, তবে অন্য প্রয়োজনে। আপনি আপনি কি বলতে চান, আমি ...

উত্তেজনা পরিহার করুন, তন্নজীবাবু। আমি যা বলতে চাইছি তার অর্থ আপনার জানা আছে।

আর এক সেকেণ্ড আমি এখানে থাকব না। আপনার যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।

—বিশেষ কিছু করতে হবে না। আপনার কুকীর্তির সহায়ক এই ছুরিটাই আপনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাসব পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে দেখাল।

ছুরিটা দেখামাত্র তন্নজীর চোয়াল ঝুলে পড়ল।

চিনতে পেরেছেন তাহলে?

বাসবের স্বর তীব্র হয়ে উঠল।

—গতকাল রাত্রে ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে দরজা খুলে আপনার স্টুডিওতে ঢুকেছিলাম। এই ছুরিটা পাওয়া গেছে রামকৃষ্ণদেবের অয়েল পেণ্টিং-এর পিছন থেকে। ছুরির গায়ে ছিটে ছিটে রক্তের দাগ এখনও রয়েছে।

ঠিক এই সময় কাণ্ডটা ঘটে গেল।

সকলের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে তন্নজী ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এই রকম অভাবনীয় ঘটনার জন্য কারুরই প্রস্তুত থাকবার কথা নয়। সকলে একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে মোটর স্টার্ট নেবার শব্দ পাওয়া গেল এই সময়। অমিতাভ গাঙ্গুলী কিন্তু তন্নজীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

দুঘণ্টা পরে অমিতাভ গাঙ্গুলী ফিরে এলেন বাসবের কাছে। সম্পূর্ণ বিফল হয়েই ফিরেছেন তিনি। জীপ নিয়ে তন্নজীর পশ্চাদ্ধাবন করেও বিশেষ সুফল পেলেন না। টেরেটিবাজার পর্যন্ত প্রায় শ' খানেক গজের ব্যবধান ছিল দুই গাড়ির মধ্যে। এরপর কোথায় যে মিলিয়ে গেল গাড়িটা, তার কোন হদিশই করে উঠতে পারা গেল না। শেষে তার বাড়িতেও ধাওয়া করেছিলেন অমিতাভ, কিন্তু সেখানেও তাকে পাওয়া যায়নি।

সমস্ত শুনে বাসব বলল, আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, ইন্সপেক্টর। বিশ্রাম করুন।

—লোকটা এইভাবে যে হাত ফসকে বেরিয়ে যাবে ভাবতে পারিনি।

—এখনও সম্পূর্ণ ফসকে যায়নি।

—আপনি জানেন তার সন্ধান?

—ঠিক জানি না। তবে....

—তবে ?

—আন্দাজ করছি, তন্নজী কোথায় লুকিয়ে রয়েছে। আর একটু রাত বাড়লেই তার সন্ধানে আমরা বেরিয়ে পড়ব।

তখন পৌনে এগারটা।

সকলে যাত্রা করল তন্নজীর সন্ধানে। মোটামুটি দলটি মন্দ হল না। বাসব ছাড়া, অমিতাভ গাঙ্গুলী, সুকুমার পোদ্দার ও গোটা চারেক কনস্টেবল। যাত্রা করার আগে বাসব যেন কাকে ফোন করল। তারপর মধ্য কলকাতা ছাড়িয়ে ওদের দুখানি জীপ দক্ষিণ কলকাতার পথ ধরল। শৈবাল বিস্মিত দৃষ্টিতে বার বার তাকাতে লাগল বাসবের দিকে। বাসবের মুখে মৃদু হাসি। টালিগঞ্জ পেরিয়ে যাবার পর ওর নির্দেশে গাড়ি থামান হল সুদৃশ্য এক বাগানবাড়ির সামনে।

বাসব চাপা গলায় বলল, আমাদের এই বাগানবাড়িতে ঢুকতে হবে। সুকুমারবাবু আপনি কনস্টেবল ক'জনকে নিয়ে বাইরেটা ওয়াচ করুন। বাড়ি থেকে কাউকে বেরুতে দেখলেই অ্যারেস্ট করবেন। আসুন,অমিতাভবাবু। ডাক্তার এস –

কম্পাউণ্ডে ঢুকে, বাগান পেরিয়ে ওরা বারান্দায় এসে উঠল। পোর্টিকোতে দুখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওরা দেখতে পেল। কেউ অবশ্য বসে নেই ওতে। জানলার কাচ ভেদ করে ভেতরকার আলো বাইরে এসে পড়েছে। বাসব সামনেকার দরজায় একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল। সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল তিনজন। সামনেই করিডর। করিডরের শেষ প্রান্তের দরজায় পর্দা ঝুলছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে এধারে একফালি আলো এসে পড়েছে। ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। ঘরের মধ্য থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে।

তিনজনে গা মিশিয়ে দাঁড়াল দরজার পাশে।

পরিষ্কার কানে এল কে একজন বলছে, ইল্লিটারেট হ্যাগার্ড, তোমার অতিবুদ্ধির জন্যই আজ এই কান্ডটা ঘটল।

দ্বিতীয়জন কাতরস্বরে বলল, কিন্তু আমি

—স্টপ ইয়োর সাউটিং। তুমি ভেবেছ, কূলে এসে তরী ডুববে, আর আমিও হাঁকপাঁক করতে করতে তলিয়ে যাব ?– তা আমি যাব না।

—দেখুন, আমি বলছিলাম....

টোয়েন্টিটু ক্যালিবারের রিভলবারটা আমার হাতে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ ? এর একটা গুলি তোমার জীবন নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি।

—আ-আপনি আমায় গুলি করবেন ?

এতে তোমার উপকারই হবে বলতে পার। পুলিসের নজরে তুমি পড়েছ। আজীবন জেলে ঘানি টানার চেয়ে আমার হাতে গুলি খেয়ে চিরদিনের মত শান্তি লাভ করা কি ভাল নয় ? কেউ জানতে পারবে না। আমার সায়লেন্সার চিরদিনের মত তোমাকে সায়লেন্ট করে দেবে।

—না—না—আমাকে দয়া করুন

ব্যঙ্গের হাসি বাতাসকে ভারি করে তুলল।

দয়া। কিসের দয়া ?

বাসব পর্দা সরিয়ে দরজার চৌকাঠ অতিক্রম করল।

অমিতাভ পিছনেই আছেন। তাঁর হাতে উদ্যত রিভলবার।

বাসব বলল, আপনি রিভলবারটা হাত থেকে ফেলে দিন, ডাঃ গাঙ্গুলী।

চমকে ঘুরে দাঁড়ালেন ডাঃ হিরন্ময়। ক্রোধান্ধ শ্বাপদের মত তাঁর দুই চোখ জ্বলে উঠল। কিন্তু তা শুধু এক লহমার জন্য। তারপর আগ্নেয়াস্ত্র পকেটে রেখে দিলেন।

বললেন শান্ত গলায়, এসে পড়ে ভালই করেছেন। আপনাদের আসামীকে এতক্ষণ আমি কোনরকমে আটকে রেখেছি।

তনুজী তখন থর থর করে কাঁপছে।

আপনার অভিনয় নৈপুণ্যের প্রশংসা না করে থাকা যায় না, ডাঃ গাঙ্গুলী। কিন্তু ভবাড়ুবি আপনার এখানেই হয়েছে। ইন্সপেক্টর, ডাঃ হীরালাল ও ডাঃ ব্যানার্জীকে হত্যা করার অপরাধে আপনি ডাঃ হিরন্ময়কে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন হিরন্ময়।

গলায় শ্লেষ ঢেলে দিয়ে বললেন, চমৎকার। কিন্তু জানতে পারি কি, কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করে আপনি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছেন ?

প্রমাণ একটা নয়। একের পর এক আছে। উপস্থিত একটার কথা বললেই যথেষ্ট হবে। কয়েকদিন আগে শৈবাল আপনার ডিসপেন্সারিতে একটা অপারেশন করেছে, তার চিহ্ন এত তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাবার কথা নয়। এই অপারেশন অন্য কেউ করেছে তা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না। কেন ডাক্তার বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এতবড় মিথ্যা কথা বলবে ? তাছাড়া, দ্বিতীয় গ্ল্যাণ্ডটিও বোধহয় এখনও এই বাড়িতেই আছে।

হিরন্ময় এই কথা শুনে কেমন মিইয়ে পড়লেন। কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না বা বলতে পারলেন না। ইন্সপেক্টর এগিয়ে গিয়ে প্রথমে তাঁর হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে দিলেন, তারপর তনুজীর দিকে এগিয়ে গেলেন।

সোফায় আড় হয়ে বসে পাইপ টেনে চলেছে বাসব।

সন্ধ্যা নেমেছে অনেক আগে। শৈবালও রয়েছে। দুজনেই চুপচাপ।

শেষে শৈবাল নীরবতা ভঙ্গ করল। কি এত ভাবছ ?

ভাবছি মানুষের প্রবৃত্তির কথা। ডাঃ হিরন্ময়ের কিছুরই অভাব ছিল না— সম্পদ, সম্মান, প্রতিপত্তি সবই তাঁর করায়ত্তে ছিল। তবু। দেখ ডাক্তার, আমার মনে হয় আমরা যতই সভ্য হয়ে উঠি না কেন তবু আমরা সময় সময় আদিম যুগে ফিরে যাই। তুমি কি বল ?

—হয়ত তাই। ও কথা যাক্—। এখন বল, কিভাবে তুমি মিস্ট্রিটা সলভ্

করলে ?

বাসব আরম্ভ করল : প্রথমেই আমার অদ্ভুত লেগেছিল হত্যার পদ্ধতি দেখে। অবশ্য আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলাম, হত্যা দুটো যত বীভৎসই হোক না কেন, তবু এই বীভৎসতার নিশ্চয়ই একটা সঙ্গত কারণ আছে। ডাক্তার হীরালালের ওখানে গেলাম, একটু খোঁজাখুঁজি করতেই ওয়ার্ডরোবের তলা থেকে একটা গোল চাকতি পাওয়া গেল। চাকতিটা কিসের আমি বুঝতে পারিনি প্রথমে। পুলিসের কাছ থেকে আমি আগেই সকলের স্টেটমেন্ট যোগাড় করেছিলাম! সকলের স্টেটমেন্টেই কিছু না কিছু গলদ আমার চোখে পড়ল। আমি ভাবতে লাগলাম, হাওড়া স্টেশন থেকে ফেরার পথে হঠাৎ প্রদ্যোত হালদারকেই বা অজ্ঞান করে চন্দননগরে নিয়ে যাওয়া হল কেন ? মিত্রভিলার মালির কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল সে নাকি ভোরেই প্রদ্যোত হালদারকে ওখানে দেখেছিল। তবে— ? আমার সন্দেহ দানা বাঁধল। ডাক্তার হীরালালের চেকবুক থেকে একটা জিনিস আমি উদ্ধার করলাম। কয়েক মাসের মধ্যে চল্লিশ হাজার টাকার মত তিনি ব্যাঙ্ক থেকে ড্র করেছেন ; কিন্তু পূর্বেকার সমস্ত আয়, ব্যয় ও জমা ইত্যাদি ডায়েরীতে থাকলেও এই টাকাগুলোর কোন উল্লেখ নেই। আমি আরো জানতে পারলাম, ডাক্তার হীরালাল অন্যমনস্ক ধরনের লোক ছিলেন তাঁর সমস্ত কাজকর্ম সামলাতেন প্রদ্যোত হালদারই। তবে কি— ? ডায়েরী-চোর একদিন ডাক্তার হীরালালের বাড়িতে ডায়েরী চুরি করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেও আমার বাড়ি থেকে সেখানা নিয়ে গেল। ডায়েরীটা চুরি করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে কেউ বুঝতে না পারে এই চল্লিশ হাজার টাকার গরমিলের কথা। যদিও মলয় গাঙ্গুলী বলেছিলেন প্রদ্যোত হালদারের সঙ্গে তাঁর আলাপ নেই, মুখ-চেনাচিনি আছে মাত্র ; তবু আমি বুঝতে পারলাম, ওঁদের দুজনের বেশ হৃদ্যতাই আছে। তাহলে মলয় গাঙ্গুলী মিথ্যে কথা বললেন কেন ? আমি মলয়বাবুর সম্বন্ধে খোঁজ করলাম। "স্টুয়ার্ট অ্যান্ড মর্গানে" কাজ করেন তিনি। ওই কোম্পানীটির প্রধান কাজ হল দলিল, উইল বা অন্যান্য যে কোন দস্তাবেজের আসল নকল প্রমাণ করা। ওখানকার হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্টদের মধ্যে মলয় গাঙ্গুলী একজন। এবার ব্যাপারটা সরল হল। ডাক্তার হীরালালের সরলতার সুযোগ নিয়ে মিস্টার গাঙ্গুলী প্রদ্যোত হালদারের সাহায্যে তাঁর চেক জাল করেছিলেন।

বাসব থামল। পাইপ নিভে গেছে। আবার ধরাল।

শৈবাল বলল, নিজেই যদি তিনি এ-সব কান্ড করে থাকেন, তাহলে তোমায় ডাক্তার হীরালালের ঘরে চোর ঢোকার কথা বলতে গেলেন কেন ?

নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করার জন্যে। পুলিসকে তিনি সাহায্য করতে চান, একথা প্রমাণ করবার জন্যে। যাক আমার ধারণা, ঘটনাটা এইভাবে ঘটেছিল। ভাগলপুর থেকে ফিরে প্রদ্যোত হালদার সোজা মিত্রভিলায় আসেন। এসেই ডাক্তার হীরালালের মৃতদেহ তাঁর চোখে পড়ে। তিনি ভয় পান। মলয় গাঙ্গুলীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে চন্দননগরের গঙ্গার ধারে গিয়ে পড়ে থাকতে হয়। পাছে

পুলিস তাঁকে সন্দেহ করে, তাই এই সাবধানতা। তুমি প্রশ্ন করতে পার, প্রদ্যোত হালদার যে হত্যাকারী নয় একথা আমি ধরে নিলাম কি করে? দুটো কারণে—প্রথম, যে-হাঁস সোনার ডিম পাড়ছে অর্থাৎ যার চেক জাল করে প্রচুর টাকা বাগানো যাচ্ছে, তাকে মেরে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। দ্বিতীয়, ডাক্তার অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে হত্যা করার তাঁর কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। ঠিক ঐ কারণে মলয় গাঙ্গুলীকে হত্যার ব্যাপারে অব্যাহতি দেওয়া চলতে পারে। আমি চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগলুম। তরুণ মুখার্জীকে আমার হিসাব থেকে বাদ দিয়েছিলাম। ছেলেটি নেহাৎই সাধারণ, তবে রগচটা। এখন রইলেন শুধু তন্নজী বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ ডাঃ হিরণ্ময়ের কথা আমি ধরিনি প্রথমে। ধরার কথাও নয়, যেক্ষেত্রে তিনিই আমাকে এ তদন্তে এ্যাপয়েণ্ট করেছেন। তন্নজীবাবুর হাবভাব বিশেষ সন্দেহজনক। ডাক্তার ব্যানার্জী তাঁর প্রতি সদয় ছিলেন না। তুমিও আমাকে বলেছ, তিনি নাকি রেস খেলতেন। তিনি কাকার উত্তরাধিকারী। রেসের জন্য যত টাকাই প্রয়োজন হোক না কেন তবু তার কাকাকে হত্যা করার বোকামি তিনি করবেন না। তাছাড়া, ডাক্তার হীরালালকে হত্যা করার তাঁর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

একটানা বলার পর বাসব নীরব হল। পাইপ সেণ্টার টেবিলের উপর রেখে আবার আরম্ভ করল, কোন বৃহত্তর পরিকল্পনা নিয়েই হত্যাকারী দুটো হত্যা করেছে, সন্দেহ নেই। কে-সে?—ডাক্তার ব্যানার্জী যেখানে মারা যান, সেখানে আমি কার্পেটের ওপর গোল গোল কয়েকটা দাগ দেখতে পাই। ডাঃ হীরালালের ঘরে একটা গোল চাকতি পেয়েছিলাম, তোমাকে আগেই বলেছি। গোল দাগের সঙ্গে ওই গোল চাকতিটার কোন সম্পর্ক আছে নাকি? আমার মনের মধ্যে যখন এই রকম চিন্তা ওঠা নামা করছে, তখন হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ায় আমি আশার আলো দেখতে পেলাম। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, বার্থডে পার্টিতে ডিনারের পর ডাক্তার হিরণ্ময় আমাদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। ওই সময়ে কথা বলতে বলতে তিনি নিজের হাতের লাঠিটা দোলাচ্ছিলেন। তাই দেখে হঠাৎ আমার মাথায় কথাটা উদয় হল, ওই গোল দাগগুলো ওর ছড়ির তলাকার চিহ্ন নয়ত? আমি মাটির দিকে তাকালাম। পরিষ্কার চোখে পড়ল, কার্পেটের উপর গোল দাগের ছড়াছড়ি। ছড়িতে একটু বেশি জোরে ভর দিয়ে হাঁটার জন্যেই এরকমটা হয়েছে। আমার বুঝতে বিলম্ব হল না, ডাক্তার হীরালালের ঘরে পাওয়া অ্যালুমিনিয়ামের গোল চাকতিটা এই ছড়ির তলায় লাগান ছিল। মোরাদাবাদের ছড়িগুলো যেমন হয় আর কি। কিন্তু তিনি আহত হলেন কি করে? আর তাঁর দুটো খুন করার উদ্দেশ্যই বা কি? দু'জায়গাতেই পুলিস দেখেছে, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। বাগানের চাকর-বাকরদের প্যাসেজ দিয়ে মিত্রভিলায় ঢোকা যেতে পারে, কিন্তু ডাক্তার হীরালালের ফ্লাটের মধ্যে হত্যাকারী গেল কি করে? ডাক্তার ব্যানার্জীর বাইরের গেটের চাবি তন্নজীবাবু তৈরি করিয়েছিলেন, হত্যাকারী না হয় ঐ পথ দিয়ে কম্পাউণ্ডের মধ্যে এসেছিল, কিন্তু ডাক্তার ব্যানার্জীর লাইব্রেরী ঘরে ঢুকল

কি করে ? তবে কি হত্যাকারী আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিল, তাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। টেলিফোন অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, দুটো হত্যারই আগের সন্ধ্যায় ডাক্তার হীরালাল এবং ব্যানার্জীকে ফোন করেছিলেন। অর্থাৎ দরজা যাতে খোলা পাওয়া যায়, তারই জন্য হয়ত। তিনি বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে ওদের দুজনের সঙ্গেই নির্দিষ্ট দিনগুলিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিলেন। এবার আমি নিশ্চিন্ত হলাম ডাক্তার গাঙ্গুলী সম্বন্ধে। নিজে আহত হওয়ার উদ্দেশ্য হল, আমার চোখে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করা। ডাক্তার গাঙ্গুলীর পরিকল্পানুসারে তাঁকে আঘাত অবশ্য করছিলেন তন্নজীবাবু। আসলে তন্নজীবাবু ডাক্তার হিরণ্ময়র হাতের মুঠোর মধ্যে ছিলেন। তিনি রেস খেলতেন। তাঁর প্রচুর টাকার দরকার হত। একরোখা কাকাটির কাছ থেকে আদায় করার তেমন কোন সুবিধা ছিল না। ডাক্তার গাঙ্গুলী তাকে টাকা দিয়ে হাতের মুঠোয় এনে ফেলেন।

বাসব থামতেই শৈবাল প্রশ্ন করল, কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য কি ?

দুটো উদ্দেশ্য রয়েছে। এক, নিজের দারুণ শারীরিক অসুস্থতার দরুণ একটা গ্ল্যান্ড বদল করা ? আর দুই, ডাক্তার ব্যানার্জীর বিপুল অর্থ করায়ত্ব করা। বুঝতে পারলে না ? বেশ, বুঝিয়ে বলছি। কোন জটিল শারীরিক অসুস্থতার দরুণ বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, ডাক্তার গাঙ্গুলী বুঝতে পারেন, তাঁর শরীরে একটা গ্ল্যান্ড বদল করা প্রয়োজন। কিন্তু বদলানোর ব্যাপারে দুটো জিনিস প্রয়োজন। একটা গ্ল্যান্ডের আর একজন সার্জনের। মরা মানুষের গ্ল্যান্ড হলে চলবে না। ডাক্তার হীরালাল একজন ভাল সার্জন। তিনি তাঁকেই কথাটা প্রথমে বোধহয় বলেন। নিশ্চয়ই ডাক্তার হীরালাল এতে সম্মত হননি, এবং তাকে এমন কিছু নিশ্চয় বলেন যাতে ডাঃ হিরণ্ময়র ভয় হল। যদি একথা প্রকাশ হয়ে যায় হীরালালের মুখ থেকে ? তখন তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মারার পরিকল্পনা করলেন। হীরালালের মুখও বন্ধ হবে আর গ্ল্যান্ডও সংগ্রহ হবে। তিনি হীরালালকে হত্যা করলেন। এ ছাড়া ডাক্তার হীরালালকে হত্যা করার আর কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। দ্বিতীয় হত্যা হল, লোভের বশবর্তী হয়ে। নিশ্চয়ই তন্নজীর সঙ্গে একটা রফা হয়েছিল, ডাঃ ব্যানার্জী নিহত হলে তাঁর বিপুল অর্থের ভাগাভাগির ব্যাপারে। তন্নজী তোমাকে সেদিন পিক্-আপ্ করে নিয়ে গিয়েছিলেন ডাক্তার হিরণ্ময়ের অপারেশনের জন্যে।

—তুমি তন্নজীকে সন্দেহ করলে কিভাবে ?

- আগেই বললাম ত। সন্দেহ তাঁর ওপর আমার একটু আধটু হয়েছিল, তবে খুনী হিসাবে তাঁকে আমি মানতে পারছিলাম না। ডাঃ হিরণ্ময় আহত হওয়ার পরের দিন আমি তন্নজীবাবুর স্টুডিওতে গেলাম। তখন তিনি সেখানে ছিলেন না। আমি স্টুডিওর চারিধার দেখছি হঠাৎ চোখে পড়ল রামকৃষ্ণদেবের অয়েল-পেন্টিংটার পিছনে কি একটা রয়েছে। অতি সামান্য অংশ তার দেখা যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম, কোন গজাল-টজাল হবে। কিন্তু পরে আমার মনে হল, ওটা কোন তীক্ষ্ণ

অস্ত্রের অগ্রভাগ হতে পারে। তাড়াতাড়িতে রেখে দেওয়ার দরুণ তারই একটু অংশ চোখে পড়েছে। তাই সেই রাত্রে স্টুডিওতে হানা দিতে হল। তারপর কি হয়েছে তোমার অজানা নয়। ছুরিটার গায়ে যে ছিটে ছিটে রক্ত লেগেছিল, পরীক্ষা করলে তা ডাঃ হিরন্ময়ের রক্ত বলেই প্রমাণিত হবে। ওই ছুরিটার বাঁট দিয়েই তাকে আঘাত করা হয়েছিল।

—ডাঃ গাঙ্গুলীকে বেশ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। একটু জোরে আঘাত হলে সিরিয়াস কিছুই হয়ে পড়তে পারত?

—তা পারত। কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। প্রশ্নও উঠতে পারে কেনই বা তিনি এই হত্যাতদন্তে আমাকে নিযুক্ত করতে গেলেন? তিনি আমাকে নিযুক্ত করেননি। একথা তুমি আমার চেয়ে অনেক ভাল জান। অন্যান্য ডাক্তারের পরামর্শে এবং মেডিক্যাল এসোশিয়েসানের সেক্রেটারি হওয়ার দরুণ আমার কাছে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

— শৈবাল বলল, তুমি তাঁর বাগানবাড়ির সন্ধান কিভাবে পেলে ভেবে অবাক হচ্ছি।

এতে অবাক হবার কিছু নেই। তলিয়ে ভাবলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারতে। ডাঃ হিরণ্ময়ই হত্যাকারী এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যাবার পরই যখন তোমার মুখে শুনলাম, বাগানঘেরা বাড়ির মধ্যে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন বুঝতে বাকী রইল না, তাঁর অন্যত্র একটা আস্তানা আছে। এই আস্তানার সন্ধান পাবার আর কোন উপায় না দেখে সুকুমার পোদ্দারের সঙ্গে পরামর্শ করে ডাঃ হিরন্ময় আর তাজীর উপর চক্ষু বসালাম। এরপর বাগানবাড়ির সন্ধান পাওয়া কষ্টকর হয়নি। তোমার নিশ্চয় আর কোন প্রশ্ন নেই?

—আর একটা প্রশ্ন আছে?

—বল?

—এই রক্তাক্ত অধ্যায়ে দুলারী বাঈ-এর ভূমিকাটা কি?

—কোন ভূমিকাই নেই। ডাঃ ব্যানার্জী আর ডাঃ হীরালালের সে প্রিয় পাত্রী ছিল। তাই পুলিস ওকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। দেখবে নাই বা কেন, বল? দুটো ঘটনারই আগে দুলারী বাঈ গান শোনাতে গিয়েছিল। অবশ্য এটা কনফিডেন্স তোমাকে আগেই বলেছি। আসল কথা হল, প্রদ্যোত হালদারের সঙ্গে তার আগে থেকে পরিচয় ছিল। হালদার তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ডাঃ হীরালালের। তিনি আবার নারীরত্নটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ডাঃ ব্যানার্জীর। তবে চেক জাল করবার অপরাধে প্রদ্যোত ও মলয়ের বিরুদ্ধে যদি পুলিস কেস দাঁড় করায়, দুলারীকে তাহলে বেশ ঝামেলায় পড়তে হবে এ ডায়েরীটা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে।

বাসব থামতেই ওয়াল-ক্লকে সশব্দে দশটা বাজল।

—চল ডাক্তার, রাত্রের খাওয়াটা এখানেই সেরে নেবে।

—চল।

—দুজনে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল।

নিশির শিশির

কয়েকদিন প্রচণ্ড গরম বেনারসকে সাপটে রাখার পর গত রাত্রে ঘণ্টা দুয়েক প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। দিনের আলো ফুটে ওঠার পর সূর্যের দেখা নেই। সমস্ত আকাশে নিবিড় কালো মেঘ আর মেঘ। চতুর্দিকের অবস্থা এখন স্নিগ্ধ। গরমে সিদ্ধ হয়ে যাওয়া মানুষ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

মানস মাড়োওয়ারী হাসপাতালের সামনের কোনাকুনি ফুটপাথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। সামনেই বিখ্যাত গোধূলিয়ার চৌমাথা। ওর মনমেজাজ আজ ভাল নেই। নিয়মিত যে ভাল থাকে তা নয়। পার্থক্যের মধ্যে আজ অতিমাত্রায় খারাপ।

চৌমাথার একদিকের রাস্তাটা চলে গেছে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে। অন্য ধারটা এগিয়ে গেছে ছোটি গায়বির দিকে। চক ও জঙ্গম বাড়ির দিকে বাকি দু-দিক বিস্তারিত হয়ে রয়েছে। চারটি রাস্তা ধরেই চলেছে অজস্র রিক্সা, অসংখ্য মানুষ। ঘেঁসাঘেঁসি হলেও, শৃঙ্খলা বজায় আছে বলতেই হবে। আজ কোন উৎসব নেই, নেই কোন পালা-পার্বন, তবু এত ভিড়! বেনারসের এটাই বৈশিষ্ট্য।

ভারতের কত প্রান্তের, কত বিচিত্র সাজ-পোশাকের লোক চলেছে। জনস্রোতের দিকে ভ্রূ কুঁচকে মানস তাকিয়েছিল। এরা কি সকলেই সুখী? তা কখনও সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই সুখ ও শান্তিকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেতে পারে না। তবে অনেকেই সমস্ত কিছুকে আপ্রাণ ভাবে মানিয়ে নিয়ে সুখী মানুষের অভিনয় করে যায়।

মানস কি সে চেষ্টা করেনি?

গত পাঁচ বছর ধরে সেই চেষ্টাই যে সে করে এসেছে এ-কথা তার চেয়ে আর বেশি কে জানে? তবুও সুফল ফলেনি। সুনীলা সুফল ফলতে দেয়নি।

সুনীলা। তার স্ত্রী।

আগে মানস ভাবত, এটাও হয়ত একধরনের পাগলামী। বড়লোকের মেয়ে—প্রচুর প্রশ্রয়ের মধ্যে মানুষ। অতিপ্রশ্রয় শ্বশুরবাড়িতে এসে পাগলামীর রূপ নিয়েছে। কিন্তু দিনের পর দিন লক্ষ্য করবার পর বুঝতে পেরেছে সমস্তটাই ইচ্ছাকৃত।

সুনীলা সুখী হতে দিতে চায় না মানসকে!

কেন?

এই 'কেন'র উত্তর পাওয়াটাই হল শক্ত।

নেশা মানুষের মনকে মোচড় দিয়ে গেল। অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয়নি। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে একটা নাম্বার টেন বেরল। অগ্নি-সংযোগ করে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মানস ফুটপাত থেকে রাস্তায় নামল।

এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? আবার করবারও তো কিছু নেই।

বাড়ি ফেরার কথা মনে হলে বিতৃষ্ণা আসে। আজ তো আর থাকতে না পেরে পরিষ্কার বলেই দিয়েছে সুনীলাকে, আমাকে এবার রেহাই দাও। তোমার এই মেজাজ, এই খামখেয়ালীপনা আর আমি সহ্য করতে পারছি না। বাপের বাড়িতে গিয়ে যা ইচ্ছে করগে যাও - কেউ দেখতে যাবে না। আমি নিজেদের বাড়িতে শান্তিতে কাটাতে চাই।

বিস্ময়ের বিষয় সুনীলা বাপের বাড়িও যেতে চায় না।

মানসের এখন যাবার জায়গা আছে মাত্র একটি শিশিরের কাছে যাওয়া।

শিশিরকে যদি একবার কাজের জায়গা থেকে বার করে আনা যায়, তবে বাকি দুপুরটা এক রকম কেটে যেতে পারে।

শিশির রেডিও এঞ্জিনীয়ার।

একটি বিখ্যাত ফার্মে সে ট্রানজিস্টারের ডিজাইন দেওয়ার বিনিময়ে মোটা মাইনে পায়। একটু আত্মভোলা, বেশ বেহিসেবী শিশির। বলতে গেলে তাকে সামলাতে মানস সময় সময় বেশ বিব্রত হয়ে পড়ে।

— রিক্সায় চেপে রওনা হল মানস।

শিশিরের হাতে বিশেষ কোন কাজ ছিল না। বন্ধুর আগমনে খুশি হল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে তরল গলায় বলল, গিন্নীর সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়েছে বোধহয়?

বিরস মুখে মানস বলল, তোমার এই হাল্কা কথাবার্তা আমার মোটেই ভাল লাগে না।

কি মুশকিল মুখ দেখে বুঝতে পারছি ঝগড়াঝাটি করে এসেছ- আর বললেই দোষ?

তোমার সখের প্রাণ, তাই বোলচাল ঝাড়ছ। আমার মত অবস্থায় পড়লে বুঝতে, দিনের পর দিন মনের ভারসাম্য বজায় রাখা কত কঠিন ব্যাপার।

শিশির বলল, তুমি কত অসুবিধার মধ্যে আছ, তা কি আমি বুঝি না মনে কর? যাক, আজ কি নিয়ে হল?

শিশিরের অফিস ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল।

চামড়া-মোড়া চেয়ারে একটু হেলে বসে মানস বলল, সেই সনাতন সূত্র ধরেই আরম্ভ হল। আমার অপরাধ খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার ঘরে একটু বিশ্রাম করতে গিয়েছিলাম। এই সমস্ত অবকাশেই সুনীলা বেশি উগ্র হয়ে ওঠে।

অহেতুক ঝগড়া আরম্ভ করে দিল?

তাছাড়া আর কি!

মানস খুলে বলল ব্যাপারটা।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারটার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে সে শোবার ঘরে ঢুকল। বলাবাহুল্য, খাওয়ার টেবিলের সামনে সুনীলা উপস্থিত ছিল না। কোনদিন থাকেও না। স্বামীর স্বাচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখতে সে প্রস্তুত নয়।

পাখা চালিয়ে সবে বিছানায় শুয়েছে মানস, সুনীলা ঘরে এল। এতক্ষণ কোথায় ছিল সেই জানে। ঘরে ঢুকেই সে পাখার সুইচ অফ করে দিল। তারপর

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আরম্ভ করল।

বিছানায় উঠে বসল মানস।

পাখাটা বন্ধ করে দিলে যে?

মুখ না ফিরিয়েই সুনীলা বলল, পাখা চালাবার মত গরম নেই আজ।

তা হোক। চালিয়ে দাও—

সবটাতেই হুকুম। পারব না পাখা চালিয়ে দিতে।

হুকুম আবার করলাম কোথায়? থাক, পাখাটা বন্ধই থাক। এখানে এসে বসো একটু, কথা আছে।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল সুনীলা, আদিখ্যেতায় কাজ নেই। এত প্রেম আবার আমার সহ্য হবে না। লজ্জা করে না তোমার? সকলে যখন অফিসে কাজ করছে, সেই সময়ে তুমি পাখার তলায় শুয়ে আছ? ছি ছি ছি? তোমার মত অকর্মন্য পুরুষ আমি আর দেখিনি।

গায়ে পড়ে এত ঝগড়া করতে তোমার ভাল লাগে? দুপুরবেলা যে আমার কাজ থাকে না তা তোমার অজানা নয়। আমার ডিউটি হল সন্ধ্যেবেলায়। তাছাড়া নিজেদের ব্যবসায় ফাঁকি দেবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

সুনীলা খাটের কাছে এগিয়ে এল।

কি বললে, আমি রাগী? রাগী আর স্বার্থপর তুমি, তোমাদের বাড়ির প্রত্যেকে।

আচ্ছা, তুমি চাওটা কি বল তো? কথায় কথায় এমন পেয়ালায় প্রলয় তোল কেন? আজ পর্যন্ত তো আমি বুঝতে পারলাম না আমার অপরাধ কি?

নিজের অপরাধ কেউ বুঝতে পারে না। আমার জীবন একেবারে ব্যর্থ করে দেবার পর বলছ আমার অপরাধ কি! মেরে ফেলার ব্যবস্থাও তো করে রেখেছ। যে ক'দিন বেঁচে আছি অন্তত শান্তিতে থাকতে দাও।

তুমি একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আছ নীলা।

নীলা! ও নামে আমায় ডাকবে না। এত সোহাগ আমার ভাল লাগে না।

কেন ভাল লাগে না? আমি তো তোমায় সব সময় ভালবাসতেই চেয়েছি। তুমি যা বলেছ শুনেছি। এমন কি তোমার কথায় বাবার সঙ্গে আলাদা পর্যন্ত হয়ে গেছি। তবুও—

থাক, একই কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এই ঘর থেকে একটু যাবে কি? আমি বিশ্রাম করতে চাই—

বিশ্রাম করতে তোমায় কে বাধা দিচ্ছে?

তোমার থাকা চলবে না। সব সময় তোমার উপস্থিতি আমার ভাল লাগে না?

মানস বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। তার সমস্ত শরীর জ্বালা করছে। একি কথাবার্তা বলার ধরন? সীমা বলে কি সুনীলার শাস্ত্রে কিছুই নেই? দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে গম্ভীর গলায় ও বলল, বেশ, যাচ্ছি। তবে যাবার আগে একটা কথা বলতে চাই, তোমার মেজাজ আর খামখেয়ালীপনা আর বরদাস্ত করতে পারছি না।

এবার আমায় রেহাই দাও। বাপের বাড়িতে গিয়ে, বাবার প্রশ্রয়ে আবার নেচে বেড়াওগে যাও, আমি দেখতে যাব না।

উত্তরের অপেক্ষা না করে মানস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শিশির গম্ভীর মুখে শুনছিল। মানস থামতেই সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ও বলল, সত্যি, পরিস্থিতি অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে!

আমি যে পাগল হয়ে যায়নি এই যথেষ্ট।

একটু সহ্য করে থাক। সময়ে সব হয়—ধীরে ধীরে সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে।

তাকে নিয়ে ঘর তুমি করনি, তাই এই কথা বলতে পারছ। সামলে যাবার মেয়ে ও নয়। এবার আমাকেই কিছু করতে হবে।

কি করতে চাও?

হঠাৎ অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে উঠল মানস।

আমি ওকে খুন করতে চাই।

শিশির অবাক।

সেকি? খুন করতে চাও—?

হ্যাঁ। আর তা যদি না পারি, তাহলে আত্মহত্যা করতে চাই।

এই কি লাইফ শিশির? পথের কুকুররাও আমার চেয়ে বোধহয় সুখী।

এ কোন কাজের কথা নয়। অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে আছ জানি, তবু এত ডেসপ্যারেট হওয়া তোমার উচিত নয়।

শিশির উত্তেজিত মানসকে বোঝাতে আরম্ভ করল।

গোড়া থেকেই সমস্ত কিছু বলতে হয়। নইলে বর্তমানের ঘোরাল পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে না। বুঝতে পারা যাবে না, মানসের মত শান্তশিষ্ট ছেলের ভাগ্যে কেন ঝড় ঘনিয়ে এল।

কলকাতার রিজেন্ট পার্কে যাঁরা মাত্র একবার গেছেন, তাঁদেরও চোখ এড়িয়ে যাবার কথা নয় 'বকুলতলা'। 'বকুলতলা'র মত বিরাট এক সুদৃশ্য বাড়ি এ অঞ্চলে আর নেই বললেই চলে। বাড়িটার এই ধরনের নামকরণে অনেকে অবাক হন। কিন্তু ওই অঞ্চলের যাঁরা প্রাচীন অধিবাসী, তাঁরা জানেন ওখানে আগে ঘেঁসাঘেঁসি অবস্থায় অনেক বকুল গাছ ছিল। বকুল ফুল যখন ফুটত, চোখ ভরে দেখে মন ভরে যেত সকলের গন্ধে মন মাতাল হয়ে উঠত।

এই জায়গাটা ছিল ইসরার আলীর। জনশ্রুতি আছে, ইসরার ইতিহাস বিখ্যাত টিপু সুলতানের বংশধর। দেশ ভাগ হয়ে যাবার আগে বকুল গাছে ঘেরা তার সাধের জমিটা বিক্রি করে যায় কিঙ্কর নাগচৌধুরীকে।

নাগচৌধুরীরা কয়েক পুরুষ ধরে ব্যবসাদার। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তেজারতি কারবার করে লক্ষ্মীকে নিজের ঘরে বেঁধেছিলেন কালীশঙ্কর নাগচৌধুরী। তাঁর উত্তরপুরুষেরা পরবর্তীকালে নানা ধরনের সাফল্য অর্জন করেছেন। কিঙ্কর

নিজেদের ব্যবসার তালিকায় একটা নতুন নাম যোগ করেছেন।

কফির ব্যবসা করেন।

কফিহাউস চালান না কিন্তু। দাক্ষিণাত্যের একটা কফি বাগানের মালিক নাগচৌধুরীরা। 'এন সি' মার্কা কফির চাহিদা বাজারে প্রচুর। কিঙ্কর আগে থাকতেন বাগবাজারের সাবেকি বাড়িতে যৌথ পরিবারের মধ্যে। ইসরারের কাছে জমিটা কেনবার পর আলাদা হয়ে গেছেন। নতুন বাড়ির নামকরণ করেছেন 'বকুলতলা'।

কিঙ্কর নাগচৌধুরীর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। তবে দেখলে মনে হয় যেন পঞ্চাশের নিচেই। চুল বিশেষ পাকেনি। দীর্ঘদেহী ও বলিষ্ঠ, গায়ের রঙ মাজামাজা, চলনসই মুখ। চোখে পুরু লেন্সের সেলের ফ্রেমের চশমা।

ব্যবসায়ী মহলে তাঁর সুনাম আছে।

সম্প্রতি শেয়ার মার্কেটে ভিড়েছেন।

কিঙ্কর নাগচৌধুরী বিপত্নীক। সুনীলার জন্ম হওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী এক রকম অকালেই সাজান সংসার ফেলে চলে গেছেন। সুনীলার ওপর তার তিন দাদা আর দুই দিদি আছে। ছয় ছেলেমেয়েকে প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে মানুষ করেছেন কিঙ্কর। কিন্তু তার মত বহুদর্শী মানুষের আগেই বোঝা উচিত ছিল শাসন না করে শুধু স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশ্রয় দিলেই ছেলেমেয়ে মানুষ হয় না।

তার তিন ছেলে বংশের ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারেনি। ব্যবসার কাজে তাদের আগ্রহ নেই। ইয়ার-বক্সী নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করেই দিন কাটিয়ে চলেছে। কিঙ্কর যখন শঙ্কিত হলেন, তখন আর কিছু করার নেই। তিন শ্রীমান তখন নাগালের বাইরে।

অগত্যা বিয়ের ব্যবস্থা করতে হল। ঘরে বৌ এলে আর কিছু না হোক অন্তত ঘরমুখো হবে। বিয়ে হয়ে গেল তিনজনের। কিঙ্করের আশা অবশ্য ফলবতী হল না। ঠিক আগেকার মতই অবস্থা। তবে তিনি কাতারে কাতারে পৌত্র-পৌত্রী পেতে লাগলেন।

বড় দুই মেয়ে রাজ্যের হিন্দী সিনেমা দেখে আর বটতলার সস্তা উপন্যাস পড়ে অল্প বয়সেই নিজেদের পরকাল ঝরঝরে করে তুলল। আতঙ্কিত কিঙ্কর তাদের আর বাড়িতে রাখা সমীচীন মনে করলেন না, ভাল ঘর দেখে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এবার সুনীলার কথায় আসা যাক।

জন্মের ক্ষণেই মাকে হারিয়েছে। আয়ার হাতে মানুষ হয়েছে বলে তার প্রতি কিঙ্করের অন্যান্য ছেলেমেয়ের চেয়ে বেশি দরদ ছিল। সে তার দিদিদের মত সিনেমা দেখে আর সস্তা নভেল পড়ে সময় কাটাত না। একটু গম্ভীর—বেশ জেদি। তার সময় কাটত সেলাই-ফোঁড়াই আর বাগানের তত্ত্বাবধান নিয়ে।

নিউ মার্কেটে ফুলের বীজ কিনতে গিয়েই নিখিলের সঙ্গে আলাপ। বাকপটু চটপটে ছেলে নিখিল। অল্পদিনের মধ্যেই আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল। বাড়ির কেউ কিন্তু ঘুণাক্ষরে আঁচ করতে পারেনি। দুজনের দেখা-সাক্ষাত হত এখানে-

ওখানে।

একদিন—

পূর্বনির্দিষ্ট ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পিছনে দুজনের দেখা। একথা-সে-কথার পর সুনীলা বলল, ছোড়দির তো বিয়ে হয়ে গেল—

নিখিল বলল,শুনলাম তোমার বাবা খুব খরচপত্র করে বিয়ে দিয়েছেন ?

কেন দেবেন না ? টাকা আছে—দিয়েছেন। তুমি ভেবে দেখেছ কি, এবার আমার পালা ? বাবা বোধহয় পাত্র খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিয়েছেন।

হুঁ।

কি হবে ?

নিখিল চুপ করে রইল।

কিছু বলছ না যে ?

কি বলব ?

সুনীলা অধৈর্য গলায় বলল, এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলবার নেই ? আশ্চর্য !

তোমার সবে সতের বছর বয়স। এখুনি কি আর বিয়ের ব্যবস্থা হবে ?

আমাদের বাড়িতে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়। তাছাড়া ওটা তো কোন কথা নয়। বিয়ে যেদিনই হোক, বাবা যখন আমার মনের কথা জানতে পারছেন না. তখন পাত্র আর যেই হোক তুমি হবে না।

আমায় কি করতে বল ?

কয়েকদিন ধরে তাই তো ভাবছি। আচ্ছা, তুমি বাবার কাছে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করতে পার ?

আঁতকে উঠল নিখিল।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? ওঁর কাছে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করা. আর হাঁড়িকাঠে মাথা দেওয়া আমার কাছে এক। অবশ্য একটা উপায় আছে—

না, না -

কি বল তো ?

পালিয়ে যাবার কথা বলছ তো ? তা হয় না। সে ভীষণ লজ্জার। তাছাড়া অত রিস্ক আমি নিতে পারব না।

নিরুপায় ভঙ্গিতে নিখিল বলল, এত ইতস্তত করলে চলে না। আমি বলছি এতে ভাল বৈ খারাপ হবে না। রেজিস্ট্রি-ম্যারেজ করে নিয়ে আমরা কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকব। তোমার বাবার রাগ আর কতদিন থাকবে ?- তারপর—

তুমি বুঝছ না, এ হয় না—এভাবে আমি নিজের নতুন জীবন আরম্ভ করতে চাই না। বাবার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবার একটা উপায় স্থির করেছি। তারপর দেখা যাক না কি হয়—

এমনই ঘটনাচক্র যে সুনীলাকে বাড়িতে কিছু বলবার দরকার হল না, তার আগেই কিঙ্কর নিখিলের কথা জানতে পারলেন।

ওরা কথাবার্তা শেষ করে, ভিক্টোরিয়া থেকে বেরিয়ে সবে সেক্সপীয়ার সরণীর

মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে—দোলন ঘোষ দেখে ফেলল।

দোলন ঘোষ কিংকর নাগচৌধুরীর মোসাহেব গোছের। তাকে দিয়ে অবশ্য কিংকর মাঝে মধ্যে কাজও করিয়ে নেন। বকুলতলাতেই থাকে দোলন। সে প্রায় লাফাতে লাফাতে রিজেণ্ট পার্কে গিয়ে উপস্থিত হল। এতবড় সংবাদটা যথাস্থানে দিতে না পারলে বুঝি সমস্ত রসাতলে যায়।

কিংকর পার্লারে বসেই বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। দোলন গিয়ে বিনীত ভাবে দাঁড়াল।

মুখ তুলে কিংকর বললেন, কোথায় ছিলে ?

একটু বেরিয়েছিলাম স্যার - এই চৌরঙ্গীর ওধার থেকে ঘুরে এলাম আর কি। ...বসতে পারি স্যার ?

বসবে বৈকি। তোমার বিনয় অনেক সময় আমাকে বিরক্ত করে তোলে। যাক, প্রায়ই শুনি চৌরঙ্গীর দিকে যাও—কি কর ওখানে গিয়ে ?

বসতে বসতে দোলন ঘোষ বলল, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে যাই।

কিসের অভিজ্ঞতা ?

নানা বিষয়ের অভিজ্ঞতা। চৌরঙ্গী হল স্যার কলকাতার এন্‌সাইক্লোপিডিয়া। ওখানে এমন জিনিস নেই যা শোনা যায় না, এমন জিনিস নেই যা দেখা যায় না যেমন ধরুন না স্যার, আজকেই -

কিংকর কৌতুক বোধ করছিলেন।

থামলে কেন ?

বলতে একটু সংকোচ হচ্ছে স্যার !

সংকোচ বোধটা তোমার আছে তাহলে ? ভনিতা না করে যা বলবার বলে ফেল।

চৌরঙ্গীর দিকে না গেলে স্যার ব্যাপারটা জানতেই পারতাম না। তাই বলছিলাম, চৌরঙ্গী হল -

আঃ। দোলন—

এই যে বলি স্যার ! আমার ওপর রাগ করতে পারবেন না কিন্তু। মিসিবাবাকে দেখলাম স্যার একটা ছোকরার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে—

সোজা হয়ে বসলেন কিংকর।

কাকে দেখলে, নীলাকে ?

হ্যাঁ স্যার।

ভুল দেখনি তো ?

ভাল করে না দেখলে কি আর আপনাকে বলতে সাহসী হই স্যার। ঘনিষ্ট ভাবে দুজনকে কথাবার্তা বলতে দেখেছি। ভাবলাম—

দোলন ঘোষকে থামিয়ে কিংকর প্রশ্ন করলেন, তুমি তাদের কোন্ রাস্তায় দেখেছ।

সেক্সপীয়ার সরণীর মোড়ে স্যার।

হুঁ। তুমি এখন যাও ঘোষ, আমি একটু একলা থাকতে চাই।

দোলন ভয়ে ভয়ে স্থান ত্যাগ করল। কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি। কিঙ্কর গুম হয়ে বসে রইল। সুনীলার সম্পর্কে তাঁর ধারণা একটু অন্যরকম ছিল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট কুড়ি পরেই সুনীলা বাড়ি ফিরল। ও যে বাড়ির গাড়িতে যায়নি, তাও তিনি বুঝতে পারলেন। বাপের দিকে এক ঝলক হেসে পার্লার অতিক্রম করছিল সুনীলা।

নীলা—

থামল সুনীলা।

কিছু বলবে বাবা?

ট্যাক্সি বা ট্রামে-বাসে তুমি যখন-তখন ঘুরে বেড়াও আমি তা পছন্দ করি না।

আমি তো খুব বেশি দূরে যাইনি বাবা। এখানেই—

তুমি চৌরঙ্গী গিয়েছিলে, এবং প্রায়ই যাও।

সুনীলা চুপসে গেল।

কিঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন মেয়ের দিকে।

ছেলেটি কে?

মানে…

কিছুক্ষণ আগে যে ছেলেটির সঙ্গে তুমি ছিলে তার কথাই জিজ্ঞেস করছি।

যে কোন উপায়েই হোক, কথাটা কানে উঠেছে বাবার। সুনীলা দ্রুত নিজের মনকে গুছিয়ে নিল। এই সুযোগের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করতে না পারলে ঠকতে হবে।

সুনীলা গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, তুমি নিখিলবাবুর কথা বলছ বাবা?

নিখিল। কি করে সে?

আসামে তাঁর বিরাট কাঠের কারবার আছে। তাকে দেখলে তোমার ভাল লাগবে।

হুঁ। আমার সঙ্গে তাকে দেখা করতে বলবে।

আনন্দে সুনীলার মন দুলে উঠল।

এর পরের ইতিহাস আরো বিচিত্র!

দেখা হল দুজনের। অভিজ্ঞ কিঙ্কর নিখিলকে বাজিয়ে দেখে বুঝলেন, খালি কলসির ঢনঢনানিতেই তার মেয়ে ভুলেছে। কথার মারপ্যাঁচে মিথ্যাকে সত্যের রূপ দিতে ছোকরা ওস্তাদ। তিনি এ সম্পর্কেও নিশ্চিত হলেন—আসামে কাঠের ব্যবসা তো নেই, এমন কি সে কোন দিন আসামে গেছে কিনা সন্দেহ।

নিখিলকে অবশ্য ভদ্রভাবেই বিদায় দিলেন কিঙ্কর। তবে সেই দিন থেকে সুনীলার বাড়ি থেকে বেরোন বন্ধ হল।

মেয়ে যাতে আবার কারুর প্রেমে না পড়ে যায় বা নিখিলের সঙ্গে সরে পড়তে না পারে, সেই দিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রইল। শুধু তাই নয়, তার বিয়ের জন্য হাফ

ডজন ঘটক অ্যাপয়েন্ট করলেন। ঘটকরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল। অনেক বাছাবাছির পর বেনারসের মৃন্ময়বাবুর ছেলে মানসকে পছন্দ করলেন কিংকর। মৃন্ময়বাবুর বেবিফুডের ফলাও ব্যবসা। ছেলে ওই একটি। মেয়ে নেই।

রাত তখন দশটা।

টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। সুরেন ব্যানার্জী রোডের ডি-লাক্স রেস্তোঁরা তখন প্রায় নির্জন। চাপা আওয়াজে রেডিও বাজছে। কোণের দিকে বসে নিখিল খাচ্ছিল।

তার চেহারার চকচকে ভাবটা এখন নেই। মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি। জামা-কাপড়েও পারিপাট্য নেই। একমনে খেয়ে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ হাসির শব্দে চমকে মুখ তুলল। বরেন হাসছে।

বরেন ডি-লাক্সের মালিক ও ম্যানেজার দুই।

হাসছ যে ?

হাসব না! তোমার বর্তমান অবস্থা দেখে কেউ না হেসে থাকতে পারে? আহা, এই বর্ধমেন্দুর বাতে চন্দন পরে, গলায় মালা দুলিয়ে বিয়ে করতে যাবে তা নয়, ধোড়ো-কাক হয়ে বসে আছ এখানে।

বরেন —

চটছ কেন ? তোমার মনময়ূরী যে এতক্ষণে পরের গলায় মালা দিয়ে দিল, সে অপরাধ কি আমার ?

বরেন নিখিলের বহুদিনের বন্ধু। সমস্ত কথাই তার জানা আছে। সুতরাং ঠাট্টা সে করতে পারে। নিখিল চুপ করে রইল।

বরেন বলল আবার, কাঠের ব্যবসার ভাঁওতাটা পুরনো হয়ে গেছে। মেয়ের বাপদের ওতে আর কাৎ করা সম্ভব হবে না। তার চেয়ে বিহার বা উত্তরপ্রদেশের ল্যাণ্ডলর্ড সেজে বস। সুন্দর চেহারা আছে, বরং—

বিরক্তির সুরে নিখিল বলল, কি বাজে বকছ! রমলা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল আমার নিজের দোষে। এবার ঘাটঘাট বেঁধে কাজ করছি। যে ইণ্টারেস্টে আমার সুনীলার সঙ্গে মেলামেশা করা, তা সাকসেসফুল হবেই।

আর হয়েছে পাখি তো উড়ে গেল।

পাখি উড়লেও নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। সুনীলার খান পঁচিশ প্রেমপত্র আমার কাছে আছে। তাছাড়া বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করে এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছে—তুমি বলতে চাও এগুলো কোন কাজেই লাগবে না ?

নিখিল আবার খাওয়ার দিকে মন দিল।

সুনীলা শ্বশুর-ঘর করতে এল।

প্রচণ্ড ধুমধাম করে তার বিয়ে দিয়েছেন কিংকর। আর দুই মেয়েকে যা দিয়েছিলেন—অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এক লক্ষ নগদ টাকা আর একখানা বাড়ি যৌতুক

দিয়েছেন। মাসে ওই বাড়ি থেকে দেড় হাজার টাকা ভাড়া আদায় হয়।

অপ্রসন্ন মনেই সুনীলা বাপের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়েছে। কিছুই তার ভাল লাগছে না। শ্বশুরবাড়িতে পা দেবার পর মন আরো বিগড়ে গেল। এখানে বিলিতি আদপ-কায়দা কিছুই নেই আটপৌরে পরিবেশ। তাছাড়া শ্বশুরের কেমন হামবড়াই ভাব। শাশুড়ির মেজাজ সেকেলে-শাশুড়িদের মতই।

এ কোন্ পরিবেশে এসে পড়ল সুনীলা।

সবচেয়ে বেশি রাগ হতে লাগল কিংকরের ওপর।

স্ত্রীকে দেখে ভাল লেগেছিল মানসের। ফুলশয্যার রাত্রিকে সরস করে তোলবার অনেক পরিকল্পনা তার মাথায় ছিল। কিন্তু যথাসময়ে তা কার্যকরী করে তোলা সম্ভব হল না। জীবনের এই মধুরতম রাত্রেই মানস চরম তিক্ততার মুখোমুখি দাঁড়াল।

সুনীলার প্রথম কথা হল, কি বিশ্রীভাবে থাক তোমরা।

মানস হেসে বলল, বিশ্রীভাবে আবার কোথায়? আর দশজন যেভাবে থাকে, আমরাও সেইভাবে আছি।

তোমার বাবার উচিত ছিল, তাহ'লে আর দশটা সাধারণ ঘর খুঁজেই বউ আনা। উঁচু দিকে হাত বাড়াবার এই অপচেষ্টা কেন?

মানস দমে গেল। নবপরিণীতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম একান্ত সাক্ষাতের মুহূর্তে এই ধরনের কথাবার্তা সে আশা করেনি।

ও সমস্ত কথা এখন থাক। একটি বিবাহিত জীবনে এই বিশেষ রাত্রি বারবার ফিরে আসে না। এখন আমার—

ওইসব সেকেলেপনা আমার ভাল লাগে না। ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে চলবে তাই নিয়ে আলোচনা করাই হল বুদ্ধিমানের কাজ।

বেশ। বল?

বাড়ির স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং বদলাতে হবে।

আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। বাড়ির কর্তা আমি নই, আমার বাবা। তিনি যতদিন বেঁচে আছেন, তাঁর ওপর টেক্কা দেওয়া আমার শোভা পায় না।

সুনীলার গলায় অস্থিরতা প্রকাশ পেল, এ-রকম বাধ্য ছেলে আজ-কালকার দিনে আছে তাহলে! আমি তোমায় পরিষ্কার ভাবে বলছি, এ-বাড়িতে থাকতে পারব না।

সেকি!!

তোমায় আলাদা বাসা করতে হবে। আমার টাকার অভাব নেই, কোন অসুবিধা হবে না।

গম্ভীর গলায় মানস বলল, তোমার টাকা থাকতে পারে, কিন্তু আমারও তো কর্তব্যবোধ আছে। আলাদা বাসা করে থাকা আমার পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না।

এই তোমার শেষ কথা?

কি ছেলেমানুষের মত কথা বলছ? একটু প্র্যাকটিক্যাল হও সুনীলা। কেন বুঝতে পারছ না, আর সব বাদ দিয়েও বিয়ে হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে

আলাদা হয়ে যাওয়া কত লজ্জার।

আমি জানতে চাই, এই কি তোমার শেষ কথা ?

এটা কর্তব্যবোধের কথা।

সুনীলা আর কিছু বলল না। মুখে কালো পর্দা নামিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বিবাহিত জীবনের আগামী দিনগুলির কথা ভেবে শিউরে উঠল মানস। সে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, আলো নিভিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া সোফায় আশ্রয় নিল।

সুনীলা কলকাতায় চিঠি লিখল। এখানে তার পক্ষে থাকা কেন সম্ভব নয়, বিস্তারিতভাবে লিখল কিংকরকে। দিন সাতেকের মধ্যেই উত্তর দিলেন কিংকর। তিনি লিখলেন বিবাহিত মেয়ের বাপের বাড়ি গিয়ে থাকার চেয়ে বড় লজ্জা আর কিছুই নেই। তাছাড়া ওকে নিজের কাছে এনে রাখা তিনিও সমীচীন মনে করছেন না। পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেওয়াই হল সুবুদ্ধির পরিচায়ক। তাঁর মেয়ে নিশ্চিতভাবে এই কাজ করতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন, তিনি শুধু এইটুকু করতে পারেন, কলকাতায় যে বাড়িটা তাকে দেওয়া হয়েছে তার বিলি-ব্যবস্থার খবরদারি।

অভিমানে সুনীলা ভেঙে পড়ল। তার চিঠির এই উত্তর ? এত ভালবাসা বাবার ? উপায়হীন অবস্থায় সে কেবল গজরাতে লাগল মনে মনে।

এরপর তিনমাস কেটে গেছে।

সুনীলা অসম্ভব বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। একঘরে বাস করে এই পর্যন্ত, মানসের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই থাকে। মানস বারংবার মৃন্ময়বাবুর কাছ থেকে জানতে চেয়েছে, তোমরা কি চেয়েছিলে, বউ না বউয়ের ব্যাংক ভর্তি টাকা ?

আজকাল প্রতিদিন বিকেলে সুনীলা বেড়াতে বেরোয়। নিজেই ড্রাইভ করে গাড়ি। এই গাড়িখানা তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া। মৃন্ময়বাবুর পুত্রবধূর এই 'ডোণ্ট-কেয়ার-ভাব', ভাল লাগছিল না। ভাল লাগবার কথাও নয়। নিজের চেয়ে উঁচু-ঘরে কুটুম্বিতে করতে গিয়ে তাঁকে যে এই আতান্তরের মধ্যে পড়তে হবে তিনি কল্পনা করেননি।

সেদিন সুনীলা সবে সেজেগুজে বেরুচ্ছে—মৃন্ময়বাবু সদর দরজার গোড়াতেই ছিলেন, তিনি মৃদু গলায় বললেন, বৌমা, তোমার প্রতিদিন এইভাবে বেড়াতে যাওয়াটা—

আমার বেড়াতে যাওয়া আপনার পছন্দ নয় ?

বেড়াতে যাবে বৈকি। তবে এইভাবে একলা নয়। মানস তোমার সঙ্গে গেলে আর কোন আপত্তি থাকে না।

আমার একা একা কোথাও যেতেই ভাল লাগে। এতেই আমি অভ্যস্ত। আঁচল উড়িয়ে সুনীলা চলে গেল।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মৃন্ময়বাবু। নিজের কবর নিজের হাতেই

খুঁজেছেন। কিন্তু মানস সে কেন স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতাকে সংযত করবার চেষ্টা করে না ?

সুনীলা গাড়ি থামাল বরুণা-ব্রীজের কাছে এসে। প্রতিদিন এখানেই আসে — জায়গাটা তার মনে ধরেছে। গাড়ি থেকে নেমে, প্রতিদিন যেখানে গিয়ে দাঁড়ায় — সুনীলা সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একজনের ওপর দৃষ্টি পড়তেই হতবাক হয়ে গেল।

নিখিল !!!

নিখিল হাসছে।

সুনীলা নিজের হতবাক ভাবটা কাটিয়ে বলল, তুমি এখানে ?

নিখিল এগিয়ে এল সুনীলার কাছে।

তুমি এখানে নিয়মিত বেড়াতে এসে থাক, এ সংবাদ আমায় সংগ্রহ করতে হয়েছে।

কিন্তু আর আমার সঙ্গে দেখা করে লাভ কি ?

লাভক্ষতির হিসাব ধীরে-সুস্থে মেলানই ভাল। তোমার বাবা মাঝে থেকে বাদ না সাধলে—

বাবাকে একা দোষ দিও না। আমি তো চলে যেতে চেয়েছিলাম, তুমি পিছিয়ে পড়নি ?

কেন পিছিয়ে পড়েছিলাম, সে সংবাদ তো রাখ না। ওই সময় ব্যবসায় এক বিরাট টাল গেল। আমি দিশেহারা—

থাক, আর বানানো গল্প শুনতে ভাল লাগে না। তোমার কোন ব্যবসা নেই। তুমি আমায় ব্ল্যাফ দিয়েছিলে।

আহত সুরে নিখিল বলল, তোমার কি একবারও মনে হয়নি তোমার বাবা তোমাকে ভুল বুঝিয়েছেন ? আমার ব্যবসা আছে নীলা। আসামের মরিয়ানীর আমি একজন নামকরা লোক।

আরো অনেক কথা নিখিল স্বপক্ষে বলে গেল। অবশ্য এত কিছু বলবার দরকার ছিল না। সুনীলার মত বিচিত্র স্বভাবের মেয়েদের কোন বিষয়ে কনভিন্স করতে গলদঘর্ম হতে হয় না। সে অচিরেই স্থির নিশ্চিত হল, কিঙ্কর মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য এরপর গাড়িতে বসে অনেক কথা হল দুজনের। সুনীলা নিজের অবস্থার কথা বর্ণনা করল। এই বিরক্তিকর পরিবেশ থেকে নিখিল তাকে উদ্ধার করতে পারে কিনা জানতে চাইল। নিখিল সঙ্গে সঙ্গে রাজি। তবে বর্তমানে ব্যবসায়িক গোলমালে বিশেষ বিব্রত আছে। সামলে ওঠার পরই সমস্ত ব্যবস্থা হবে। এখন তার কিছু টাকার প্রয়োজন।

অর্থ সাহায্য করবে সুনীলা।

স্থির হল, নিয়মিত তাদের এখানেই দেখা হবে।

দিন গড়িয়ে চলেছে।

ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে খিটিমিটি বাড়িতে লেগেই থাকে। সুনীলা যেন শান্তি চায় না ঝগড়ার মধ্যেই আনন্দ পায়।

মানস মিনতি করে বলে, তুমি যা বলছ, তাতেই রাজি হয়ে যাচ্ছি আমি। তবে কেন অশান্তি করছ?

তুমি শুধু অশান্তি করতেই দেখছ। আমার ওপর কি রকম দুর্ব্যবহার হচ্ছে, তা লক্ষ্য করেছ কি?

আবার কি হল?

তোমরা মানুষ, না কশাই? এই যে আমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কোন ডাক্তারের ব্যবস্থা হয়েছে কি আজ পর্যন্ত?

আকাশ থেকে পড়ল মানস। – তোমার শরীর খারাপ হয়েছে? আমি তো কিছুই জানি না।

তা জানবে কেন? তুমি কিছু জানবে না, তোমার মা, তোমার বাবা – কেউ কিছু জানবে না। তোমরা চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে। কেন বসে থাকবে, তাও জানি।

সেকি! তোমার অসুখে আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব? এ তোমার ভুল ধারণা।

আমি পেটের যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি। কেন যন্ত্রণা হচ্ছে, তাও জানি। তোমরা আমায় শ্লো পয়জন করেছ।

মানস তীক্ষ্ণ গলায় বলল, যা মুখে আসছে, তাই বলছ। তোমার ধারণা, আমরা তোমায় খুন করতে চাই।

ঝাঁঝালো গলায় সুনীলা বলল, হ্যাঁ। তবে তিলে তিলে – যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে।

তোমাকে মেরে আমাদের লাভ কি?

আমি তো আবর্জনা! আমার টাকাটাই হল তোমাদের কাছে সব।

তোমার টাকা তুমি কোথায় কিভাবে রেখেছ, আমাদের জানা নেই। কলকাতার বাড়ি ভাড়ার আদায়পত্র পর্যন্ত তোমার বাবা করেন। এক কাজ কর না, তোমার বাপের বাড়ির পছন্দ মত কাউকে উইল করে দাও, তাহলে তো ভয় নেই। আরেকটা কথা, ভবিষ্যতে কোন দিন, তোমাকে আমরা মেরে ফেলতে চাই, এই ধরনের কথা বলবে না সাবধান করে দিচ্ছি।

চোখ রাঙাচ্ছ যে? মারবে নাকি?

মানস আর কিছু বলল না। পাগলামীর বীজ এদের রক্তে আছে নাকি? ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুতপায়ে।

পরিস্থিতি এত নিম্নমুখী হয়ে উঠল যে, মৃন্ময়বাবু ছেলেকে বলতে বাধ্য হলেন, আমাদের কোন ব্যবস্থাই তো বৌমা মেনে নিতে চাইছেন না। তোমার মা'র সঙ্গে

আমি পরামর্শ করে স্থির করেছি, ওঁকে আরো স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করবার সুযোগ দেব !

মাথা নত করে মানস বলল, আমাদের একটা কথাও তো সে গ্রাহ্য করে না বাবা। স্বাধীনভাবেই তো আছে।

আমার ইচ্ছে—অবশ্য অনন্যোপায় হয়েই বলছি. উনি আলাদাভাবে সংসার করুন। এতে—

তুমি আমাদের পৃথক করে দিতে চাইছ ?

আমাকে তুমি ভুল বুঝো না মানস। আমার মনে হয়, এতে ক্রমবর্ধমান অশান্তিকে সংযত করা সম্ভব হবে।

মানস আর কিছু বলল না। তার বলবার আর আছেই বা কি ? সুনীলারও তো সে ইচ্ছে।

বড় বাড়ি। কোন অসুবিধা হল না। একটা পোরসান ছেড়ে দেওয়া হল। নতুন সংসার পাতল সুনীলা। উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম আরম্ভ করল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মানস। বাবার অনুমান যথাযথ হয়েছে।

কিন্তু খুব বেশি দিন এই ব্যবস্থা রইল না, আবার যে-কে সেই ! অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, সময় মত খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত হয় না। অগত্যা মানস একজন রান্নার জন্য ঠাকুর বহাল করল। সাংসারিক অশান্তি তো আছেই তার ওপর খাওয়া-দাওয়াও যদি নিয়মিত না হয়, তবে মানুষ বাঁচবে কিভাবে ?

এদিকে—

মৃন্ময়বাবুর। কাছে সেই বিশেষ সংবাদ বহন করে নিয়ে এলেন নবেন্দুবাবু। প্রথমে তিনি বিশ্বাস করতে চাননি, এও কি সম্ভব ? কিন্তু নবেন্দুবাবুর চোখে দেখা ঘটনাকে উড়িয়ে দেবেন কিভাবে ?

নবেন্দু রায় মানসের মামা।

লেখাপড়া বিশেষ কিছু করেননি। অল্প বয়সে কুসংসর্গে মিশে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। দশ বছর কোথায় ডুব মেরেছিলেন কেউ জানে না। তিনি অবশ্য বলেন, বোম্বেতে বিস্কুট ফেরি করে বেড়াতেন। কেউ বিশ্বাস করে না এ-কথা। অনেকের ধারণা, বেশ কয়েক বছর তাঁর জেলে কেটেছে।

যা হোক, নবেন্দু রায় একদিন উদয় হলেন ভগ্নিপতির বাড়িতে। দিদিকে সকাতরে জানালেন, এখানে থাকার জায়গা না দিলে, রাস্তায় শুকিয়ে মরা ছাড়া আর কোন পথ নেই। হাজার হোক ভাই, মৃন্ময়বাবুকে বলে কয়ে স্নেহময়ী নবেন্দুর ভবিষ্যৎ পাকা করে ফেললেন। সেই থেকে বছর পনের তিনি এঁদের কাছেই আছেন। ব্যবসার সেলিং কাউন্টারে নিয়মিত গিয়ে বসেন বটে, তবে তাঁর প্রধান কাজ হল, ভগ্নিপতির হ্যাঁ এ হ্যাঁ মিলিয়ে যাওয়া।

তুমি ঠিক দেখেছ তো ?

মৃন্ময়বাবুর কথায় নবেন্দুর মুখে তৈলাক্ত হাসি খেলে গেল।

আপনি বিশ্বাস করতে না চাইলে আমি নিরুপায়। আপনি তো জানেন, বরুণা-ব্রীজের দিকে আমি কখনো যাই না—আজ দৈবাৎ গিয়ে পড়েছিলাম।

তখনও রিক্সা থেকে নামিনি ; দেখলাম, কিছু দূরে বৌমা গাড়ি থেকে নামছেন। একটি লোক এগিয়ে এল তাঁর কাছে। কি বলাবলি হল, তারপর দুজনে গাড়ির মধ্যে ঘেসাঘেসি করে বসলেন।—আপনাকে তো সব কথা বলেছি একবার।

এ তো খুবই গর্হিত ব্যাপার নবেন্দু। মানস বোধহয় এ-বিষয়ে কিছু জানে না এখনও।

আপনাকে তো আমি আগেই সাবধান করেছিলাম জামাইবাবু। ও-ঘর থেকে মেয়ে আনবেন না, তখন আমার কথা শুনলে আর এত ঝামেলা পোহাতে হত না।

যা হয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে আক্ষেপ করে তো আর লাভ নেই। এখন কি করা যাবে, তাই বল ? এইভাবে বৌমা যদি বাড়াবাড়ি করতে থাকেন তাহলে আমার মানসম্মান বেনারসে ক'দিন থাকবে।

একশো বার।

তোমার কাছ থেকে একটা পরামর্শ চাইছি।

বৌমাকে একবার বলে দেখলে হয় না ?

তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? এই ধরনের অভিযোগ কেউ কখনো মেনে নেয় ? মাঝ থেকে আমি চূড়ান্ত অপমানিত হব।

বৌমার কি রকম মুখ, তা তো তোমার অজানা নয়।

নবেন্দু মাথা চুলকাতে লাগলেন।

তাহলে ...

ভেবে দেখ একটু। আমিও ভাবি।

মানস ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর, সুনীলা পাখা চালিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দিল। একটা গল্পের বইয়ে সবে মন বসাতে গেছে, ফোন বেজে উঠল। বিরক্তি-সূচক শব্দ করে সুনীলা খাট থেকে নেমে টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের কাছে এগিয়ে গেল। ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে বলল হ্যালো—

অপরপ্রান্ত থেকে নিখিলের গলা ভেসে এল।

আমি নিখিল। কি করছ এখন ?

ও, তুমি !

কি করছ ?

দিবানিদ্রা দেবার চেষ্টা করছিলাম। তোমার টাকা চাই বোধহয় ?

ঠিক ধরেছ। হাজার তিনেকের দরকার ছিল।

টাকাটা দরকার ব্যবসার জন্যে নিশ্চয় ?

হ্যাঁ।

সুনীলা নিস্পৃহ গলায় বলল, তোমায় টাকা আর দিতে পারব না। আমি কি কামধেনু গাই ? ইচ্ছে মত যখন-তখন দুয়ে নিলেই হল।

কিন্তু....

তুমি যে আমায় ঠকিয়ে চলেছ, বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বুঝতে পেরেছি।

যার আসামে ব্যবসা, সে বছরের পর বছর বেনারসে বসে আছে কেন, বলতে পার ?

এবার নিখিলের গলায় দৃঢ়তা প্রকাশ পেল।

টাকা যে তোমায় দিতেই হবে নীলা! তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি, তোমার অনেকগুলো ইনিয়ে বিনিয়ে লেখা চিঠি, যাকে প্রেমপত্র বলে আর কি– আমার কাছে আছে। তুমি নিশ্চয় চাইবে না, সেগুলো তোমার স্বামীর হাতে বা শ্বশুরের হাতে পড়ুক।

আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, এ-রকম একখানা চিঠিও তোমার কাছে থাকার কথা। সবগুলো তোমার যাকে ইচ্ছে দেখাতে পার। তুমি যদি ভেবে থাক, তোমার ভয়ে টাকা দিয়ে যাচ্ছি, তাহলে ভুল করেছ। ওটা আমার একটা খেয়াল। অনেক টাকা আছে, কিছু বিলিয়েছি। আর নিশ্চয় কিছু বলবার নেই।

শোন নীলা, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই! মানে

সুনীলা রিসিভার নামিয়ে রাখল।

আবার খাটে এসে সবে বসেছে, চাকর ঘরে এল। তার হাতে গোটা কয়েক চিঠি। চিঠিগুলো কর্ত্রীর হাতে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুনীলা আধশোয়া অবস্থায় খামের মুখ ছিঁড়তে লাগল।

বেলা পাঁচটার সময় মানস নিজেদের বেবিফুড বিক্রয় কেন্দ্রে পৌঁছাল। রাত ন'টা পর্যন্ত প্রতিদিন সে এখানেই থাকে। ব্যবসার কাজকর্ম দেখতে হয়। মৃন্ময়বাবু বা নবেন্দু এ-সময় থাকেন না। সারাটা দুপুর মানস শিশিরের কাছেই ছিল। শিশির তার মনকে হালকা করে দেবার অনেক চেষ্টা করেছে।

ন'টার আগেই মানস বাড়ি ফিরল। ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়বে। ড্রইংরুমের ডিভানের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়বে সুনীলার সঙ্গে মোটেই দেখা করবে না আজ।

করিডরেই বদ্রীর সঙ্গে দেখা।

ভৃত্যকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মানস বলল, আমি খাবার ঘরে যাচ্ছি, ঠাকুরকে ভাত দিয়ে যেতে বল।

বদ্রী মাথা চুলকে বলল, ঠাকুর দুপুরে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি বাবু। তার বাপের বাড়াবাড়ি অসুখ।

তুই তাহলে ভাত দিয়ে যা।

বদ্রী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কি হল ?

আজ রান্না হয়নি।

সেকি! কেন ?

বৌদির বোধহয় শরীর খারাপ হয়েছে, উনি ঘর থেকে বেরোননি।

শরীর খারাপ হয়েছে কিনা ভাল করে খোঁজ নিয়ে আমায় জানাবি তো।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আমি দু-বার ধাক্কা দিয়েছিলাম। উনি দরজা না খুললে আমি কি করব বলুন?

নতুন করে মন বিরক্তিতে ভরে উঠল মানসের। এ আবার কোন নতুন আদিখ্যেতা, শরীর অসুস্থ থাকলেও দরজা বন্ধ করে রাখার কি স্বার্থকতা? দক্ষিণ হাতের ব্যবস্থা কি হবে, শুধু এইটুকু জানবার জন্য মানস সুনীলার কাছে চলল।

কয়েকবার ধাক্কা দিল দরজায়। কোন সাড়া নেই।

জোরে জোরে নাম ধরে ডাকল। কোন সাড়া নেই।

এবার ভয় পেল মানস। অজ্ঞান হয়ে পড়েনি তো? এখন তার করণীয় কি? বারকতক আরো দরজায় ধাক্কাধাক্কি করবার পর মানস ছুটতে ছুটতে গেল বাড়ির অপর অংশে। মৃন্ময়বাবু রেডিও শুনছিলেন। স্নেহময়ী ক্রুশ দিয়ে ক্রুচেটের সুতোয় বুনছিলেন কি একটা।

ছেলেকে দৌড়ে আসতে দেখে দ্রুত গলায় স্নেহময়ী প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে খোকা?

সুনীলা দরজা বন্ধ করে রয়েছে। অনেক ধাক্কাধাক্কির পরও খুলছে না। সাড়াশব্দও দিচ্ছে না।

সেকি!

রেডিও বন্ধ করে মৃন্ময় বললেন, শরীর খারাপ হয়ে পড়েনি তো? কতক্ষণ ধরে দরজা বন্ধ রয়েছে?

বদ্রী বলছে অনেকক্ষণ ধরে—বিকেলের আগে থেকেই।

চল তো দেখি।

ওঁরা উঠলেন।

মানস মা ও বাবাকে দরজার সামনে নিয়ে এল।

অনেক ধাক্কাধাক্কি ও ডাকাডাকি করার পরও দরজা খুলল না। তিনজনে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সুনীলা যত অবাধ্যই হোক, এত ডাকাডাকির পর দরজা নিশ্চয় খুলে দিত। নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটেছে।

নবেন্দু এই সময় সকলের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন। দ্রুত পরামর্শ করলেন চারজনে। দরজা ভাঙাই সাব্যস্ত হল। বদ্রী নিজের শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে দরজায় ধাক্কা মারতেই খিল ভেঙে পড়ল। সকলে ঢুকলেন ঘরে।

অন্ধকার। মানস অভ্যস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে আলো জ্বালল। সকলে একযোগে তাকালেন বিছানার দিকে। সেখানে কেউ নেই। সকলের চোখে পড়ল শুধু চাদরের গোটা কয়েক কুঞ্চন।

স্নেহময়ী প্রথমে দেখতে পেলেন। প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, ওই তো—

সকলে একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন। উত্তর দিকের জানলার কাছে, মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সুনীলা। তার বাঁ পাটা মুড়ে গেছে। শরীর স্থির নিষ্কম্প।

মানস সবার আগে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল স্ত্রীর ওপর। সমস্ত শরীরে কাঠিন্যের ঢল। একটা ধোঁয়াটে সন্দেহ মনের মধ্যে গুলিয়ে উঠল। তবে

কি—তবে কি—

তবু অনুচ্চ গলায় ডাকল মানস, সুনীলা   সুনীলা—

কোন সাড়া নেই।

স্নেহময়ী পুত্রবধূর গায়ে হাত দিলেন। বরফের মত কনকনে। তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলেন তিনি। তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠল। কপালে ঘাম দেখা দিল।

অসংলগ্ন ভাবে বললেন, আমি তো ভাল বুঝছি না · মনে হচ্ছে ডাক্তারকে খবর দাও আগে।

মৃন্ময় বললেন, নবেন্দু ফোন করে দাও ডাক্তার করকে ' না না. তুমি চলে যাও বরং, একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এস—

নবেন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মানস ক্ষীণ গলায় বলল, এই ভাবে এখানে পড়ে থাকবে?

স্নেহময়ী বললেন, বিছানায় শুইয়ে দেওয়া ভাল।

তিনজনে ধরাধরি করে সুনীলাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। আর কোন সন্দেহ নেই। তিনজনের মনের মধ্যে যে সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে, তাই সত্যি। মারা গেছে সুনীলা। মুখের চামড়া বর্ণচ্যুত হয়েছে। মোড়া পা সোজা করা গেল না।

কারুর দৃষ্টি কারুর ওপর নেই। কারুর মুখে আর কোন কথা জাগল না। এই অভাবনীয় ঘটনায় বিমূঢ় হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। স্নেহময়ী দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন মাটিতে। মৃন্ময় নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলেন সুনীলার দিকে। মানসও।

মিনিট পনেরর মধ্যে ডাঃ করকে সঙ্গে নিয়ে নবেন্দু ঘরে প্রবেশ করলেন। আগেই অবস্থাটা বলে নিয়েছিলেন নবেন্দু।

ডাঃ কর নীরবেই বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন। সুনীলাকে পরীক্ষা করবার কিছু ছিল না। এক নজর দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন, মারা গেছে।

তবে মৃতার মুখের অবস্থা অভিজ্ঞ ডাক্তারের মনে সংশয় জাগাল। তিনি এবার ঝুঁকে দেখতে লাগলেন। মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ঘ্রাণ নিলেন।

ডাক্তার—

মৃন্ময়কে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে ডাঃ কর বললেন, মারা গেছেন—অন্তত ঘন্টা চারেক আগে তো বটেই!

কথাটা শেষ করে ডাক্তার একটু ইতস্তত করলেন। গলায় ঝোলান স্টেথিস-স্কোপটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেন। তারপর বললেন, দেরি না করে এখুনি একবার পুলিসে খবর পাঠান—

পুলিস! আর্তগলায় মৃন্ময় বললেন, পুলিসে খবর পাঠাতে বলছেন কেন?

মৃত্যু স্বাভাবিক নয় বলেই আমার অনুমান। আগে থেকে ডিফেন্স না নিয়ে রাখলে পরে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে।

ডাঃ কর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর সকলের শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে হিম-প্রবাহ নামতে আরম্ভ করল। মৃত্যু স্বাভাবিক নয়! তবে কি আত্মহত্যা করেছে

সুনীলা ?

মানস টেবিলের দিকে তাকাল। তারপর অন্যান্য অংশেও দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। কোন চিঠি লিখে রেখে যায়নি বলেই মনে হচ্ছে।

বাবা!

চটকা ভাঙল যেন মৃন্ময়বাবুর।

অ্যাঁ!

ডাক্তারবাবুর কথামত পুলিসকে সংবাদটা জানিয়ে দেওয়াই ভাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়! নবেন্দু, কোতয়ালিতে ফোন কর; আর কলকাতায় ট্রাঙ্ককল বুক করে দাও। কিংকরবাবুর ফোন নাম্বার তোমার জানা আছে তো ?

জানি।

নবেন্দু টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোলেন।

স্নেহময়ী তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই ইন্সপেক্টর হরিশংকর চিনয় সদলবলে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। কর্তব্যপরায়ণ অফিসার হিসেবে সুনাম করতে তাঁর চাকরি জীবনের অর্ধেক কেটে গেছে। ছিলেন আগ্রায়; বছর দুয়েক হল বদলী হয়ে এসেছেন বেনারসে।

স্নেহময়ী ছাড়া আর তিনজন ঘরেই অপেক্ষা করছিলেন। সিঁড়িতে ভারি জুতোর শব্দ পেয়েই তিনি স্থানত্যাগ করেছেন। কিভাবে মৃতদেহ আবিষ্কার করা হয়েছে, সেকথা সবিস্তারে চিনয়কে বললেন নবেন্দু। একথাও বললেন, জানলার তলা থেকে দেহ তুলে নিয়ে এসে তাঁরাই বিছানায় শুইয়েছেন।

মৃতদেহ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে চিনয় বললেন, আমাদের অনুপস্থিতিতে বডি তুলে আনা আপনাদের উচিত হয়নি।

কোন রকমে মৃন্ময়বাবু বললেন, বিষয়টিকে তলিয়ে দেখার মত মনের অবস্থা তখন আমাদের ছিল না ইন্সপেক্টর! কি রকম দেখছেন ?

আপনাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানের অনুমান মিথ্যা নয়। অ্যাবনরম্যাল ডেথ্। অবশ্য পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পাওয়ার আগে জোর দিয়ে কিছু বলা ঠিক নয়।

কথা শেষ করে মিঃ চিনয় সুনীলা যেখানে পড়েছিল, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। জানলার ঠিক নিচেই ছোট টুলের ওপর কুঁজো রাখা রয়েছে। স্টেইনলেস স্টিলের গেলাস দিয়ে কুঁজোর মুখ ঢাকা, আর কিছু নেই সেখানে।

ঘরে বড় বড় তিনটি জানলা ও দুটি দরজা। একটি দরজা দিয়ে সকলে ঘরে ঢুকেছেন। অন্যটি ভেজান।

ভেজান দরজার দিকে আঙুল নির্দেশ করে চিনয় প্রশ্ন করলেন, ওই দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় ?

নবেন্দু বললেন, অ্যাটাচট বাথরুমের দরজা ওটা।

ইন্সপেক্টর এগিয়ে গিয়ে দরজায় চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। তিনি উঁকি মারলেন। তারপর বাথরুমের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আধুনিক বাথরুম বলতে যা

বোঝায় তাই। ঝকঝক তকতক করছে। বাথরুমের এক অংশে পার্টিশন দিয়ে ল্যাভেটারি। হঠাৎ ইন্সপেক্টরের দৃষ্টি পড়ল ওধারের আরেকটা দরজার ওপর। হাট করে খোলা।

উনি খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজার ওধারে স্পাইরেল পাকে পাকে নেমে গেছে। এই ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে সহজেই ওপর-নিচে করা যায়। দরজাটা বন্ধ করে চিন্তিত মনে উনি ফিরে এলেন শোবার ঘরে।

বাথরুমের ওধারে ঘোরান সিঁড়ি লাগান আছে কেন?

ইন্সপেক্টরের প্রশ্নের উত্তরে মৃন্ময়বাবু বললেন, মেথরের যাওয়া-আসার সুবিধা হয় ওতে।

সেপটিক ল্যাট্রিনে মেথরের কি দরকার।

মাঝে মাঝে ধোওয়া-মোছা করে আর কি—

আচ্ছা, ওই দরজা কি সব সময় খোলা থাকে?

খোলা থাকলে তো চোর ঢুকে পড়বে: বন্ধই থাকে। মেথরকে ধোয়া মোছা করতে ডাকা হলে খোলা হয়।

আজ মেথরকে ডাকা হয়েছিল কি?

না। দরজাটার সম্বন্ধে এত প্রশ্ন কেন করছেন?

প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, এবার আমি বডি পোস্টমর্টেমে নিয়ে যেতে চাই। অবশ্য তার আগে গোটা কয়েক ছবি তুলে নিতে হবে। উনি যেখানে মারা গেছেন, বডি সেখানে পড়ে থাকলেই ভাল হত। বডি খাটের ওপর তুলে এনে আপনারা অত্যন্ত অন্যায় করেছেন।

তাঁর ইঙ্গিতে ফটোগ্রাফার এগিয়ে গেল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মৃন্ময় বললেন, বৌমা যে এভাবে আত্মহত্যা করবেন, আমরা কখনই ভাবতে পারিনি। যাই হোক, তাঁর সৎকারের যাতে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে পারি, সে ব্যবস্থা করে দেবেন ইন্সপেক্টর!

দেখি। কিন্তু উনি যে আত্মহত্যা করেছেন, আপনারা এ-সম্পর্কে নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?

আপনারা অস্বাভাবিক মৃত্যু যখন বলছেন, তখন আত্মহত্যা ছাড়া আর কি হতে পারে? বৌমা কিছুদিন থেকেই নিজের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছিলেন না।

ইন্সপেক্টর আর কিছু বললেন না। একে একে ঘরের তিনটে জানলা বন্ধ করে দিলেন। মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হল নিচে। গাড়ি সেখানে অপেক্ষা করছে। তারপর বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে শীল করে দেওয়া হল। বিদায় নেবার আগে ইন্সপেক্টর বলে গেলেন, কেউ যেন তার অনুমতি ছাড়া বেনারসের বাইরে পা না দেন।

পরের দিন কিঙ্কর দোলনকে সঙ্গে নিয়ে বেনারসে এসে উপস্থিত হলেন।

শোকে মুহ্যমান অবস্থা। ছোট মেয়েকেই সবচেয়ে ভালবাসতেন. সেই কিনা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল!

নবেন্দুর কাছ থেকে ট্রাঙ্ককল পেয়ে প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করতে মন চায়-নি। কিন্তু এই ধরনের রসিকতা কেউ করতে পারে না, বিশেষত বাপের সঙ্গে। তবু তিনি বলেছেন, মৃন্ময়বাবুকে রিসিভারটা দিন। তাঁর মুখ থেকে শুনতে চাই, মৃন্ময়বাবুও সেই মর্মান্তিক সংবাদেরই পুনরুক্তি করলেন।

রাত সাড়ে এগারটার সময় ট্রাঙ্ককল পেয়েছিলেন। তখন আর কোন ট্রেন নেই। বাই-কার যাবার ইচ্ছে মনে জেগেছিল, ছেলেরা বাধা দিল। কয়েক মাস ধরে তাঁর মনের অবস্থা ভাল নেই। শেয়ার মার্কেটে উপর্যুপরি বিপর্যয় হওয়ায় প্রচুর অর্থ ক্ষতি হয়েছে। তার ওপর এই মর্মন্তুদ ঘটনা। স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ির লোকেরা তাঁকে এতটা পথ মোটরে যেতে দিতে সাহসী হয়নি।

পরের দিন ভেস্টিবিউল এক্সপ্রেসে রওনা হলেন। মোগলসরাই পেঁছিলেন রাত ন'টার সময়। তারপর ওখান থেকে ট্যাক্সিতে বেনারস যাত্রা করলেন। বেয়াইবাড়িতে উঠতে তাঁর ইচ্ছে করল না। হোটেলে মালপত্র রেখে, দোলনকে সঙ্গে নিয়ে বেয়াইবাড়িতে এলেন। বাইরের ঘরে মুহ্যমানের মত বসেছিলেন মৃন্ময়। কিঙ্করকে দেখে হাহাকার করে উঠলেন।

ঘটনা বললেন যথাযথ।

গম্ভীর মুখে সমস্ত শুনে কিঙ্কর বললেন, এর জন্য আপনারাই দায়ী।

আমরা!

হ্যাঁ, আপনারা। বাড়ির সকলে তাকে নিয়মিত কষ্ট দিতেন। তার অভিমান-বোধ ছিল তীব্র। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা ছাড়া আর সে কি করতে পারে।

আপনি পরিস্থিতি বোঝবার চেষ্টা করুন বেয়াইমশাই। বৌমার প্রতিটি ব্যাপারে আমরা সায় দিয়ে এসেছি। তিনি আলাদা থাকতে চেয়েছিলেন, তাঁর আলাদা সংসার করে দিয়েছিলাম।

সবই যদি হয়েছিল, তবে সে চলে গেল কেন? কত শোচনীয় মনের অবস্থা হলে মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে? যাক, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি এখন হোটেলে ফিরছি, তবে –

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মৃন্ময় বললেন, আপনার মালপত্র আমি হোটেল থেকে আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছি। আমার বাড়ি থাকতে আপনি অন্যত্র থাকবেন, এটা ঠিক নয়।

কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয়, তা আমি জানি, ও সম্পর্কে আপনি ব্যস্ত হবেন না।

তিনি কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

পরের দিন।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়। দু'দিন হয়ে গেল সুনীলা মারা গেছে। স্ত্রীকে

কোনদিন ভালবাসতে পারেনি মানস। অবশ্য এর জন্য দায়ী সুনীলা নিজেই। তার মনকে বারংবার ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে সে স্বামীর ভালবাসা পাবার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। তবুও আজ মানসের মন উদাস হয়ে উঠছে। অনেক ছোটখাটো ব্যাপার, অনেক ঝগড়া বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে।

মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠত। স্ত্রীর দিকে তাকাতে পর্যন্ত ঘৃণা বোধ হত। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করত কোথাও। তবুও কি সে কোনদিন চেয়েছিল. সুনীলার জীবনের ওপর যবনিকা এইভাবে নেমে আসুক। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে মানস অতীতের ঘটনার স্রোতে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল।

শিশিরও ঘরে ছিল।

বন্ধুর জীবনে এই বিপর্যয় আসায় ও কম বেদনাহত নয়। এগিয়ে গিয়ে মানসের কাঁধে হাত রেখে বলল. মন খারাপ করে লাভ কি? তবে এক হিসেবে ভালই হয়েছে বলা চলে। তোমার জীবনও দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল।

জানলার কাছ থেকে সরে এল মানস।

তুমি ঠিকই বলছ শিশির। সুনীলা মারা গিয়ে সব দিক রক্ষা করে গেছে। তবু মন খারাপ হয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে।

বদ্রী ঘরে এল ঃ দাদাবাবু, ইন্সপেক্টর সাহেব এসেছেন। আপনাকে ডাকছেন। বাক্যব্যয় না করে বদ্রীকে অনুসরণ করল।

বাইরের ঘরে প্রবেশ করে শিশির দেখল, ইন্সপেক্টর একটা চেয়ারে একটু হেলে বসে সিগারেট টানছেন। তাঁর মুখ অসম্ভব গম্ভীর। ঘরে মৃণ্ময় ও নবেন্দুও রয়েছেন। দুজন.ক দেখলেই মনে হয়. দুজনে অসম্ভব বিচলিত।

মানসের দিকে তাকিয়ে দ্রুত গলায় মৃণ্ময় বললেন, খোকা, ইন্সপেক্টর এক অসম্ভব কথা বলেছেন। বৌমা নাকি খুন হয়েছেন!

খুন!

ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ইন্সপেক্টর বললেন, এ ক্লিয়ার কেস অব হোমিসাইড। নিখুঁত পরিকল্পনার সাহায্যে কেউ ভদ্রমহিলাকে খুন করেছে।

কাঁপা গলায় মানস বলল, কিন্তু কিভাবে বুঝলেন আমার স্ত্রী খুন হয়েছেন?

মৃতদেহ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। পোস্টমর্টম না হওয়া পর্যন্ত অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হবার সম্ভাবনা কম তাই তখন কোন মন্তব্য করিনি। পটাসিয়াম সায়ানাইড মৃত্যুর কারণ।

কিন্তু এতে.......

আমায় কথা শেষ করতে দিন। দুটি বিষয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আত্মহত্যা নয়। আত্মহত্যা হলে একটা স্বীকৃতি পত্র থাকত। তাঁর লেখা সেরকম কোন চিঠি পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত. মৃতদেহ পা মোড়া অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকবে কেন? বিছানায় শুয়ে কিম্বা চেয়ারে বসে তিনি সায়ানাইড গ্রহণ করলেন না কেন?

শিশির প্রশ্ন করল, পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে কি বলা হয়েছে সায়ানাইড খেয়েছিলেন তিনি ?

আপনার পরিচয় ?

মানস বলল, আমার বিশিষ্ট বন্ধু এবং পরিবারের একজন শুভাকাঙ্খী ব্যক্তি।

ও। হ্যাঁ, তিনি সায়ানাইড খেয়েছিলেন। তাঁর জিভে সায়ানাইডের গুঁড়ো লেগেছিল।

তাহলে একটা বিশেষ কথা কি অ্যারাইজ করছে না ?

কোন্ কথা ?

ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। তাছাড়া কাউকে খেতে বললেই কি সে অম্লান বদনে সায়ানাইড খেয়ে নেবে ?

ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকলেও, মেথর ঢোকার দরজা খোলা ছিল ভুলে যাবেন না। ওই পথ দিয়েই হত্যাকারী ঘরে ঢুকেছিল সন্দেহ নেই। সায়ানাইড তাঁকে কিভাবে খাওয়ান হয়েছিল মিস্ট্রি সেখানেই। ধীরে ধীরে তার সমাধান পাওয়া যাবে। এবার আমি তদন্ত করতে চাই। মৃন্ময়বাবু ছাড়া আর সকলে ঘরের বাইরে যান—তবে বাড়ির বাইরে যাবেন না। ক্রমে সকলকেই দরকার হবে।

মানস শিশির ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নবেন্দুও।

মৃন্ময়বাবুর মুখ শুকিয়ে উঠেছে। এক অজানা ভয়ে মন শিউরে উঠেছে। পুলিসের অনুমান বোধহয় ঠিকই, সুনীলা আত্মহত্যা করেনি খুন হয়েছে। এখন তাঁকে কি ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে কে জানে ?

তিনি ঘামতে আরম্ভ করলেন।

ইন্সপেক্টর বললেন, কিংকরবাবু থানায় গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। আমি জানতে পেরেছি, সুনীলাদেবীর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। খিটিমিটি নাকি লেগেই থাকত ?

ঠিকই শুনেছেন। তবে আমরা সব সময় তাঁর সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য চেষ্টা করতাম। কেন জানি না, বৌমা অশান্তি করবার জন্য তৎপর হয়ে থাকতেন।

কিছু মনে করবেন না, আপনি কি তাঁকে ঘরে এনেছিলেন লোভনীয় ডাউরির জন্য ?

ঠিক তা নয়। টাকা আমারও কিছু আছে। ভাল বংশের মেয়ে আমার পুত্রবধূ হোক এই আমি চেয়েছিলাম। টাকাটা উপরি এসেছে। আপনি অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন, আমার কোন দাবী ছিল না।

সেই বিপুল পরিমাণ টাকা এখন বোধহয় আপনারাই পাচ্ছেন ?

বলতে পারি না। বৌমা উইল করেছেন - এরকম একটা কথা যেন আমি শুনেছিলাম। টাকার ব্যবস্থা কিভাবে হয়েছে আমার জানা নেই।

সুনীলাদেবীর প্রতি আপনার বিরূপ মনোভাব ছিল। আপনাদের শান্তির সংসারে অশান্তি আনার জন্য দায়ী তিনি। তাঁর মৃত্যু কি আপনি আন্তরিক

ভাবে চাননি ?

আপনার এই প্রশ্ন আপত্তিকর ইন্সপেক্টর। আমি বৌমার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম সন্দেহ নেই, তবে তাঁর মৃত্যু আমার কাম্য ছিল না।

এবার দুর্ঘটনার দিনের কথায় আসা যাক। আপনার সঙ্গে সুনীলাদেবীর শেষ কখন দেখা হয় ?

দিন পনের তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। এক বাড়িতে বাস করলেও পৃথক অন্ন। তিনি আমাদের ধারে আসতেন না। অশান্তি হবার সম্ভাবনা থাকায় আমরাও ওধারে যেতাম না।

সেদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনার অ্যাক্টিভিটি কি ছিল বলুন তো ?

আপনি কি আমায় সন্দেহ করছেন ?

অবান্তর প্রশ্ন। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

এগারটার সময় আমি নিজেদের অফিসে গিয়েছিলাম। দুটোর সময় সেলিং কাউন্টারে এসে বসি। পাঁচটা পর্যন্ত দোকানেই ছিলাম। তারপর বাড়ি ফিরে এসে জলযোগ সেরে রেডিও শুনছিলাম। বৌমার মৃত্যু-সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমি ও আমার স্ত্রী ছিলাম ড্রইংরুমে।

আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করব না। নবেন্দুবাবুকে গিয়ে পাঠিয়ে দিন –

মৃন্ময় দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নবেন্দু ঘরে প্রবেশ করলেন তারপর।

বসুন। গোটা কয়েক প্রশ্ন আছে।

ত্রস্ত গলায় নবেন্দু বলল, বিশ্বাস করুন, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।

ব্যস্ত হবেন না। আমার প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দিন—

বলুন ?

দুর্ঘটনার দিন দুপুরবেলা থেকে সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন ?

সকাল দশটা থেকে একটা পর্যন্ত আমি দোকানে ছিলাম। তারপর বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বেরিয়েছিলাম। পাঁচটার সময় আবার ফিরে যাই। ন'টা পর্যন্ত ওখানেই ছিলাম।

দুপুরে কোথায় বেরিয়েছিলেন ?

নবেন্দু ইতস্তত করতে লাগলেন।

হেজিটেড করবেন না। বলুন ?

আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আস্তানায় উপস্থিত না থাকায় দেখা হল না।

কে সেই ভদ্রলোক ?

নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার ইন্সপেক্টর। এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করবেন না।

ইন্সপেক্টর এবার সুনীলাকে নিয়ে কিরকম পারিবারিক অশান্তি হচ্ছিল সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে নিলেন। সকলে অশান্তিকে এড়াতে চাইলেও, সুনীলাই যে বারংবার অশান্তিকে ডেকে আনত, তাও তাঁর জানা হয়ে গেল।

নবেন্দুকে আর আটকালেন না ইন্সপেক্টর। অবশ্য বলে দিলেন মানসকে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

গম্ভীর মুখে মানস ঘরে প্রবেশ করল। ইন্সপেক্টরের ব্যবহার তার কাছে জুলুম বলে মনে হচ্ছিল।

আপনার মনের অবস্থা ভাল নয় আপনি বিলক্ষণ বিরক্ত বোধ করছেন বুঝতে পারছি। ইন্সপেক্টর বললেন. কিন্তু আমি উপায়হীন। তদন্ত আমাকে চালিয়ে যেতেই হবে।

বলুন, কি জানতে চান ?

সেদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন ?

মানস বলল, শিশিরের কাছে।

হু। কাকে হত্যাকারী বলে আপনার সন্দেহ হয় ?

কাকে হবে বলুন ? আমি তো মনে করেছিলাম সুনীলা আত্মহত্যা করেছে। তার যা মানসিক গঠন ছিল, তাতে এ ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আপনি বলছেন সে খুন হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, এই কথা শোনার পর দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে আপনি বুঝবেন, আমি ভুল কথা বলিনি। নিঃসন্দেহে এটা একটা প্রিপ্ল্যান্ড মার্ডার। অকারণে কেউ কাউকে খুন করে না। আর এ-কথাও ঠিক, বাইরের কোন লোক আপনার স্ত্রীকে খুন করতে আসবে না—

আপনি বলতে চান বাড়ির কেউ তাকে খুন করেছে ?

এই সম্ভাবনাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি ?

আপনি কি আমায় সন্দেহ করছেন ?

ইন্সপেক্টর নিজে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে মানসের দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে ধরলেন।

ধন্যবাদ। সিগারেটের দরকার নেই। আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি, এই কি আপনার বিশ্বাস ?

ইন্সপেক্টর সিগারেট ধরিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, দুটো বিষয় আপনাকে একটু ডাইরেক্ট করে দিচ্ছে না কি ? এক : আপনার স্ত্রী আপনার জীবনে চরম অশান্তি রূপে বিরাজ করছিলেন। দুই : তাঁর অবর্তমানে প্রচুর অর্থের অধিকারি হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে।

বিশ্বাস করুন, আমি—

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কোন মূল্য এখানে নেই মিস্টার সুর। সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে আরো তদন্তের উপর। এরপর আছে আদালত। সেখানে নিজেকে ডিফেণ্ড করবার সুযোগ অবশ্য পাবেন। যাই হোক আমি আবার আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই, পুলিসের অনুমতি ছাড়া বেনারসের বাইরে পা দিলে পরিস্থিতি শোচনীয় ভাবে আপনার বিপক্ষে যাবে। এখন যেতে পারেন। বদ্রীকে পাঠিয়ে

দেবেন।

মানস দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বদ্রী কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকল।

আমি কিছু জানি না হুজুর—

তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। আমার প্রশ্নের ঠিক-ঠিক উত্তর দিয়ে যাও। নইলে—

বলুন হুজুর!

সুনীলাদেবীর সঙ্গে শেষ তোমার কখন দেখা হয়?

দুপুরবেলা। আমি ডাকের চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

তখন তিনি কি করছিলেন?

টেলিফোন করছিলেন হুজুর।

তারপর?

আমি চিঠি দিয়ে চলে এলাম। উনি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তাঁর কাছে কেউ এসেছিল পরে?

না হুজুর। তবে—

থামলে কেন, বল?

ঘরের ভেতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ পেয়েছিলাম।

সুনীলাদেবী কার সঙ্গে কথা বলছিলেন, বুঝতে পেরেছিলে?

আজ্ঞে না। চাপা গলায় কথাবার্তা হচ্ছিল।

তখন সময় কত?

ঘড়ি দেখিনি হুজুর, তবে বেলা তিনটে হবে।

চিন্তিত ইন্সপেক্টর বদ্রীকে যেতে বললেন। এখান থেকে বিদায় নেবার আগে অবশ্য শিশিরের সঙ্গে কথা বলে নিতে ভুললেন না। মানসের স্টেটমেন্ট ঠিক কিনা, তা ভেরিফাই করে নেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

ঘণ্টাখানেক হল ইন্সপেক্টর চলে গেছেন। বর্তমানে যে ঘর ব্যবহার করছে, সেই ঘরে গম্ভীর মুখে মানস বসে আছে। শিশির নির্বাক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে একধারে। অন্য ঘরে তখন মৃন্ময়ের সঙ্গে কিংকর কথা বলছেন। মৃতদেহ সংকার করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি কলকাতা ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেস যখন আত্মহত্যার নয়, তখন মৃতদেহ সংকারের জন্য পাওয়া এখন সুদূরপরাহত। পুলিস তাঁকে আরো কয়েকদিন থেকে যেতে বলছে। তিনিও দেখে যেতে চান তাঁর কন্যাকে এই ভাবে হত্যা করেছে কে!

শিশির বলল, এত ভাবতে থাকলে তো শরীর খারাপ হয়ে পড়বে।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল মানস।

ইন্সপেক্টরের কথাবার্তা আমাকে আরো চিন্তিত করে তুলেছে।

আমিও ভেবে দেখলাম, তিনি ঠিকই বলেছেন। পরিস্থিতি যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, এটা আত্মহত্যা নয়—হত্যা।

খুনের কথাটা প্রথমে মনে না ওঠাই স্বাভাবিক। তাই মনে হচ্ছিল আত্মহত্যা। ইন্সপেক্টরের কথায় আমিও বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করেছি। আর সন্দেহ নেই, সুনীলাকে কেউ খুনই করেছে। আমি অতিমাত্রায় চিন্তিত হয়ে পড়েছি কেন জান? ইন্সপেক্টর আমাকে সন্দেহ করছেন। তাঁর ধারণা, টাকার লোভে আমি সুনীলাকে খুন করেছি।

বল কি!

তিনি যে রকম ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন তাতে মনে হল আমাকে শীগগিরই গ্রেপ্তার করবেন।

খুবই ভয়ের কথা হল। একবার পুলিসের হাতে পড়লে রেহাই পাওয়া শক্ত হবে। নিজেকে বাঁচাবার পথ এখন থেকে তৈরি না রাখলে—

কোন পথই তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।

একটা পথ আমি দেখতে পেয়েছি। তবে তার আগে জানা দরকার, তুমি হত্যাকারীকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেতে চাও কিনা।

তুমি বিচিত্র কথা বলছ শিশির। হত্যাকারী ধরা না পড়লে আমার ফাঁসি অনিবার্য, বুঝতে পারছ না?

বেশ। তাহলে এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে, বাসববাবুর শরণাপন্ন হওয়া।

বাসববাবু কে?

বাসব ব্যানার্জী। বিখ্যাত গোয়েন্দা—যিনি আজ পর্যন্ত কেস হাতে নিয়ে ফেল করেননি। তাঁকে দিয়ে এনকোয়ারি করালে হত্যাকারী নিশ্চয় ধরা পড়বে।

কিন্তু তাঁকে পাচ্ছি কোথায়? তিনি তো আর এখানে থাকেন না। তাঁর ঠিকানাও আমার জানা নেই।

আমার জানা আছে। লয়ালপুরের আদিত্য রায় মার্ডার কেসটায় উনি এসেছিলেন। আমি ঠিকানা জেনে নিয়েছিলাম তখন। এখুনি তাঁকে ট্রাঙ্ককল বুক করা যেতে পারে। তিনি যদি রাজি হয়ে যান, বুঝবে ভয়ের আর কিছু নেই।

আর কোন উপায় তো নেই। বাবাকে একবার জিজ্ঞেস করে নিলে হত। থাক্—তুমি ট্রাঙ্ককল বুক করে দাও।

সৌভাগ্য বলতে হবে, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে কানেকশন পাওয়া গেল। শিশির যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলল বাসবকে। বাসব স্পষ্টবক্তা—সম্মতি দেবার পর, তার ফি কত, সে কথাও জানিয়ে দিল। এ-পক্ষ রাজি। বাসব এ-কথাও জানাল, এখন সাড়ে আটটা—জনতা এক্সপ্রেস হাওড়া ছাড়তে এখনও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বাকি, ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ে জনতাতেই যাত্রা করছে। মোগলসরাইয়ে ট্রেন বদলে বেনারসে পৌঁছবে।

বাসব এসে উঠল বেনারস লজে।

শৈবাল আসতে চায়নি, তাকে একরকম ধরে-বেঁধে নিয়ে এসেছে। মানস ও

শিশির হোটেলে ওর সঙ্গে দেখা করল। বাসব বিস্তারিতভাবে ঘটনাটা শুনল ওদের মুখ থেকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, আমি থানায় যাচ্ছি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে। ওখান থেকে ফিরে আপনাদের ওখানে যাব। এস ডাক্তার।

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। রিক্সায় কোতোয়ালীতে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগল না। বেসরকারীভাবে যে তদন্ত করা হবে, এ বিষয়ে আগেই পুলিসের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে রেখেছিল মানস। চিনয় অফিসেই ছিলেন।

বাসব নিজের পরিচয় দিল। তবে ইন্সপেক্টর ওকে কিভাবে গ্রহণ করলেন, বুঝতে পারা গেল না। মৌখিক ভদ্রতায় অবশ্য কার্পণ্য প্রকাশ করলেন না। তিনি এ-কথাও জানালেন, তিনি বাসবের সঙ্গে কাজ করতে পারার সুযোগ পেয়ে সবিশেষ আনন্দিত।

বাসব বলল, আপনার সাহায্য না পেলে আমার পক্ষেও কিছু করা সম্ভব হবে না। ঘটনাটা মোটামুটি শুনেছি। অসুবিধা না হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্টেটমেণ্টগুলো যদি একবার দেখান, তাহলে ভাল হয়।

অসুবিধা কিসের ? দেখুন না—

ইন্সপেক্টর ড্রয়ার থেকে একটা বাঁধান খাতা বার করে এগিয়ে দিলেন।

বাসব একাগ্র মনে পড়ল। তারপর পোস্টমর্টমের রিপোর্ট দেখল। রিপোর্টে বলা হয়েছে, মৃত্যুর কারণ পটাসিয়াম সায়ানাইড। এত বেশি মাত্রায় সায়ানাইড ব্যবহার করা হয়েছিল যে, জীভের উপর পুরু স্তর পড়ে গেছে। কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। নিশ্চিতভাবে বলা চলে, সামান্যতম বলপ্রয়োগও করা হয়নি। ইন্সপেক্টর যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তাও বললেন। মানসের ওপর তাঁর সন্দেহ কেন হয়েছে, এ-কথাও বলতে ভুললেন না।

বাসব পাইপ ধরিয়ে মিনিট তিনেক প্রায় চুপ করে রইল। গভীরভাবে কিছু চিন্তা করল বোধহয়। বলল তারপর, খুন কে করেছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার আগে, খুন কিভাবে হয়েছে তা আমাদের জানা দরকার। এই পন্থায় এগোলে আমরা সমস্ত দ্বিধাকে পরিহার করতে পারব।

একটু অধৈর্য গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, থিওরিটিক্যাল বিষয়কে আমরা তেমন প্রশ্রয় দিই না। প্র্যাকটিক্যাল দিকটার উপরই আমাদের জোর দিতে হয়। মানসবাবুর সুযোগ-সুবিধা সবচেয়ে বেশি, নিঃসন্দেহে তিনিই সুনীলাদেবীকে খুন করেছেন।

কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে বলে আপনার ধারণা ?

মানসবাবু শোবার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দেন। এতে সুনীলাদেবীর বাধা দেবার কিছু ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর একান্ত অবকাশ বন্ধ দরজার মধ্যেই অতিবাহিত হওয়া স্বাভাবিক। তারপর মানসবাবু কাজ সেরে মেথর যাওয়া-আসা করার দরজা খুলে, স্পাইরেল দিয়ে নেমে চম্পট দেন।

আপনার এই যুক্তি কোর্ট কিন্তু মেনে নেবে না।

কেন ?

মানসবাবুর অ্যালিবাইয়ে আপনি চিড় খাওয়াতে পাচ্ছেন না। তিনি সমস্ত দুপুরে যে বাইরে বাইরে ছিলেন, এবং সন্ধ্যায় যে দোকানে ছিলেন, সাক্ষীরা তা প্রমাণ করবেন। তাছাড়া বদ্রীও তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখেনি। এরপর আরো একটা প্রশ্ন আছে, সায়ানাইড কিভাবে খাওয়ান হল? জোর করে যে খাওয়ান হয়নি, তার প্রমাণ পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। সুনীলাদেবীর সঙ্গে মানসবাবুর সম্পর্ক ভাল ছিল না। ভুলিয়ে-ভালিয়েও তাঁর পক্ষে স্ত্রীকে সায়ানাইড খাওয়ান কি সম্ভব?

চা এসে পড়ল।

ভ্রূ কুঁচকে টেবিলের ওপর পেপারওয়েট ঠুকতে লাগলেন ইন্সপেক্টর।

ভাইটাল ইস্যুটা কি জানেন? কিভাবে সায়ানাইড সুনীলাদেবীর মুখে গেল। এ'বিষয়ে জানতে পারলেই রহস্য অনেক পরিষ্কার হয়ে যাবে।

একটা বিষয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছেন মিস্টার ব্যানার্জী। ঘরের মধ্যে আরেকজন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বদ্রী কথাবার্তা বলতে শুনেছে, আমার মনে আছে এ-কথা। এমন হওয়া কি সম্ভব নয়, কেউ মেথর যাওয়া-আসা করার পথ দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল, এবং ওই পথ'দিয়েই বেরিয়ে গেছে?

দরজাটা সব সময় বন্ধ থাকে ভেতর থেকে, এ-কথা আমি শুনেছি। আগন্তুক ঢুকবে কিভাবে?

এমনও তো হতে পারে, ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে সে দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল। সুনীলা খুলে দেন। সে যে প্রয়োজনে এসেছিল, তা সেরে নিয়েই বেরিয়ে যায়।

আপনি অতিমাত্রায় কল্পনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

পাইপ নিভে গিয়েছিল। এক চুমুকে পেয়ালার অর্ধেক চা শেষ করল বাসব। পাইপ আবার ধরিয়ে নিয়ে বলল, ডাক্তার চা খাও। কি বলছিলেন ইন্সপেক্টর, কল্পনা? যে কোন তদন্তের কাঠামো আমি প্রথমে এইভাবে গড়ে তুলি। আপনি নিশ্চয় জানেন, আজ পর্যন্ত কোন তদন্তে আমি অকৃতকার্য হইনি। যাক এবার আপনাকে একটু কষ্ট দেব।

বলুন?

মিস্টার সুরের বাড়ি একবার যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। সুনীলাদেবী যে ঘরে হত হয়েছেন, সেই ঘরখানা একবার দেখতে চাই।

বেশ তো, চলুন।

পুলিসের জীপেই তিনজন রওনা হয়ে গেলেন। ওখানে পৌঁছবার পর মানসের সঙ্গে দেখা হল। মৃন্ময়বাবু বাড়িতে ছিলেন না। ইন্সপেক্টর দোতলায় নিয়ে চললেন সকলকে। সুনীলার ঘরের সামনে একজন কনস্টেবল মোতায়েন করা ছিল।

সীল ভেঙ্গে, তালা খুলে সকলকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে হল। এই জনবহুল শহরে

এমন নিঃশব্দ আর বুঝি কোথাও নেই। বাসব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চারধারে তাকাতে লাগল।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আমি একলা ঘরখানা পরীক্ষা করতে পারি?

একটু চুপ করে থেকে ইন্সপেক্টর বললেন, আপত্তি নেই।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শৈবাল ও মানস তাঁকে অনুসরণ করল।

বাসব দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যেখানে মৃতদেহ পড়েছিল, সেই দিকে এগিয়ে গেল। ইন্সপেক্টর জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কুঁজো ও গ্লাস ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। বাসব ঝুঁকে কুঁজো পরীক্ষা করল—জল রয়েছে। ঝোঁকা অবস্থাতেই হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল খাটের তলায়।

মোড়া অবস্থায় সাদা একটা কাগজের টুকরো পড়ে রয়েছে। বাসব হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে কাগজের টুকরো বার করে আনল। ইঞ্চি তিনেক লম্বা, চওড়ায় ইঞ্চি দুয়েক হবে। ডাক্তারখানায় পাউডার মেডিসিন যাতে মুড়ে দেয়, দেখলে অনেকটা সে রকম মনে হয়।

বাসব একবার কাগজটা নাকের কাছে নিয়ে গেল, তারপর রেখে দিল পকেটে। ঘরে আসবাবের মধ্যে ছিল খাট, ড্রেসিং টেবিল, স্টিল আলমারি, আলনা, রাইটিং টেবিল ও চেয়ার। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বাসব।

সুদৃশ্য দামী ড্রেসিং টেবিল। ঝকঝক করছে আয়না। একধারে দুটো ড্রয়ার। অন্যধারে একটা। উপরের ড্রয়ারটা টেনে খুলল। টুকিটাকি মেয়েলি জিনিস। দ্বিতীয়টায় রয়েছে, রাইটিং প্যাড, পার্কার ফিফটিওয়ান ও দুটো চেকবই। চেকবই দুটো তুলে নিল বাসব।

একটা বেনারসের, আরেকটা কলকাতার। চেকবই দুটো উল্টে পাল্টে দেখল। কবে কত টাকা ড্র করা হয়েছে, লেখা রয়েছে। একটা জায়গায় দৃষ্টি আটকাল বাসবের। চেক কাটা হয়েছে, অথচ ফয়েলে টাকার অঙ্ক লেখা হয়নি। আরেক-খানায় ওই একই ব্যাপার হয়েছে। বাসব ফয়েলের নাম্বার দুটো টুকে নিল। বেনারসের একাউন্টে যে সমস্ত চেক কাটা হয়েছে, তার অধিকাংশই নিখিল সেনের নামে।

ড্রয়ার বন্ধ করে দিয়ে বাসব বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল। বাথরুমে প্রবেশ করে ওধারের দরজা খুলল। পাকে পাকে স্পাইরেলের সিঁড়ি নেমে গেছে বাগানের মধ্যে। ফুলবাগান নয়, আম, কাঁঠাল, ও ডুমুর গাছের সমারোহ, ; ঝোপঝাড়ও আছে। গাছের ছায়ায় জায়গাটা কেমন অন্ধকার। আবছাভাবে বাউন্ডারি ওয়াল দেখা যাচ্ছে।

বাসব দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

ঘরের কাজ মোটামুটি শেষ হয়েছিল। শুধু স্টিল আলমারিটা একবার খুলে দেখা দরকার। বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল। শৈবাল ও মানস চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল।

ইন্সপেক্টর সাহেব কোথায় গেলেন ?

উনি নিচে গেছেন। মানস বলল, বাবার সঙ্গে কথা বলছেন।

মৃন্ময়বাবু ফিরে এসেছেন। আপনার স্ত্রীর চাবির থোকাটা কোথায় ?

চাবির রিঙ ও কোমরে আটকে রাখত। বডির সঙ্গে ওটা চলে গেছে। এখন পুলিসের কাছে আছে বোধহয়।

স্টিল আলমারিটা যে একবার খোলা দরকার।

আলমারির ডুপ্লিকেট চাবি অবশ্য আমার কাছে আছে। তবে

বলুন ?

পুলিসের অনুমতি না নিয়ে আলমারি খোলা কি ঠিক হবে ?

আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। সে দায়িত্ব আমার। আসুন।

তিনজনে ঘরের মধ্যে এল আবার।

ট্রাউজারের হিপ পকেট থেকে কী-কেস বার করে আলমারি খুলল মানস।

প্রথম তাকে নিত্য-ব্যবহার্য অনেক কিছু রয়েছে। পরের চারটে তাকে কাপড়-জামা ঠাসা।

দেখুন তো, কিছু হারিয়েছে ?

সমস্ত ঠিকই আছে মনে হচ্ছে।

ওই ড্রয়ারের মধ্যে কি আছে ?

দ্বিতীয় তাকের তলায় ড্রয়ার লাগান ছিল।

গয়না আছে।

আপনার স্ত্রী সমস্ত গয়না এখানেই রাখতেন ?

না। অধিকাংশ ব্যাঙ্কেই আছে। কিছু গয়না সুনীলা এর মধ্যে রাখত।

বাসব ড্রয়ার খুলে দেখল, দশ বারটা রেক্সিনে মোড়া বাক্স রয়েছে। সুদৃশ্য গয়নার বাক্স যেমন হয় আর কি। একটা বাক্স তুলে নিয়ে খুলল—খালি। তাতে মানতাসা থাকার কথা।

সবিস্ময়ে মানস বলল, একি ! খালি কেন ?

তাই তো দেখছি—

বাসব আরেকটা বাক্স তুলে নিল। সেটাও খালি।

সবগুলো পরীক্ষা করে দেখা হ'ল। সব খালি।

গয়নাগুলো চুরি গেছে, কি বলেন মিস্টার সুর ?

তাই তো দেখছি ! আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি মিস্টার ব্যানার্জী।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শুধু খুন নয়, চুরিও হয়েছে। শুনুন, একথা এখন কাউকে বলবেন না।

বাসব গয়নার একটা খালি বাক্স বার করে নিয়ে, নিজের রুমাল দিয়ে জড়াতে জড়াতে বলল, এই বাক্সটা আমার কাছে থাক। এবার আপনি আলমারি বন্ধ করতে পারেন—

মানস আলমারি বন্ধ করল।

আলমারির কাছ থেকে সরে এসে উত্তেজিত গলায় বলল, যা চুরি গেছে, তার দাম যে অনেক।

যা চুরি গেছে, তা যাতে ফিরে পান, সে চেষ্টা আমি করব। এখন যে প্রশ্নগুলো করি, তার ঠিক ঠিক উত্তর দিন।

আমি যা জানি পুলিসকে বলেছি।

আপনার স্টেটমেন্ট আমি পড়েছি। যা বলেছেন তা নতুন করে জানবার দরকার আমার নেই। নিখিল সেন নামে কাউকে চেনেন?

না।

ভাল করে ভেবে দেখুন—

ও নামের কাউকে আমি চিনি না।

ড্রয়ারের মধ্যে আপনার স্ত্রীর দুটো চেকবই দেখলাম। নিখিল সেনের নামে তিনি অনেক চেক কেটেছিলেন।

এ বিষয়ে আমি আপনাকে কিছুই বলতে পারছি না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।

কিছু মনে করবেন না, সুনীলাদেবীর চরিত্র সম্পর্কে আমার কিঞ্চিৎ আগ্রহ রয়েছে—

একটু চুপ করে থেকে মানস বলল, সুনীলা অত্যন্ত বদমেজাজী, মুখরা ও অধৈর্য ছিল, কিন্তু তার নৈতিক চরিত্র নির্মল ছিল বলেই জানি।

বাসব এবার জেনে নিল কি কি যৌতুক পেয়েছিল মানস।

তবে শ্বশুরমশাই সমস্তই তার মেয়ের নামেই দিয়েছেন।

দুটো একাউণ্ট করার অর্থটা কি?

নগদ যে একলক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছিল, সুনীলা সেই টাকাটা কলকাতার ব্যাঙ্কে রেখেছিল। মাসে মাসে মোটা টাকা বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। সেই টাকাটা এখানকার ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছিল।

হুঁ চলুন এবার নিচে যাওয়া যাক

নিচে নেমে এল তিনজনে।

ইন্সপেক্টর ও মৃন্ময়বাবু চুপচাপ বসেছিলেন।

বাসব বলল, আমার কাজ শেষ হয়েছে ইন্সপেক্টর। আপনি ঘর বন্ধ করে দিতে পারেন। একটা কাজ করতে হবে। ঘরে ঢোকার দরজার ভেতর দিকে এবং মেথরের দরজার ভেতর ও বাইরের দিকে কিছু হাতের ছাপ পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। ওগুলো প্রিণ্ট করিয়ে নেবেন, আমার বিশেষ দরকার।

বেশ।

ইন্সপেক্টর ওপরে চলে গেলেন।

মানসবাবু, এবার আপনি যেতে পারেন। মৃন্ময়বাবুর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

মানস চলে যাবার পর বাসব বলল, পুলিস যে সমস্ত প্রশ্ন আপনাকে করেছিল

তার পুনরুক্তি আমি করতে চাই না। আমি গোটা কয়েক নতুন প্রশ্নের অবতারণা করব। নিখিল সেন বলে কাউকে চেনেন?

মৃন্ময় ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

আপনার হেজিটেশন আমার তদন্তে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে মিস্টার সুর। ঠিক ঠিক উত্তর দিন। আপনি নিশ্চয় চান হত্যাকারী ধরা পড়ুক?

পুলিস আমাকে সন্দেহ করছে। হত্যাকারীকে ধরা পড়তেই হবে। যে প্রশ্ন করলেন, তার সঠিক উত্তর আমার শালা নবেন্দু আপনাকে দিতে পারবে। আমি তার মুখ থেকে যা কিছু জানবার জেনেছি।

কে সুনীলাদেবীকে খুন করতে পারে বলে আপনার ধারণা?

আমার কোন ধারণাই নেই। আমি তো ভেবেছিলাম বৌমা আত্মহত্যা করেছেন। পুলিস বলছে তিনি খুন হয়েছেন। আমার চিন্তা-ভাবনা সমস্ত গুলিয়ে গেছে।

হুঁ। নবেন্দুবাবু বোধহয় বাড়িতেই আছেন? তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন

মৃন্ময় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বাসব পাউচ থেকে মিক্সচার নিয়ে পাইপে ভরতে ভরতে বলল, চোখ-কান খুলে রেখেছ তো ডাক্তার?

শৈবাল মৃদু হেসে বলল, খুলে রেখেও তো কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না। তুমি কিছু বুঝতে পারলে?

অনেক কিছু আঁচ করেছি। হেলায় নিষ্পত্তি করে দেবার মত কেস নয়। মাথা খাটাতে হবে।

নবেন্দু ঘরে এলেন।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য আপনার অজানা থাকবার কথা নয়। এই পরিবারের সম্মান রাখতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। অবশ্য আপনাদের সহযোগিতা না পেলে কিছুই হবে না। নিখিল সেন সম্পর্কে যা জানেন আমায় বলুন

ধীর গলায় নবেন্দু বললেন, সে এক বিশ্রী ব্যাপার—

আমার জানা দরকার। বলুন।

তিনি বরুণাব্রীজের কাছে সুনীলা ও নিখিলকে দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করতে দেখেছেন থেকে আরম্ভ করে, একদিন নিখিলকে ফলো করে তার নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করা পর্যন্ত সব বলে গেলেন।

শেষে বললেন, বাড়ির বৌ-এর কেচ্ছা নিয়ে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে না।

স্বাভাবিক। নিখিল সেন সম্পর্কে আর কি জানেন?

বিশেষ কিছুই জানি না, লোকটা বেনারসের বাইরে থেকে এসেছে, এইটুকুই শুনেছি।

ঠিকানাটা আমায় লিখে দিন তো—

নবেন্দু একটা শ্লিপ পেপারে ঠিকানাটা লিখে দিলেন।

আচ্ছা নবেন্দুবাবু, পুলিসের প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছিলেন, দুর্ঘটনার দিন দুপুরে কোথায় ছিলেন বলতে চান না ব্যক্তিগত কারণে। আমাকে বলবেন কি ?

পুলিসকে বলতে চাইনি, কারণ বৌমার কেচ্ছা-কাহিনী তাহলে প্রকাশ হয়ে পড়ত। আপনি নিশ্চয় অনুমান করেছেন, এই সমস্ত ব্যাপারে আমি ও জামাইবাবু খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। সেদিন দুপুরে জামাইবাবুর কথাতেই নিখিল সেনের বাসায় গিয়েছিলাম। আসলে সে কি চায় জানতে। কেন বৌমার পিছনে লেগে রয়েছে। তাকে ভয় দেখাবার ইচ্ছেও ছিল।

তারপর।

তার সঙ্গে দেখা হল না। সে বাসায় ছিল না।

মানসবাবু এ সমস্ত কথা জানেন ?

না, সে কিছুই জানে না। হত্যাকারীকে ধরতেই হবে মিস্টার ব্যানার্জী। নইলে আমাদের মানস—

কথাটা শেষ করলেন না তিনি।

চেষ্টা তো করে যাচ্ছি। এখন আমি উঠলাম। ইন্সপেক্টর বোধহয় এখন উপরেই আছেন। তাঁকে বলবেন আমরা হোটেলে ফিরে গেছি। এসো ডাক্তার

ওরা ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

বেনারস লজে ফিরে রিসেপনস কাউন্টারের কাছে এগিয়ে গেল বাসব। ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে এক সময় ও জেনে নিয়েছিল, কিঙ্কর এই হোটেলে এসে উঠেছেন।

কাউন্টার-ক্লার্ক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

কিঙ্কর নাগচৌধুরী কত নম্বর ঘরে আছেন বলতে পারেন ?

ঊনিশ নম্বর।

ধন্যবাদ।

ঊনিশ নম্বর ঘরের দরজায় নক করতেই খুলে গেল। কিঙ্কর নিজেই দরজা খুললেন। মৌন জিজ্ঞাসায় তাকালেন আগন্তুকদের দিকে। বাসব নিজের পরিচয় দিল।

কি সৌভাগ্য। আসুন, আসুন—

ওরা ঘরে প্রবেশ করল।

আপনি তদন্ত করতে এসেছেন সংবাদ পেয়েছি। নীলা আর ফিরে আসবে না। তবে তার হত্যাকারী চোখের আড়ালে থাক, এ আমি কখনোই চাই না।

তদন্ত ভালভাবেই এগোচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হয়ত আমি সাফল্য লাভ করব। আমি হোটেলেই উঠেছি। গোটা কয়েক কথা আপনার কাছ থেকে জেনে নেবার জন্য এলাম। আপনার মনের অবস্থা এখন ভাল না থাকারই কথা। এই ভাবে বিরক্ত করার জন্যে....

আপনি সংকোচ করবেন না। কি জানতে চান বলুন?

আপনার মেয়ের মানসিক অবস্থা কি খুবই শোচনীয় ছিল?

হ্যাঁ। অথচ দেখুন, এরকম হবার কোন কারণ নেই। দেখেশুনে তার ভাল ঘরেই বিয়ে দিয়েছিলাম। যৌতুকও দিয়েছিলাম প্রচুর।

উনি বোধহয় মানসবাবুর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছিলেন না।

ক্ষুব্ধ স্বরে কিংকর বললেন নীলার উপর অবিচার করবেন না মিস্টার ব্যানার্জী। তাকে এদের বাড়ির কেউ ভাল চোখে দেখেনি। দিনের পর দিন অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছে। বিয়ের পরই সে আমার কাছে ফিরে যেতে চেয়েছিল। এই ব্যবস্থা কোন বিবাহিত মেয়ের পক্ষে সম্মানজনক নয় বলে আমি তাকে শ্বশুরবাড়িতেই থেকে যেতে বলেছিলাম।

আপনার সঙ্গে তাঁর শেষ কবে দেখা হয়?

বছর দুয়েক আগে।

পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল নিশ্চয়?

চিঠি সে আমাকে নিয়মিত দিত। আমিও উত্তর দিতাম। মাসে বার দুই ট্রাংককলে কথা বলত। নইলে এখানকার কথা এত নিখুঁত ভাবে আমি জানতে পারব কি করে? আপনি শুনলে হতবাক হবেন অবশ্য এই কথার সত্যতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।

কথাটা কি?

নীলা লিখেছিল তাকে নাকি শ্লো-পয়জন করা হয়েছে। এরকম কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। আমিও করিনি। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম। মানসকেও লিখেছিলাম, যদি নীলার শরীর খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে যেন ভালভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করান হয়।

হুঁ। নিখিল সেন নামে কাউকে আপনি চেনেন?

নিখিল! ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ...তার নাম আপনি জানলেন কিভাবে?

চেনেন তাহলে?

সে ছোকরা নীলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। চালচুলো নেই, আমি হাঁকিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি তাকে চিনলেন কিভাবে?

ঠিক চিনি না। নাম শুনেছি। নিখিল সেনকে আপনার মেয়ে নিয়মিত টাকা দিতেন—

কিংকর অবাক হয়ে যান।

বলেন কি!!

অনুসন্ধান করে সেই সংবাদই তো পেলাম। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। এখন চলি। ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার আবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে।

বেশ তো।

ওরা বিদায় নিল।

নৈশ আহার শেষ হয়েছে ঘণ্টাখানেক আগেই।

শেবাল একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। বাসব পায়চারি করে বেড়াচ্ছে ঘরময়। তার মুখ চিন্তাচ্ছন্ন। কেসটার সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাবছে সন্দেহ নেই। বাসবের এই ভাবের সঙ্গে শেবালের পরিচয় দীর্ঘ দিনের।

আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল।

ডাক্তার

বল ?

তোমার সঙ্গে কোন বিবাহিতা মেয়ের পরিচয় আছে ? সে কি তোমায় অনবরত টাকা দিয়ে যাবে ?

বিশেষ ক্ষেত্রে দেবে বৈকি।

যেমন ?

মেয়েটির সঙ্গে কুমারী জীবনে আমার অন্তরঙ্গতা ছিল। এমন বহু কথা আমার জানা আছে, যা মেয়েটির বিবাহিত-জীবনকে দারুণ অশান্তিময় করে তুলতে পারে। আমি ভয় দেখিয়ে টাকাটা আদায় করতে আরম্ভ করলাম। অর্থাৎ সাদা কথায় যাকে ব্ল্যাকমেল বলে। কিম্বা আমার অবস্থা এত খারাপ যে মেয়েটি আমাকে দয়া করে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। যাকে প্রাক্তন প্রেমিকার উপর উদারতা বলে আর কি।

কিন্তু ডাক্তার, এখানে দেখা যাচ্ছে সুনীলার ছিল একটা 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব। বিবাহিত-জীবনে শান্তি সে চায়নি। সুতরাং ব্ল্যাকমেলের প্রশ্নকে আমাদের বাতিল করতে হবে। তোমার দু-নম্বর থিওরিটা ভেবে দেখার মত।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তায় লোক চলাচল এখন অল্প। বেনারস ক্রমেই ঝিমিয়ে আসছে।

আরো গোটা কয়েক বিষয় আছে চিন্তা করবার মত। মেথর যাওয়ার পথ দিয়ে কে ঘরে প্রবেশ করেছিল। নিখিল সেন কি ? সেকি মাঝে মাঝেই ওই পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করত ?

নিখিল সেন হত্যাকারী বলে আমার মনে হয় না। যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ছে, তাকে মেরে ফেলে সোনার ডিম হাতে পাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া নিশ্চয় বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ব্রেভো ডাক্তার! তোমার চিন্তার পরিধি ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, সুনীলা আর টাকা দিতে পারবে না জানিয়েছিল নিখিলকে। তার-পরই —। মানুষের মন কখন বিপথগামী হয়, তার কি কোন স্থিরতা আছে ? এবার আসছে দরজা খোলার প্রশ্ন। ধরে নেওয়া যাক, নিখিল হত্যাকারী নয়। মানস ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর সুনীলা খিল দিয়ে বিশ্রাম করছিল। মেথর যাওয়া-আসা করার দরজায় করাঘাত হল। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করনি, বাগানের ওই ধারটা গাছ দিয়ে কি রকম ঢাকা। কেউ স্পাইরেল দিয়ে ওপরে উঠলে কারুর চোখে পড়বার সম্ভাবনা নেই। সুনীলা মনে করল, নিখিল এসেছে। দরজা খুলে দেবার পর বাথরুমে পা দিল অন্যজন।

শৈবাল বাধা দিল বাসবকে : অন্য লোককে দেখে সুনীলার চেঁচিয়ে ওঠাই স্বাভাবিক ছিল !

চেঁচায়নি, কারণ যে প্রবেশ করল, সে তার পরিচিত। এই পথে আসার জন্য সে কিছু বিস্ময় বোধ করে থাকতে পারে। তবুও ভাইটাল পয়েন্টটা তো রয়েই যাচ্ছে। সুনীলার মুখে সায়ানাইড গেল কি ভাবে— যে ক্ষেত্রে জোর-জুলুম একেবারেই করা হয়নি !

এমনও তো হতে পারে, তাকে খেতে বলা হয়েছিল—সে খেয়ে ফেলেছিল। পটাসিয়াম সায়ানাইড বর্ণ-গন্ধ কি রকম—সকলের জানবার কথা নয়।

তুমি বলছ, তাকে ঔষধ বলে খাওয়ান হয়েছে। কিন্তু গোড়ায় গলদ যে রয়ে যাচ্ছে। একজন লোক -হোক সে হাজার পরিচিত, চোরের মত মেথরের যাওয়া-আসার দরজা দিয়ে ঢুকে, এই ঔষধটা খেয়ে নাও বলল—আর সুনীলা নির্বিবাদে তাই খেয়ে নিয়ে মরে কাঠ হয়ে গেল। না ডাক্তার, এত সহজ ব্যাপার নয়। একটা গুরুতর প্যাঁচ আছেই, আমরা ধরতে পারছি না।

তুমি নিখিল সেনের সঙ্গে দেখা করবে না ?

কালই দেখা করব। আর কথা নয়, এবার শুয়ে পড়া যাক। রাত অনেক হয়েছে।

তখন সবে ভোর হয়েছে।

বাসব ধাক্কা দিয়ে শৈবালকে ঘুম থেকে তুলল। বিছানায় উঠে বসল। খোলা জানলার দিকে একবার তাকিয়ে নিল।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, ব্যাপারখানা কি ? এই ভোর রাত্তিরে ঘুম থেকে তুললে ?

বেলা ছ-টাকে ভোর রাত্তির বলা চলে না ডাক্তার। উঠে পড়ো, এখুনি আমাদের বেরতে হবে।

কোথায় ?

যেতে হবে নিখিল সেনের আস্তানায়। এই সময় গেলেই তার সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে।

পনের মিনিটের মধ্যে দুজনে বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে। রিক্সায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগল না।

সেকেলে একতলা বাড়ি। বাসব কড়া নাড়তেই এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন।

এখানে নিখিল সেন থাকেন ?

আমিই। আপনারা— ?

নমস্কার।

বাসব নিজেদের পরিচয় দিয়ে বলল, তদন্ত-সূত্রেই আপনার কাছে আমরা এসেছি।

নিখিল ওদের দুজনকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

সুনীলা মারা গেছে শুনেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কাছে কি তদন্ত করতে আপনারা এলেন বুঝলাম না।

গোটা কয়েক কথা জানবার আছে। আচ্ছা, সুনীলাদেবী খুন হয়েছেন আপনাকে কে বলল ?

চতুর্দিকে এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে, আমিও পাঁচজনের মুখে শুনেছি। আপনাদের জন্য চা আনতে বলি ?

আমরা চা খেয়ে এসেছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনার কাছে যখন এসেছি, তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, সুনীলাদেবী ও আপনার মধ্যেকার প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারটা আমার জানা আছে ?

অনুমান করেছি।

সুনীলাদেবীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও আপনি তাঁর পিছু ছাড়েননি। বেনারস পর্যন্ত ধাওয়া করেছেন—

সংযত ভাষায় কথা বললে ভাল হয়।

বাসব একটুও না দমে বলল, তিনি আপনাকে টাকা দিতেন—

নিখিল সচকিত হল। পরমুহূর্তে নিজের সে-ভাব দমন করে স্বাভাবিক ভাবে বলল, আমার অভাব সে পূরণ করত। আমাদের ভালবাসা ঠিক আগেকার মতই ছিল। দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হত নিয়মিত বরুণাব্রীজের কাছে।

এই ভাবেই কি বাকি জীবন আপনারা কাটিয়ে দেবেন স্থির করেছিলেন ?

ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনি।

দুর্ঘটনার দিন দুপুরবেলা বা সন্ধ্যার মুখে আপনি মেথর যাওয়া-আসার পথ দিয়ে সুনীলাদেবীর ঘরে গিয়েছিলেন কি ?

না।

আমাকে সত্যি কথা বললে কিন্তু আপনারই লাভ হবে।

সত্যি কথা বানানো যায় না। আপনাকে খুশি করতে পারলাম না। পরের শোবার ঘরে ঢোকার মত দুঃসাহস আমার নেই।

আপনি তাহলে কখনো ওখানে যাননি ?

না।

সেদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন ?

এখানেই ছিলাম। সমস্ত দুপুর পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছি। বিকেলে বরুণাব্রীজে গিয়েছিলাম ! সুনীলার আসবার কথা ছিল। প্রায় আটটা পর্যন্ত ওর অপেক্ষায় থাকবার পর বাড়ি চলে আসি। আপনাদের মূল্যবান সময় আমার পিছনে আর নষ্ট করবেন না। তাছাড়া আমারও কিছু ব্যস্ততা আছে।

এই কথার পর আর বসে থাকা চলে না। বাসব ও শৈবাল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। খালি একটা রিক্সা আসতে দেখে উঠে বসল তাতে।

কেমন দেখলে ডাক্তার ?

ঘোড়েল লোক। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল, সত্যি কথা বলা বোধহয় অভ্যাস নেই।

আমাদের কাছে গোটা কয়েক কথা লুকিয়ে গেছে বলেই মনে হল ? অবশ্য সত্য মিথ্যার যাচাই আমি সহজেই করে নিতে পারব।

রিক্সাচালককে গন্তব্যস্থলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

বাসব আবার বলল, সুনীলার চেকবই-এর দুটো ব্ল্যাঙ্ক ফয়েল আমাকে বিশেষ চিন্তিত করে তুলেছে ডাক্তার। কার নামে চেক ইস্যু হয়েছে, অ্যামাউন্ট কত—কিছুই লেখা নেই।

ভুল হয়ে গিয়ে থাকতে পারে—

এ সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই, তা আমি বলতে চাই না। তবে আমার মনে হয় বিশেষ কোন ব্যাপার আছে। চেক কাটলেই কাউন্টার-পার্টে কত টাকার চেক কাটা হল এবং কার নামে কাটা হল লেখা হয়। চেকবই দুটোর দু-জায়গা ছাড়া আর সব জায়গায় সেই ভাবে লেখা আছে।

ভাল কথা, তুমি তো সেই গয়নার বাক্সর ওপর থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তুললে না?

হোটেলে ফিরেই তুলব। শুধু গয়নার বাক্সর ওপর থেকে নয়, আরো একটা কাগজের টুকরো আছে, তার উপর থেকেও তুলতে হবে।

রিক্সা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল।

বেলা চারটের সময় ইন্সপেক্টর এলেন।

তাঁর হাতে দরজার ওপর থেকে তোলা ফিঙ্গারপ্রিন্টের কপি। কোন্‌টা, ভেতরের দরজার, আর কোন্‌টা মেথর যাওয়া-আসা করার দরজা, তা লেবেল দিয়ে আলাদা করা আছে।

নিন মশাই, আপনার কথামতই কাজ হয়েছে।

ধন্যবাদ।

কাজ কি রকম এগলো? আমরা তো মানসবাবুকে বাইরে রাখা আর যুক্তিযুক্ত মনে করছি না।

আর দিন চারেক সময় আমাকে দিন। ইতিমধ্যে একবার কলকাতা ঘুরে আসতে চাই। আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, মানসবাবু বুদ্ধিমান লোক পালিয়ে নিজের আখের নষ্ট করবেন না।

ইন্সপেক্টর বিস্মিত হলেন: আপনি কলকাতা যাবেন!

শৈবালও কম অবাক হয়নি।

হ্যাঁ। আজ রাত্রে কলকাতা যাবার কি গাড়ি আছে বলুন তো?

বেনারস এক্সপ্রেসে যেতে পারেন। বেলা আড়াইটের সময় বোধহয় কলকাতা পৌঁছয়।

অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। আর কোন ট্রেন নেই? এই ধরুন, বেলা এগারটার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারি?

শৈবাল বলল, অমৃতসর মেলে যেতে পার। বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে পৌঁছে যাবে। যতদূর মনে পড়ছে ট্রেন সন্ধ্যা সাতটার সময়।

ওতেই যাব। এখনও ঘন্টা দেড়েক সময় আছে। ইন্সপেক্টর, আপনাকে একটা কাজ করে রাখতে হবে।

বলুন ?

এই কেসের সংশ্লিষ্টদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে রাখতে হবে।

মিঃ চিনয় অসহিষ্ণু গলায় বললেন, এত ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে আপনি করবেন কি ?

মৃদু হেসে বাসব বলল, এই কেসটা এমন জট পাকানো যে হত্যাকারী কে, তা আঁচ পর্যন্ত করা যাচ্ছে না। ওই ফিঙ্গারপ্রিন্টের দ্বারাই অন্ধকার পরিষ্কার করবে। আপনি শুনলে অবাক হবেন, আমি আরো দু-জায়গা থেকে ফিঙ্গার প্রিন্ট তুলেছি।

শৈবাল বলল, তুমি কলকাতা কেন যাচ্ছ বললে না তো ?

আমাদের পুরনো বন্ধু হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের মিঃ সামন্তর সাহায্যে গোটা কয়েক কাজ আমাকে ওখানে সারতে হবে। এসে সমস্ত বলব। বেজায় গরম লাগছে। স্নান না করে ট্রেনে ওঠা যাবে না।

বাসব বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

কলকাতা থেকে বাসব ফিরল চারদিনের দিন সকালে। ইতিমধ্যে আর কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেনি। শৈবাল অত্যন্ত সতর্ক ছিল।

বাসব পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ডাক্তার, মিঃ সামন্ত বেশ কাজের লোক।

শৈবাল বলল, যে কাজের জন্য গিয়েছিলে, তা হয়েছে তাহলে।

হতেই হবে। আমি এখুনি একটু কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ব। তুমি ততক্ষণে সুটকেশ দুটো গুছিয়ে ফেল। হয়ত আজ রাত্রেই আমাদের কলকাতা ফিরে যেতে হবে।

বল কি ! হত্যাকারী কে বুঝতে পেরেছ ?

রহস্যময় হাসি হেসে বাসব বলল, বলা বাহুল্য। তবে আরো একটু সাঙ্গুইন হয়ে নিতে হবে।

কথা শেষ করে ও ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো নিয়ে বসল। ইন্সপেক্টর গতকালই সকলের আঙুলের ছাপ শৈবালের কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। যাবার আগে বাসব নিখিলের ঠিকানা দিয়ে যাওয়ায় তার ছাপ তুলে নিতেও অসুবিধে হয়নি।

বাসব ঘন্টা দেড়েক প্রিন্টগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকার পর টেলিফোন স্ট্যান্ডের কাছে এগিয়ে গেল।

শৈবালের বুঝতে অসুবিধা হল না, থানার সঙ্গে যোগাযোগ করছে ও। ওর বেশ খুশি খুশি ভাব। পরীক্ষা-নিরীক্ষা মনোমতই হয়েছে অনুমান করে নেয়া যায়।

হ্যালো···সদর কোতয়ালী···ইন্সপেক্টর চিনয়কে একবার দিন তো ও, আপনিই বলছেন····এই তো কিছুক্ষণ হল ফিরেছি···শুনুন আজ দুপুর আড়াইটের সময় সকলকে মিঃ সুরের বাড়িতে অবশ্য করে উপস্থিত থাকতে বলবেন···· হ্যাঁ, হ্যাঁ····নিখিল সেনও যেন বাদ না যায়....বিশেষ প্রয়োজনেই সকলকে ডাকাতে

হচ্ছে ···আপনাকেও উপস্থিত থাকতে হবে....কি বললেন....এখন কিছুই বলছি না, ক্রমশ প্রকাশ্য আমাদের সওয়া দুটোর সময় তুলে নিয়ে যাবেন অসংখ্য ধন্যবাদ ছেড়ে দিচ্ছি—

বাসব রিসিভার নামিয়ে রেখে হাই তুলল। ট্রেনে ভাল ঘুম হয়নি। ঘন্টা তিনেক ঘুমিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তুমি আমাকে বারোটার সময় তুলে দিও।

আড়াইটে বাজতে এখনো মিনিট পাঁচেক বাকি আছে।

মৃন্ময়ের ড্রইংরুমে সকলেই একত্রিত হয়েছেন। কিংকর, মানস, শিশির, নবেন্দু মৃন্ময় তো আছেনই, এমন কি নিখিলও। সকলের মুখ অসম্ভব গম্ভীর। এই ভাবে বৈঠক বসিয়ে পুলিস কি উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চায় কে জানে। নিখিল অস্বস্তি বোধ করছে। এই বৈঠকে কিংকরের উপস্থিতি সে আশা করেনি। তাঁর দৃষ্টির আড়ালে ঘরের এককোণে গিয়ে বসেছে। অবশ্য ঘরে প্রবেশ করার মুখে দুজনের চোখাচোখি হয়েছিল দুজনের সঙ্গে। কিংকর অসম্ভব গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

এই সময় ইন্সপেক্টর বাসব ও শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। মৃন্ময় উঠে দাঁড়িয়ে তিনজনকে বসতে অনুরোধ জানালেন। কারুর মুখে কথা নেই। সকলের দৃষ্টি বাসবের মুখের উপর নিবদ্ধ। স্থির নিশ্চিত হতে একজনেরও অসুবিধা হয়নি যে ওর ইচ্ছাতেই এই সমাবেশ।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আমিই যে আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি, তা আপনারা সকলেই বুঝতে পেরে থাকবেন। খুশি মনে যে আপনারা উপস্থিত হননি, মুখ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। আমার প্রশ্ন হল, আপনারা কি চান না এই হত্যাকাণ্ডের মীমাংসা হোক? এক হত্যাকারী ছাড়া সকলেই মীমাংসা চান। এই মর্মন্তুদ ঘটনার নেপথ্যে যে রহস্য আছে, তার ওপর আলোকপাত করাই আমার উদ্দেশ্য।

সকলে নড়েচড়ে বসলেন।

বাসব ঘন ঘন কয়েকবার পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়ায় নিজের মুখ প্রায় আড়াল করে ফেলল।

একজনের খেয়াল-খুশিতে সুনীলাদেবী পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। হত্যাকারী অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নিজের কাজ শেষ করেছে। এই পরিকল্পনা গড়ে তুলতে যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, তাও অভূতপূর্ব! কিন্তু তবু শেষ রক্ষা করা সম্ভব হল না। অতি সতর্ক অপরাধী আত্মপ্রত্যয়শীল হয়ে পড়ে—আর ভুলচুক হয় তখনই। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আপাতদৃষ্টিতে কেসটি জটিল মনে হলেও, আসলে তা নয়। হত্যাকারীর বাহাদুরী এখানেই। আমার তদন্তে আসবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, যদি আপনাদের কেউ কেউ পুলিসের কাছে অনেক কথা চেপে না যেতেন। অভিজ্ঞ মিস্টার চিনয় সমাধান ঠিক বার করে নিতে পারতেন। আমি লক্ষ্য করেছি, তদন্ত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যকে

চেপে যাবার প্রবণতা প্রকাশ করে থাকেন। যাই হোক, সূত্রগুলিকে একত্রিত করে আমি সমস্তই জেনে নিয়েছি।

বাসব থামল।

সকলে প্রায় পলকহীন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন।

ও আবার আরম্ভ করল: হত্যাকারী আমাদের মধ্যেই উপস্থিত রয়েছে এই ঘরে, এ কথা না বললেও বোধহয় সকলে বুঝতে পেরেছেন। প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহের জন্য সময় সময় মানুষ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল এই হত্যাকান্ড। হত্যাকারী কে তার নাম বলবার আগে, আমি সেদিনের কিছু কথা বর্ণনা করতে চাই, যেদিন সুনীলাদেবী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তখন সূর্য বোধহয় ডোবার মুখে। মেথর ঢোকার দরজা দিয়ে একজন সুনীলা দেবীর ঘরে প্রবেশ করল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল স্টিল আলমারির দিকে, যেখানে অনেক টাকার গয়না ছিল। কি নবেন্দুবাবু?

বাসবের এই কথায় সকলে সবিস্ময়ে নবেন্দবাবুর দিকে তাকালেন।

নবেন্দু দ্রুত উঠে দাঁড়িয়েই বসে পড়লেন। মুখ চোখ তাঁর লাল হয়ে উঠেছে। তিনি উত্তেজনায় প্রায় ফেটে পড়লেন, এ সমস্ত কি বলছেন? আমাকে জড়াবার মিথ্যা চেষ্টা করবেন না।

অভিনয় করে মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরিত করা যায় না নবেন্দুবাবু। আমার কাছে প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের জোরেই বলছি, আপনি সেদিন ওই ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। এখনও সত্যি কথা বলুন। মিথ্যার আড়াল নিতে গিয়ে ফাঁসির দড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন না।

আমি ···আমি ···

বলুন বলুন?

মরিয়া হয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে নবেন্দু বললেন, বিশ্বাস করুন, আমি খুন করিনি। ও সম্পর্কে কিছুই জানি না। বিকেলের দিকে বাগানের ওধারে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি, একজন স্পাইরেলের সিঁড়ি বেয়ে নেমে পালিয়ে গেল।

এতক্ষণে ইন্সপেক্টর কথা বললেন, তাকে চিনতে পেরেছিলেন?

জায়গাটা অন্ধকার থাকায় চিনতে পারিনি। আমি লোকটাকে চোরই ভেবেছিলাম। কি হয়েছে দেখবার জন্য ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে উপরে গেলাম। ঘরে ঢুকেই দেখি, বৌমা মরে পড়ে আছেন। আমি ভয়ে পালিয়ে আসি। পাছে আমায় সকলে সন্দেহ করে, তাই একথা প্রকাশ করিনি।

বাসব বলল, তথ্যে যে একটু ভুল রয়ে গেল নবেন্দুবাবু। আপনি সুনীলা-দেবীকে মৃত অবস্থায় দেখেই চলে আসেননি, বরং সঙ্গে সঙ্গে অনস্থির করে কিছু গুছিয়ে নেবার পর চলে এসেছিলেন।

না, আমি আর কিছু করিনি।

করেছেন বৈকি! সুনীলাদেবীর কোমর থেকে চাবির রিংটা নিয়ে স্টিল আলমারিটা খুলেছিলেন। সমস্ত গয়নাগুলি বার করে নিয়ে আলমারি বন্ধ করে

তবে ওখান থেকে চলে আসেন—

মিথ্যে কথা—সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।

আপনি বলতে পারেন, স্টিল আলমারির মধ্যে রাখা গয়নার বাক্সগুলোয় আপনার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে কেন? আমার বিশ্বাস সেগুলো এখনো আপনার ঘরেই আছে। যদি কোন স্যাকরার কাছে পাচার করে থাকেন, তাতেও রেহাই পাবেন না। পুলিস বেনারসের প্রত্যেক স্যাকরার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

নবেন্দু আর কিছু বলতে পারলেন না।

বাসব বলল, নবেন্দুবাবু কাকে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাতে দেখেছিলেন, এ বিষয়ে আপনাদের আগ্রহ থাকতে পারে। এবার এমন কয়েকটা কথা উল্লেখ করতে হবে, যা কোন গৃহস্থ বধূ সম্পর্কে প্রযোজ্য না হওয়াই ভাল ছিল। সুনীলাদেবীর সঙ্গে নিখিলবাবুর ঘনিষ্টতা বহুদিনের। বিয়ের পরও দুজনের সম্পর্ক নির্দোষ ছিল না। লুকিয়ে নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ তো হতই—সুনীলা টাকাও দিতেন। সেদিনের সেই আগন্তুক নিখিল সেন ছাড়া আর কেউ নয়।

আমি! নিখিল প্রায় লাফিয়ে উঠল। আপনাকে তো বলেছি সুনীলার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি—

বলেছিলেন বটে। কিন্তু আপনিও যে মিথ্যাকে সত্যি বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন, তা প্রমাণিত হয়েছে। হাতের ছাপের সাহায্যে অপরাধীকে ধরা যায়, যিনি আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি নিশ্চিত ভাবে নমস্য ব্যক্তি। সুনীলাদেবীর ঘরে যদি আপনি না গিয়ে থাকেন, তবে তাঁর ঘরের দরজায় আপনার হাতের ছাপ পাওয়া যাওয়াকে ভূতুড়ে ব্যাপার বলতে হয়, কি বলেন? শুনুন মিস্টার সেন, প্রকৃত ব্যাপারটা কি ঘটেছিল পরিষ্কার করে বলুন, নইলে হ্যারাসমেণ্টের হাত থেকে আপনি কখনোই রেহাই পাবেন না।

নিখিল প্রতিবাদের জন্য মুখ খুলেও কিছু বলতে পারল না। তারপর সমস্ত কিছু ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে বলল, সুনীলার সঙ্গে সেদিন কথা বলতে গিয়েছিলাম ঠিকই, তবে সে তখন বেঁচে ছিল। তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। বিশ্বাস করুন খুনের সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, নিখিলবাবু তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় দেখেই ফিরে গিয়েছিলেন। অথচ নবেন্দুবাবু গিয়ে দেখলেন, তিনি মারা গেছেন। একজন নেমে গেলেন আর একজন উপরে উঠলেন সময়ের ব্যবধান পাঁচ সাত মিনিটের বেশি নয়। এই সময়টুকুর মধ্যেই কি হত্যাকারী নিজের কাজ সেরে চম্পট দিয়েছে? তাহলে তো নবেন্দুবাবু তাকে দেখতে পেতেন। আসল ব্যাপার হল, হত্যাকারী আদপেই ঘটনাস্থলে যায়নি। তার তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এখানেই পাওয়া যায়। সুনীলাদেবীর শরীর ভাল যাচ্ছিল না কিছুদিন থেকে। তাঁর ধারণা হয়েছিল তাকে স্লো পয়জন করা হয়েছে। নিজের সন্দেহের কথা হত্যাকারীকে বলেছিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় পরিকল্পনা দানা বাঁধে। হত্যাকারী নিশ্চয় সুনীলাদেবীকে বুঝিয়েছিল ভয়ের কিছু নেই, ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি; খেয়ে নিলেই

ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে এই ভাবে : হত্যাকারীর কাছ থেকে পাঠান সায়ানাইড যা সুনীলাদেবী ঔষধ বলে জানেন – খাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় মেথর ঢোকারদ রজায় করাঘাত হল। তিনি দরজা খুলে দিলেন। ঘরে এলেন নিখিলবাবু। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা যা হবার হল— এক সময় বিদায় নিলেন নিখিলবাবু। সুনীলাদেবী কুঁজোর কাছে এগিয়ে গেলেন, ঔষধ খেয়ে জল খাবেন বলে। কিন্তু জল আর খাওয়া হল না। ঔষধ মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা গেলেন। কাজেই নরেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে মৃতা অবস্থায় দেখেছিলেন।

এতক্ষণ পরে প্রথম কথা বলল মানস, হত্যাকারীর নাম তো আপনি বলছেন না ?

আমার ধারণা হয়েছিল, এত কথা শোনার পর আপনি আন্দাজ করতে পেরেছেন, কে হত্যাকারী। আপনার স্ত্রীকে যিনি পৃথিবীতে এনেছিলেন, তিনিই তাঁকে বিদায় দিয়েছেন। আমি বোধহয় ঠিকই বলছি কিঙ্করবাবু ?

কিঙ্কর চমকে উঠলেন : আমাকে বলছেন ?

হ্যাঁ, আপনাকেই। পরিকল্পনা যত নিখুঁত করবার চেষ্টা করুন না কেন, আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেননি। মিস্টার চিনয়, এঁকেই আপনি খুঁজছেন। শুধু অর্থের জন্যে বাপ হয়ে মেয়েকে খুন করতে ইনি দ্বিধা করেননি।

ঘরের অন্যান্যরা হতবাক হয়ে গেলেন।

কিঙ্কর উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছেন। চিৎকার করে বললেন, এত সাহস আপনি পেলেন কোথা থেকে ? অর্থের জন্যে আমি নীলাকে খুন করব ? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনি কি জানেন না, আমিই নীলাকে এক লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম – বাড়ি দিয়েছিলাম ?

জানি বৈকি। আর এ-কথাও জানি, শেয়ার মার্কেটে বারংবার মার খেয়ে আপনার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। নগদ টাকাও বেরিয়ে গেছে হু হু করে। সুনীলাদেবী তাঁর বাড়ি ইত্যাদি মেরামত করবার জন্যই বোধহয় চেক পাঠিয়েছিলেন দুবার। কত টাকা খরচ হতে পারে, সে জ্ঞান তাঁর না থাকায় দুটোই ছিল ব্ল্যাঙ্ক চেক। অর্থাৎ যত টাকা লাগবে, আপনি ফিগার বসিয়ে নিয়ে তত টাকা তুলে নেবেন। এই অভাবনীয় সুযোগের সদ্ব্যবহার আপনি করেছেন। ব্ল্যাঙ্ক চেক দুটোর সাহায্যে মোট পঁচাত্তর হাজার টাকা তুলে নিয়ে চেষ্টা করেছেন নিজের আর্থিক টাল সামলে নেবার।

আমি এখানে এক সেকেণ্ড থাকব না। ষড়যন্ত্র করে আমাকে অপমান করা হচ্ছে।

কিঙ্কর দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

তাঁকে বাধা দিলেন ইন্সপেক্টর : আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না মিস্টার নাগচৌধুরী।

কেন আপনি বাধা দেবেন ? উনি যা বলছেন, তা কি প্রমাণ করতে পারবেন ? পারবেন প্রমাণ দিতে আমি পঁচাত্তর হাজার টাকা নিয়েছি !

বাসব কিংকরের দিকে এগিয়ে এল: পুলিসের অসাধ্য কিছুই নেই, জানেন বোধহয়? কলকাতায় হোমিসাইড স্কোয়াডের মিস্টার সামন্ত আমার অনুরোধে অনেক কিছু করেছেন। চেকের নম্বর আমি টুকে নিয়ে গিয়েছিলাম। ব্যাংকে সে দুটোর সন্ধান পেতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। আপনার নামে ইস্যু হয়েছিল। চেক দুটোর ব্ল্যাংক পোরসান আপনি যে ফিলআপ করেছেন, তাও মিলিয়ে দেখা হয়েছে। এবার পটাসিয়াম সায়ানাইডের কথায় আসুন। এই বস্তু বাজারে সহজ-লভ্য নয়। কোন ডাক্তারের সহযোগিতা না পেলে সংগ্রহ করা কষ্টকর। আপনার ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ডাক্তার রায়চৌধুরী, মিস্টার সামন্তর জেরায় স্বীকার করেছেন, পাঁচশ টাকার বিনিময়ে তিনি আপনাকে সায়ানাইড সংগ্রহ করে দিয়েছেন। সুনীলাদেবীর ঘর থেকে ছোট একটা কাগজের টুকরো পেয়েছিলাম। পরীক্ষা করে বুঝতে পারা গিয়েছিল, ও কাগজের টুকরো সায়ানাইডের মোড়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। ডাক্তার রায়চৌধুরী মোড়কটাও সনাক্ত করেছেন। বর্তমানে তিনি পুলিস কাস্টডিতে।

হেভেন সেক, স্টপ—স্টপ ইট—

ক্লান্ত গলায় কথাটা বলে কিংকর সামনের কোচে এলিয়ে পড়লেন। তাঁর সমস্ত মুখ বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে উঠেছে। তিনি নিমীলিত চোখে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ইন্সপেক্টর, আমার কাজ শেষ হয়েছে, এবার যা করণীয় তা আপনার। মানসবাবু, সন্ধ্যার ট্রেনেই আমরা কলকাতা ফিরতে চাই। তার আগেই পেমেন্টের ব্যবস্থা করে দেবেন। এস ডাক্তার।

বাসব দরজার দিকে অগ্রসর হল।

অমৃতসর মেল মিনিট দশেক হল মোগলসরাই ছেড়ে এসেছে।

শৈবাল বলল, তুমি কিন্তু ওখানে বললে না, টাকা চুরির সঙ্গে খুনের সম্পর্ক কি?

ওরা কুপেতে যাচ্ছে। বাসব এখনও আপার বার্থে ওঠেনি।

পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, বলিনি নাকি? সুনীলা বোধহয় কিংকরবাবুকে লিখেছিল, তার ব্যাংক একাউন্টের প্রেজেন্ট পজিশানটা পাঠাতে। সমস্ত ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায়, এত বড় কান্ড তিনি ঘটিয়েছেন। সেদিন বদ্রী সুনীলাকে কতকগুলো চিঠি এনে দিয়েছিল, তারই কোন একটার মধ্যে সায়ানাইডের মোড়ক ছিল। একথা তো তুমি বুঝতে পেরেই থাকবে, ট্রাংককলে কিংকরবাবু ওষুধটা খাবার কথা মেয়েকে বলেছিলেন। কিন্তু আর কথা নয় ডাক্তার, ঘুমের কোলে আশ্রয় নেওয়া যাক। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে নিজেকে।

বাসব বড় আলো নিভিয়ে দিয়ে আপার বার্থে উঠল।

অনেক গভীরে

কলকাতা থেকে জালালগড়ের দূরত্ব প্রায় শ'চারেক মাইল হবে। উত্তরপ্রদেশের গা ঘেঁসে বিহারের বর্ডারে অবস্থিত এই শহরটি দুই প্রদেশের মধ্যে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে যেন।

নাম শুনলে মনে হয় অতীতের কোন নিদারুণ ইতিহাসের সাক্ষী বহন করছে জালালগড়। তা কিন্তু নয়! শহর পত্তন হয়েছে হালে' বছর ত্রিশেক বোধহয় এখনও হয়নি। শেখ জালাল একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। অতি সামান্য অবস্থা থেকে তিনি নিজের ভাগ্য ফিরিয়েছিলেন। মদের ব্যবসা করে টাকা লুটে ছিলেন দু'হাত দিয়ে।

শেষ বয়সে তাঁর মনে অনেক পরিবর্তন এল। আল্লাহর চিন্তায় নিজেকে সর্বদা লীন রাখবার জন্য সচেষ্ট হলেন। মদের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে অনেক জমিজমা কিনে ফেললেন—পরিবারস্থ আর সকলের আর্থিক দিকের নিশ্চিত ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি হজ করতে চলে গেলেন।

ভাগ্যের এমন পরিহাস, শেখ জালাল আর ফিরে এলেন না মক্কা থেকে। অত্যাধিক গরম বরদাস্ত করতে না পেরে মারা গেলেন যাবার পথে। বাপের মৃত্যু সংবাদে ছেলেদের বিশেষ অসুখী হতে দেখা গেল না। তবে অচিরাৎ গোলমাল দেখা দিল। সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে গোলমালের সূত্রপাত বলাবাহুল্য।

অনেক তিক্ততার পর ঘটনা যখন কোর্টে যাবার জন্য উন্মুখ – সেই সময় আত্মীয় পরিজনের চেষ্টায় একটা মধ্যপথ গ্রহণ করতে রাজি হলেন শেখ জালালের ছেলেরা। স্থির হল জমিদারী বিক্রি করে নগদ টাকা সকলে ভাগ করে নেবেন।

এঁদের জমিদারীর চতুর্দিকের নৈসর্গিক শোভা অতুলনীয়। গঙ্গার একটি শাখা এঁকে বেঁকে বয়ে গিয়েছিল। বছরের কোন সময় জলের অভাব হত না নদীতে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। অত্যন্ত দ্রুত বিক্রি হয়ে গেল শেখ জালালের জমিদারী। ভারতের নানা প্রান্তের রঙ্গীন মনের মানুষ পাঁচ কাঠা দশ কাঠা করে এই মাইল পাঁচেক জায়গা কিনে ফেললেন। বলতে গেলে সেই দিন থেকে জালালগড় শহরের রূপরেখা মানুষের মনে আকার নিতে আরম্ভ করেছে।

বিশেষ লেখালেখির প্রয়োজন পড়েনি। উত্তরপ্রদেশ সরকার অচিরেই একটি সমৃদ্ধশালী শহর গড়বার জন্য তৎপর হলেন। চওড়া চওড়া রাস্তা তৈরি হল। স্থাপিত হল স্কুল-কলেজ-পার্ক। শহরের পাশে যে বিস্তীর্ণ জঙ্গল ছিল তার সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা হল। এলাহাবাদ, বেনারস, জোনপুর পাটনা, গয়া প্রভৃতি শহরের সঙ্গে যে শুধু মোটর পথের যোগাযোগ হয়েছিল তা নয়—অল্প

আয়াসেই এখানকার অধিবাসী ইস্টার্ণ রেলওয়ে ও নর্দাণ রেলওয়ের সমস্ত রকম সুখ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

এই ছবির মত শহর জালালগড়কে নিয়ে আমাদের কাহিনী।

থানা ইনচার্জ গৌতম রায়নার মনের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। গতকাল বিকালে মাইল কয়েক দূরে এক খুনের এনকোয়ারীতে গিয়েছিলেন। ফিরেছেন আজ সকালে। সমস্ত রাত গেছে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। এই সমস্ত কারণেই সময় সময় চাকরির উপর বিরক্ত ধরে যায় রায়নার। বেশ ছিলেন নৈনিতে। কোন গোলমাল কোন ঝামেলা ছিল না সেখানে। মাসে খুব জোর গোটা তিনেক এনকোয়ারীতে যেতে হত। বাকি সময় নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে বসে কাটিয়ে দিতে হত।

ওখানে দু'বছর ছিলেন রায়না। বদলীর অর্ডার হল। এলেন এই জালাল-গড়ে। চার্জ বুঝে নেবার পরই বুঝলেন এখানে নিশ্চিন্ত মনে থাকবার উপায় নেই। এমন দিন যায় না যেদিন গোটাকয়েক গুরুতর কেস ডায়রীতে এসে জমা না হয়। ইন্সপেক্টর রায়না ভেবে পান না শান্ত চেহারার এই শহরের অধিবাসীরা এত মিসচিভ মঙ্গার কি ভাবে হল। তিনি বদলীর জন্য অ্যাপলাই করেছেন।

শীতের সকাল।

কনকনে হাওয়া জানলা দিয়ে প্রবেশ করছিল। সবে শীত পড়তে আরম্ভ করেছে। ক্রমে যে রক্ত জমাট করা রূপ নেবে, ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের পক্ষে তা কল্পনা করাও কষ্টকর।

রায়না ডায়রী বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গিয়ে জানলার কাচের পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলেন। এখন তাঁর প্রয়োজন এক কাপ কড়া চা আর অন্ততঃ ঘণ্টা কয়েক ঘুম। থানা কম্পাউণ্ডের মধ্যেই কোয়ার্টার। র‍্যাক থেকে গ্রেটকোটটা তুলে নিয়ে সহকারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তিনি অফিস ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন।

দরজার কাছ বরাবর যাবার পর তাঁকে থামতে হল। ঘরে প্রবেশ করলেন বীরেশ্বর করগুপ্ত। তাঁর গম্ভীর মুখে অস্থিরতা বিরাজ করছে। বিশালদেহী বীরেশ্বরকে দেখে ত্রস্ত হয়ে উঠলেন রায়না।

বললেন সসম্ভ্রমে—সুপ্রভাত মিঃ করগুপ্ত।

—সুপ্রভাত। এই সাত সকালে আপনাকে কিঞ্চিৎ বিরক্ত করতে এলাম ইন্সপেক্টর।

—ওভাবে বলবেন না। আপনার অনুরোধ রাখবার জন্য আমরা সব সময় তৎপর। কি হয়েছে বলুন তো? বসুন আগে। আপনি বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

করগুপ্ত বসলেন।

রায়না আবার ফিরে গেলেন আসনে।

কাল একটা চিঠি পেয়েছি।

—চিঠি পেয়েছেন !

– ভয় দেখান চিঠি। ফোনে যখন আমাকে থ্রেটেন করা হয়েছিল তখন আপনাকে জানিয়েছিলাম। কোন স্টেপ নিলেন না। এবার এল এই ভয় দেখান চিঠি। এই ভাবে চলতে থাকলে আমার কাজকর্মের কি নিদারুণ ক্ষতি হবে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

এখানে বীরেশ্বর করগুপ্তর পরিচয় দিযে রাখা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। করগুপ্ত ভারতের একজন প্রখ্যাত জিওলজিস্ট। যৌবনে তিনি আমেরিকাতে পড়াশুনা করেছিলেন। ওখানকার উইলকিনশন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করে দেশে ফিরে এসেছিলেন মাত্র বছর চারেকের জন্য। তারপর চলে গিয়েছিলেন পূর্ব আফ্রিকায়। দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া ঘেঁটে ওখানে কেটেছিল তাঁর চৌদ্দ বছর।

কিছুদিন হল ভারতবর্ষে ফিরে কলকাতায় নিজের পৈতৃক বাড়িতে গবেষণার কাজ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ওখানকার গোলমালের দরুণ মন পালাই পালাই করতে লাগল। কোন নিভৃত জায়গায় নতুন করে আবার গবেষণার কাজ আরম্ভ করবেন যখন চিন্তা করছেন তখন এক বন্ধু জালালগড়ের কথা বললেন। মনে লাগল কথাটা করগুপ্তর। কাল বিলম্ব না করে কাঠা বারো জায়গা কিনে ফেললেন ওখানে।

ইংলন্ডের কান্ট্রিসাইডের মত সুদৃশ্য একখানা বাড়ি তৈরি করালেন। বাড়ির চারপাশের জমিতে অনেক অর্থ ব্যয় করে বিদেশ থেকে আনা দুষ্প্রাপ্য সমস্ত গাছের চারা সতর্কতার সঙ্গে বসান হল। এই সমস্ত গাছ দেখা তো দূরের কথা, পূর্বে নাম পর্যন্ত কেউ শোনেনি। বীরেশ্বর করগুপ্ত গবেষণায় মনোযোগী হলেন।

তাঁকে নিয়ে দেশের গুণী সমাজের মধ্যে আগ্রহের সীমা নেই। মাঝে মাঝে তিনি এখানে ওখানে দু-একটি প্রবন্ধ লিখছিলেন। তাতে সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছিল তাঁর গবেষণার বিষয় অত্যন্ত জটিল। গবেষণা শেষ হলে যে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে যুগান্তর আসবে এবং বিশ্বের সেরা জিওলজিস্ট হিসাবে তিনি যে স্থান লাভ করবেন তাতে বিন্দুমাত্র কারুর দ্বিমত ছিল না।

করগুপ্ত বিপত্নীক ব্যক্তি। আমেরিকায় যখন পড়াশুনা করছিলেন সেই সময় হিল্ডাকে বিয়ে করেন। হিল্ডা রেমার তাঁর সহপাঠিনী ছিল। সুখেই কাটছিল তাঁদের বিবাহিত জীবন। হঠাৎ সমস্ত এলোমেলো হয়ে গেল। মোটর এক্সিডেন্টে মারা গেল হিল্ডা। নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন বীরেশ্বর। পরবর্তী কালে অনেক প্রলোভনকে উপেক্ষা করে আর বিয়ে করেননি। বর্তমানে নিজের বলতে আছে তাঁর দুই ভাইপো- সুদীপ আর প্রদীপ। সুদীপ জালালগড় কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক। পাঠ্যজীবনে কৃতী ছাত্র ছিল সে। প্রদীপ ফোর্থ

ইয়ারে পড়ছে।

বীরেশ্বরের বাবা সুরেশ্বর ধনী ব্যক্তি ছিলেন। মাইকার ব্যবসা করে বহু লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কের জঠরে সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন তিনি। পরিণত বয়সে সুরেশ্বর যখন মারা গেলেন বীরেশ্বর করগুপ্ত তখন আমেরিকায়। দাদা সোমেশ্বর এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। কূট কৌশলে সুরেশ্বরের সমস্ত টাকা হস্তগত করলেন তিনি। তবে ভোগ করতে পারলেন না বেশিদিন। স্ত্রী আগেই গত হয়েছিলেন, দুই ছেলেকে রেখে দুরারোগ্য ক্যানসারে মারা গেলেন। এত কাণ্ডর পরও দেশে, ফিরে এসে ভাইপোদের বুকে তুলে নিয়েছিলেন, বীরেশ্বর। সন্তানের মত লালন পালন করেছেন তাদের।

জালালগড়ে আসার পর বেশ নিরুদ্বেগেই কেটে গেছে বছরের পর বছর বীরেশ্বরের। অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে গবেষণা করে চলেছেন তিনি। হঠাৎ সেদিন — মাস খানেক আগে ব্রেক ফাস্ট সেরে কাগজ পড়ছেন, টেলিফোন বেজে উঠল। ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে বীরেশ্বর বললেন, হ্যালো অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল, নমস্কার। আমি আপনার একজন অতি পরিচিত ব্যক্তি। নামটা অবশ্য বর্তমানে প্রকাশ করতে চাই না।

ভ্রূ কুঁচকে বীরেশ্বর বললেন, রসিকতা আমি পছন্দ করি না। যা বলতে চান তাড়াতাড়ি বলুন।

—আপনার সময় মূল্যবান আমি জানি ডক্টর করগুপ্ত। আমার বক্তব্য সামান্য। কসকটিনার বিষয় বলছিলাম।

—কসকটিনা।

ভুলে গেলেন বছর চোদ্দ আগে এ বিষয় আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল। এতদিন আপনার বাগানে কসকটিনা মহিরুহ হয়ে না উঠলেও বেশ বড় হয়ে উঠেছে। গোটা কয়েক চারাও বেরিয়েছে। একটি চারা আমার চাই। আশা করি আপনি নিজের কথা রাখবেন।

বীরেশ্বর রাগত গলায় বললেন, কে আপনি ? কি সমস্ত প্রলাপ বকছেন ?

—কে আমি! অবাক করলেন মশাই! চিনতে না পারার চমৎকার ভান করছেন তো! যা হোক, এক সপ্তাহ সময় দিলাম আপনাকে চিন্তা করে দেখবার। আবার ফোন করে জেনে নেব কখন লোক পাঠালে চারাটা আপনি হস্তান্তরিত করবেন।

কথা শেষ করেই লাইন কেটে দিল সে।

বীরেশ্বর বিরক্ত মনে ভাবতে লাগলেন কে হতে পারে লোকটা। কথাবার্তা শুনে মনে হল যেন খুবই পরিচিত। প্রায় মিনিট পনের ধরে অনেক ভেবে স্মৃতির অতলে সাঁতরেও কোন হদিশ পেলেন না। শেষে তাঁর মনে হল অতি পরিচিত কেউ এই ভাবে তাঁর সঙ্গে মস্করা করল। এই টেলিফোনের ব্যাপারটাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। পরের দিনই এক রকম ভুলে গেলেন। দেখতে দেখতে সাতদিন কেটে গেল। ব্রেক ফাস্টে বসেছেন সবে, টেলিফোন বেজে উঠল।

— হ্যালো—

গম্ভীর গলায় তারের অপর প্রান্ত থেকে একজন বলল, আজ আমার ফোন করবার কথা ছিল? কি স্থির করলেন? কসকটিনার চারাটা আজই দিচ্ছেন তো?

প্রায় চিৎকার করে উঠলেন বীরেশ্বর- কে আপনি?

হাসল লোকটা আপনার অভিনয় নৈপুন্যের প্রশংসা করতে হয়। আমি জানি ডক্টর করগুপ্ত কেন আপনি এত অজ্ঞ সাজছেন। আপনার গবেষণার বিষয় হল ওই কসকটিনা। গবেষণায় সাফল্যলাভ করলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তর আসবে। উদ্ভিদ বিজ্ঞান থেকে আপনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে লাফিয়ে পড়তে চাইছেন নোবেল প্রাইজের লোভেই হয়ত। শুনে রাখুন আমি তা হতে দেব না। ওই একই বিষয় নিয়ে আমি গবেষণা চালাচ্ছি।

—বদ্ধ উন্মাদ। তুমি চুলোয় যাও।

সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন বীরেশ্বর।

পরমুহূর্তে একটা সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হওয়ায় আবার তিনি রিসিভার তুলে নিলেন। অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি জানতে চাইলেন, তাঁকে কোথা থেকে ফোন করা হয়েছিল। অপারেটর জানাল ৬৪২ থেকে ফোন করা হয়েছিল। নম্বরটা পাব্লিক টেলিফোনের। ব্যাপারটাকে আর হাল্কা চোখে দেখতে পারলেন না বীরেশ্বর। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। যে তাঁকে ফোন করেছে সে সহজ লোক নয়। তিনি কি বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন তাও তার জানা আছে।

ব্রেকফাস্ট শেষ করতে আর মন চাইল না। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে তিনি বারান্দায় এলেন। সন্দীপ কি একটা বই পড়ছিল সেখানে বসে। একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে তার পাশে বসলেন বীরেশ্বর। নিজের দুর্ভাবনার বিষয় ভাইপোকে ওয়াকিবহাল করতে তৎপর হলেন।

— সন্দীপ, একটা বিষয় নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছি বাবা।

সন্দীপ বই মুড়ে বলল, কি হয়েছে কাকা?

বীরেশ্বর ঘটনাটা সবিস্তারে বলবার পর প্রশ্ন করলেন, কি করা যায় বল্ তো? ব্যাপারটা শুনে সন্দীপ হতবাক।

—কাকা. এ সমস্ত ব্যাপারকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

— তাতো বুঝলাম। কিন্তু কি করব বল্?

—পুলিসে খবর দেবে। বুঝতে পারছ না এ সমস্ত সুবিমল বসাকের কাণ্ড। কয়েক বছর ধরে নানা আর্টিকল লিখে সে তোমাকে ছোট করবার চেষ্টা করে আসছে। নিশ্চয় এ কাজটাও তার।

সুবিমল বসাকও একজন খ্যাতিমান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। তিনি ব্রেজিলের গহন অরণ্যে বেশ কিছুদিন গাছ-গাছড়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কাটিয়েছেন। বসাক বীরেশ্বরের সমসাময়িক।

— সুবিমল আমার পিছু লেগেছে সন্দেহ নেই। তবে এই ভাবে সে কি ফোর

ফ্ল্যাটে আসতে চাইবে? তাছাড়া বসাক তো কলকাতায়।

—কলকাতা থেকে এখানে আসতে ট্রেনে ঘণ্টা চৌদ্দর বেশি লাগে না কাকা। সুবিমল বসাক চলে এসেছে।

বীরেশ্বর সিগারেট ধরালেন।

ঘন ঘন কয়েকবার টান দিয়ে চিন্তিত গলায় বললেন, তুই তো আমায় আরো ভাবিয়ে তুললি। পুলিসে যাওয়া বিশেষ দরকার কি বলিস?

—নিশ্চয়।

বীরেশ্বর ইন্সপেক্টর রায়নার কাছে গেলেন। যাবার আগে দুদিন টেলিফোনে যা কথোপকথন হয়েছিল তা নোট করে নিয়ে গেলেন। ইন্সপেক্টর চিনতেন এই বিখ্যাত ব্যক্তিটিকে। সসম্ভ্রমে বসালেন। শুনলেন তাঁর বক্তব্য। নোট করা কাগজটার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে গেলেন।

বললেন, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। কেউ আপনার সঙ্গে অনর্থক রসিকতা করছে। এরকম লোক সর্বত্র কিছু না কিছু থাকে।

—তা নয় ইন্সপেক্টর। নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে। সুদীপের অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে বলতে হবে পরিস্থিতি খুবই গুরুতর।

– আমার কাছ থেকে কি রকম সাহায্য চান বলুন?

— আপনি বিচিত্র প্রশ্ন করছেন ইন্সপেক্টর। প্রথমে তলিয়ে দেখুন আমি কোন জালে জড়িয়ে পড়ছি কিনা, তারপর আমাকে প্রটেকশন দেবার ব্যবস্থা করুন ইন্সপেক্টর রায়না অনুমান করলেন ডক্টর করগুপ্ত অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন। তাঁকে দুচার কথায় শান্ত করে সেদিনের মত বিদায় দিলেন। দু'সপ্তাহ আর কোন টেলিফোন পাননি বীরেশ্বর। নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। বসাকের যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে তাহলে সে বুঝতে পেরেছে তার ধমকে তিনি ভয় পাননি।

আচম্বিতে সমস্ত নিশ্চিন্ততা ছিন্নভিন্ন করে গতকাল ডাকে চিঠিটা এল। চিঠির প্রতিটি ছত্র গরম শিসে ঢেলে দিল বীরেশ্বরের মনে। প্রথম কিছুক্ষণ স্তম্ভিতবৎ বসে রইলেন তিনি। তারপর ভাইপোদের ডেকে চিঠিখানা দেখালেন। তারাও কম বিস্মিত হল না। নানা কারণে গতকাল আর বাড়ি থেকে বেরুতে পারলেন না বীরেশ্বর। আজ সকালেই ছুটে এসেছেন থানায়।

রায়না বললেন চিঠিখানা দেখি।

বীরেশ্বর পার্শি কোটের পকেট থেকে চিঠিটা বার করে দিলেন। খামের মধ্যে থেকে চিঠিটা বার করলেন ইন্সপেক্টর। পুরু কাগজের উপর টাইপ করা। খামের উপরকার পোস্টাল মার্ক দেখে বুঝতে পারা যায়, গত পরশু জালালগড় থেকেই পোস্ট করা হয়েছে। লোকাল চিঠি।

চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে গেলেন ইন্সপেক্টর।

বাংলায় তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায়।

মাননীয় মহাশয়,

আপনার অভদ্রতায় আমি চমৎকৃত। সেদিন ওই ভাবে টেলিফোন ছেড়ে দেওয়ার কোন ভদ্র কৈফিয়ত আপনার কাছে নেই জানি। ভবিষ্যতে একটু সতর্ক হয়ে চলবেন। আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বিদ্যা ও জ্ঞানঅর্জনের পর মানুষকে বিনয়ী হতে হয়। বিস্ময়ের কথা আপনি বিনয়ের ধার ধারেন না।

যা হোক, এবার আসল কথায় আসা যাক। আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও আমার হাত থেকে পরিত্রান পাবেন না জানবেন। আপনার অজ্ঞতাব প্রকাশের ভঙ্গীমা বৈশিষ্ঠপূর্ণ। কিন্তু ভেবে দেখছেন কি আমার পরামর্শ না পেলে আপনি কসকটিনার সন্ধান পেতেন না। মনে পরে সেদিনের কথা। ১৯৪৯ সালের ৭ই আগস্ট বৃষ্টির অজস্রধাবায় লণ্ডন সেদিন বিভ্রান্ত। চেবিংক্রশ স্টেশনে দেখা হয়ে গেল আমাদের। আমি একা ছিলাম না, সঙ্গে এক বন্ধু ছিলেন। স্টেশনের বাইরে এসে ট্যাক্সিতে গিলবার্ট স্ট্রীটের গোল্ডেন কর্ণাব রেস্টুরেণ্টে এলাম। ওখানে বসে আমাদের অনেক কথা হল। সেই সময় আমি আপনাকে কসকটিনার সন্ধান দিয়েছিলাম। স্থিব হয়েছিল বৃটিশ সোমালীল্যাণ্ড থেকে ওই দুষ্প্রাপ্য গাছ সংগ্রহ করে আপনি দেশে ফিরে যাবেন এবং আমাকে গাছেব চারা দিতে বাধ্য থাকবেন। এত বছর অতিক্রম করে গেল অথচ আপনি নিজেই অঙ্গীকার রাখলেন না। স্মরণ করিয়ে দেবার পর অজ্ঞতা প্রকাশ করে রেহাই পেতে চাইছেন। আমি সহ্যে শেষ প্রান্তে। আপনাকে আর মাত্র তিনদিন সময় দিচ্ছি। এই তিনদিনের মধ্যে যে কোন দিন আপনার বাড়ির দক্ষিণ দিকের বাউণ্ডারি ওয়ালের উপর কসকটিনাব চারা রেখে দেবেন। আমার কথা উপেক্ষা কবলে বা আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করলে ফল অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। নিশ্চিত ভাবে নিদারুণ ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে আপনাকে।

নমস্কার।
জনৈক বন্ধু।

ভ্রূ-কুঁচকে চিঠিটা মুড়ে খামের মধ্যে রাখলেন ইন্সপেক্টর। সন্দেহের একটা বিষয় তাঁর মনকে বেষ্টন করল। ব্যাপারটা মোটেই হাল্কা নয় এখন পরিষ্কার তিনি বুঝতে পারলেন।

—আচ্ছা, এই চিঠির কথা আর কেউ জানে? রায়না প্রশ্ন করলেন।

—আমার ভাইপোরা জানে। আমি তাদের পড়ে শুনিয়েছি।

--চিঠিতে যে কথা লেখা আছে অর্থাৎ লণ্ডনের এক হোটেলে বসে কথাবার্তার বিষয় বলেছে, তাকি সত্যি?

—হ্যাঁ।

— বাকি দুজন কে ছিলেন?

বীরেশ্বর সিগারেট ধরিয়ে চুপ করেছিলেন।

—তারপর বললেন, একজন সুবিমল বসাক যে আমাকে কসকটিনার সন্ধান দিয়েছিলেন। সেও একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। দ্বিতীয়জন রমেশ গোয়েল। আমাদের লাইনের লোক নয়। রাজস্থানের কোথায় জিপসামের ব্যবসা আছে।

একটু ভেবে নিয়ে রায়না বললেন, আপনার কি অনুমান এই কাণ্ডকারখানার মূলে সুবিমল বসাক আছেন ?

—জোর দিয়ে কি ভাবে বলি। তবে ফোনের ও চিঠির ভাষায় সন্দেহ মনে জাগছে !

—আপনি চিন্তিত হবেন না। আজই আমি তদন্ত আরম্ভ করছি। দুজন কনস্টেবল যাতে আপনার বাড়িতে কয়েকদিন থাকে তার ব্যবস্থাও করছি। ভাল কথা, সুবিমল বসাকের ঠিকানাটা জানা থাকলে আমায় দিন। উড়ো চিঠিটা কিন্তু আপাতত আমার কাছেই থাকবে।

একটা কাগজে বসাকের ঠিকানা লিখে দিয়ে থানা থেকে বিদায় নিলেন বীরেশ্বর।

সুদীপের আজ মাত্র দুটো ক্লাশ ছিল।

প্রতি বুধবার তার পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক। প্রায় সমস্ত দিন পাওয়া যায় বাড়ি ফিরে অন্য কিছু করবার। কলেজ থেকে বেরিয়ে ফোরথ স্ট্রীটের মোড়ে এসে দাঁড়াল। নিউইয়র্কের মত এখানকার রাস্তাও সংখ্যা দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে। এবার একটা রিক্সা পেলেই সুদীপ বাড়ি ফিরে যেতে পারে। রিক্সার আশায় এদিক ওদিক তাকাতেই ওর দৃষ্টি পড়ল রাস্তার অপর পারে ল্যাম্প পোস্টের ধার ঘেঁসে শেলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাসছে অল্প অল্প।

সুদীপ রাস্তা অতিক্রম করল।

শেলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল, কলেজ পালিয়ে এখানে কি করা হচ্ছে শুনি ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল শেলা—তুমি ছাত্রদের ক্লাসে বসিয়ে রেখে কোথায় যাচ্ছ বলবে কি ?

—বলব না।

—কেন বলবে না ?

দুজনে হেসে উঠল।

সুদীপ বলল, আজ বুধবার না। আমার তো লিজার থাকে।

—আমি যেন জানি না। তাই তো ক্লাশগুলোকে তালাক দিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

—তার মানে ?

শেলা দ্রুত গলায় বলল—তোমাকে নিয়ে আর পারি না। প্রতি বুধবারে এখান থেকে রিক্সা ধরে তুমি বাড়ি যাও তাও আমার অজানা আছে বুঝি ?

একটা রিক্সা দেখতে পেয়ে সুদীপ থামাল।

—এস।

দুজনে উঠে বসবার পর বলল, কোনদিকে যাবে ?

—তোমার ও আমার বাড়ির দিকে নয় বোধহয়।

রিক্সাওয়ালাকে নদীর দিকে যাবার নির্দেশ দিয়ে সন্দীপ বলল—মিস সাহেবা তাহলে আমার অপেক্ষায় ওখানে দাঁড়িয়ে মিনিট গুনছিলেন ?

— গর্বে বুক ভরে উঠল, না ?

—কেন, গর্ব কিসের ? আমি তো জানি আমি ছাড়া তোমার গতি নেই। হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া জিনিসের জন্যে কোন শিহরণ, কোন গর্ববোধ আর করি না।

—ঠাট্টা হচ্ছে ? শোন একটু সিরিয়াস হও। অনেক সিরিয়াস কথা আছে তোমার সঙ্গে।

সন্দীপ শেলার আর একটু কাছে ঘেঁসে বসল।

—খুব সিরিয়াস হয়ে গেলাম। বল ?

—দেখা করনি কেন কদিন ?

ক্লাশে প্রতিদিনই তো দেখা হয়েছে।

- আবার বাজে কথা ' আমি ক্লাশের বাইরের কথা বলছিলাম।

—বাইরে থেকে কিছু পরীক্ষার খাতা এসেছে। সেগুলো নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু কি যেন সিরিয়াস কথা বলবে বলছিলে

শেলার কিছু বলবার আগেই রিক্সা থামল।

নদীর ধারে ওরা এসে পড়েছে। রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে দুজনে বাঁধান চাতালের উপর না বসে, একটা গাছের আড়ালে গিয়ে বসল। এই জায়গাটা ওদের অত্যন্ত প্রিয়। ঘাট এখন সম্পূর্ণ নির্জন। শীতের ঋতুতে এই দুপুরে কে আর স্নান করতে আসবে। শরৎকাল কি হেমন্তকাল হলে অবশ্য কিছু লোকের দেখা পাওয়া যেত।

শেলার সঙ্গে সন্দীপের ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের নয়। আলাপ হয়েছে মাস আটেক হবে। এবং এই অল্প দিনের মধ্যেই আলাপ ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

কলেজে তখন অ্যাডমিশন পর্ব চলছে। ক্লাশ নেবার তাড়া নেই। বেশির ভাগ সময় সন্দীপ শুয়ে বসে কাটায়—বই পড়ে। লনে বসে সেদিন বই পড়ছিল। একলাই ছিল সেখানে। বীরেশ্বর নিজের গবেষণাগারে ছিলেন, প্রদীপ কোথাও বেরিয়েছিল বোধহয়।

বই পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সন্দীপ। গেটের কাছে শব্দ হওয়ায় চমকে মুখ তুলল ও। সবিস্ময়ে দেখল একজন দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ অবাঙ্গালী ভদ্রলোক - পাঞ্জাবী বলেই মনে হয়, বাগানে প্রবেশ করছেন। তিনি একা নেই সঙ্গে একটি তরুণী।

সন্দীপ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বলল, আমি কুলদীপ চোপরা। আপনাদের প্রতিবেশি দুটো বাড়ির পরেই থাকি। এটি আমার মেয়ে শেলা। বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি—

—কাকা তো এখন কাজে ব্যস্ত আছেন।

—প্রয়োজন আপনার সঙ্গে।

সুদীপ দুজনকে বসতে অনুরোধ করে বলল, বলুন।

চোপরা বললেন, শেলা লক্ষ্ণৌ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে। আপনাদের কলেজে বি. এ পড়বে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অ্যাডমিশনের। একজন অধ্যাপকের রেকমেন্ডেশন না পেলে আপনি যদি রেকমেন্ড করে দেন তাহলে ওর অ্যাডমিশন হয়ে যায়।

সুদীপের কলেজে বি. এ তে মাত্র ত্রিশটি সিট নির্দিষ্ট আছে মেয়েদের জন্য। বেশির ভাগ সিট পূর্ণ হয়ে যায় যারা ওই কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে তাদের দিয়ে। দু-চারটে সিট যা বাঁচে তার জন্য নতুন ছাত্রী নেওয়া হয়। সুতরাং প্রতিযোগিতা বেশি। অধ্যাপকদের রেকমেন্ডেশনের প্রয়োজন হয়।

সুদীপকে চুপ করে থাকতে দেখে চোপরা আবার বললেন, আমার মত অপরিচিত লোকের মেয়েকে আপনি রেকমেন্ডেশন করবেন কিনা ভাবছেন বোধহয়? আমি স্ট্যাটাসহীন লোক নই। এই শহরের সবচেয়ে বড় অটোমোবাইল ফার্মের মালিক আমি। তাছাড়া—

না না, আমি ও কথা ভাবিনি। আমি ভাবছিলাম এখন কোন কাজ হবে কিনা। কারণ অ্যাডমিশন নেওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে দিন কয়েক আগে থেকেই। যাই হোক কাল বেলা দশটার পর কলেজে আমার সঙ্গে দেখা করুন। দেখি কি করতে পারি।

- অশেষ ধন্যবাদ।

বসুন। দু'কাপ চা আনাই।

—তার প্রয়োজন হবে না। অসময়ে আমরা চায়ে অভ্যস্ত নই।

সকন্যা চোপরা বিদায় নিলেন।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে শেলার। সুদীপের চেষ্টায় তার অ্যাডমিশন হয়ে গেল। এবং বলতে গেলে সেই মুহূর্ত থেকে দুজনের মনে রং ধরল। প্রথমে কলেজের এখানে ওখানে দেখা সাক্ষাত - সামান্য দু-চার কথার মাধ্যমে নিজেদের চেপে রাখবার যত্নকৃত চেষ্টা। তারপর সে ভাবকে ছেঁড়া কাপড়ের মত দূরে ফেলে দিয়ে গভীর অন্তরঙ্গতা।

……শেলা সুদীপের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে নরম গলায় বলল, দিন তিনেক ধরে মা ও বাবার মধ্যে আমার সম্পর্কে ঘন ঘন আলোচনা হচ্ছিল।

—তারপর?

--আজ সকালবেলা মা আমাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে সময়োচিত একটা লম্বা বক্তৃতা দেবার পর প্রশ্ন করলেন, তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে আমি সুখী হব কি না?

- বল কি। তারপর?

—আর তারপর নেই।

—নেই মানে। তুমি কোন উত্তর দিলে না।

শেলার মুখে মিষ্টি হাসি।

—না কিছুই বললাম না। লজ্জাবতী লতার মত ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ও প্রশ্নটা কোন ইম্পর্টেণ্ট প্রশ্নই নয়। মা মেয়ের মনের খবর রাখে কিনা।

—যাক, বাঁচা গেল। এত সহজে চীনের প্রাচীর পার হতে পারব ভাবিনি। সন্দীপ দুহাত দিয়ে শেলাকে কাছে টানবার চেষ্টা করল।

- এই অসভ্যতা কর না।

- কেন করব না। কে দেখল না দেখল গ্রাহ্য করি না। পাসপোর্ট পেয়ে গেছি।

—কিন্তু ভিসা? শুধু পাসপোর্ট পেলে হবে না, ভিসাও তো চাই। পাঞ্জাবী মেয়ে বৌ করতে তোমার কাকা রাজি হবেন?

—নিশ্চয় হবেন। তোমার মার মত তিনিও আমার মনের খবর রাখেন কিনা। এরপর নিজেদের ভবিষ্যত জীবন নিয়ে অনেক অর্থহীন কথা হল দুজনের মধ্যে। অনেক পরিকল্পনা খাড়া করল এবং ভেঙ্গে দিল। সন্ধ্যা হয়ে এল ক্রমে। সন্দীপ বলল, ওঠা যাক এবার।

—চল। ভাল কথা, আজ সকালে আরেকটা ব্যাপার হয়েছে।

—কি রকম?

—বেলা আটটা হবে বোধহয়, ফোন বেজে উঠতেই আমি ধরলাম। এক ভদ্রলোক তোমাদের সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন।

—তাই নাকি! কি নাম ভদ্রলোকের।

—নাম মনে নেই। উপাধী বোস না বসাক কি যেন।

—কি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি?

—তোমার কাকা মাঝে মাঝে শহরের বাইরে যান কি না? তোমাদের গেটের সামনে পুলিস মোতায়েন রয়েছে কেন? অদ্ভুত সব প্রশ্ন। আমি বিরক্ত হয়ে ফোন ছেড়ে দিয়েছিলাম।

আশ্চর্য ব্যাপার তো। চিন্তিত সন্দীপ শেলাকে সঙ্গে নিয়ে নদীর তীর থেকে সরে এল।

উড়ো চিঠি পাবার পর নির্বিঘ্নে দিন তিনেক কেটে গেল.

পুলিসের কথামত ও নিজের ইচ্ছাতেও বীরেশ্বর কসকটিনার চারা বাউণ্ডারি ওয়ালের উপর রাখেননি। কোন ফোন বা চিঠি তাঁর কাছে আসেনি। সন্দীপের মুখ থেকে ইতিমধ্যে তিনি অবশ্য শুনেছেন, চোপরার বাড়িতে ফোনে জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা।

চতুর্থদিন সকালে নিয়ম মত ব্রেকফাস্টের টেবিলের সামনে এসে বসলেন বীরেশ্বর। সন্দীপও এল খবরের কাগজ হাতে করে।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, বুঝতে পারা যাচ্ছে লোকটা ভয় দেখিয়ে

কাজ আদায় করতে চেয়েছিল।

তুই উড়ো চিঠিটার কথা বলছিস ?

—হ্যাঁ কাকা। চিঠি পেয়ে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়ে তুমি চারাটা দিয়ে ফেলবে তাকে সে ভেবেছিল।

সুবপতি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল।

'তাকে অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছে। এই শীতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। সুরপতি এ বাড়ির পুরানো চাকর এবং একমাত্র চাকর। বর্ধমান জেলার কোন এক গ্রামে তাব বাড়ি। তবে গেঁয়ো আর মোটেই নেই। বীরেশ্বরের সঙ্গে থাকতে থাকতে, চৌকস হয়ে উঠেছে।

সুদীপ বলল, কি হয়েছে সুরপতি ? তোকে এরকম দেখাচ্ছে কেন ?

আজ্ঞে কিছু হয়নি তো।

বীরেশ্বর বললেন, প্রদীপকে ডেকে নিয়ে আয়। সেও আমাদের সঙ্গে চা খেয়ে নিক। সাতটা বেজে গেছে এখনও পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে।

সুরপতি কি একটা বলতে গিয়েও বলল না। চলে গেল প্রদীপকে ডাকতে। মিনিট কয়েক পরে এসে জানাল সে তার ঘরে নেই।

—এই সাত সকালে আবার কোথায় বেরুল।

আত্মগত ভাবে কথাটা বলে বীরেশ্বর চায়ে মন দিলেন। সুদীপও। চিন্তার কথা হল দুপুরে।

খাওয়ার সময় উতরে গেল তখনও প্রদীপের দেখা নেই। কোথায় গেল ছেলেটা। দুজনে অত্যন্ত অস্থিরতা বোধ করতে লাগলেন। সন্ধ্যাও হয়ে গেল ক্রমে—প্রদীপের দেখা নেই। আর চুপচাপ বসে থাকা চলে না। গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। প্রদীপ অত্যন্ত শান্ত ও বাধ্য ছেলে। অনুমতি না নিয়ে বাড়িব বাইরে কখনও যায় না। তার পক্ষে বাড়ির কাউকে কিছু না বলে বাড়িতে এতক্ষণ ইচ্ছাকৃত ভাবে অনুপস্থিত থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বীরেশ্বর ছটফট করছেন। সুদীপ দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনার শেষ প্রান্তে। ঘণ্টা দুয়েক আরো কাটল।

দেখা নেই প্রদীপের !!!

বীরেশ্বর আর তার অপেক্ষায় বসে থাকা সমীচীন মনে করলেন না। সুদীপকে বললেন অনুসন্ধান করতে। সুদীপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গায় খোঁজ করল। প্রদীপের সন্ধান পাওয়া দূরের কথা তার সম্পর্কে কোন মূল্যবান তথ্যের ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

শুধু শেলা বলল, গতকাল সন্ধ্যায় টাইম টেবিল চাইতে প্রদীপ আমার কাছে এসেছিল।

—তুমি জানতে চেয়েছিলে টাইম টেবিল নিয়ে সে কি করবে ? সুদীপ প্রশ্ন করল।

—জানতে চেয়েছিলাম বইকি। বললে, দরকার আছে।

—তোমার কি মনে হয় জালালগড়ের বাইরে কোথাও গেছে ?

— প্রদীপের মত বাধ্য ছেলে তোমাদের না জানিয়ে এরকম কাজ করবে বলে আমার মনে হয় না ।

সন্দীপ টলতে টলতে যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত সাড়ে এগারটা । বীরেশ্বর পার্লারে পায়চারি করছিলেন । ভাইপোর মুখের অবস্থা দেখে আর কোন প্রশ্ন করলেন না । বুঝতে পারলেন প্রদীপের অন্তর্ধান সম্পর্কে কোন তথ্যই সে সংগ্রহ করতে পারেনি ।

খাওয়ার কথা মনে পড়ল না দুজনের । বিনিদ্র অবস্থায় দীর্ঘরাত অতিক্রান্ত হল । ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীরেশ্বর ছুটলেন থানায় । সমস্ত কথা রায়নাকে বললেন । রায়নাও বিচলিত কম হলেন না ।

প্রদীপ কোথায় গেল ইন্সপেক্টর ?

সত্যি চিন্তার কথা হল ।

— আপনি আর নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকবেন না । আমি বেশ বুঝতে পারছি, সে গুরুতর কোন বিপদে পড়েছে ।

— ধৈর্য হারাবেন না ডক্টর করগুপ্ত । হয়ত তার কিছুই হয়নি । আপনাদের না জানিয়ে হঠাৎ কোথাও চলে গেছে । আজই ফিরে আসবে । অবশ্য আমি তদন্তের ব্যবস্থা করছি । আপনি বাড়ি যান । আধঘণ্টার মধ্যেই আমি আপনার ওখানে পেঁছাব ।

রায়না আধঘণ্টা পরে নিজের কথামত বীরেশ্বরের বাড়ি পেঁছালেন । পেঁছে দেখলেন পার্লারে উদভ্রান্তের মত বীরেশ্বর ছুটে বেড়াচ্ছেন । সন্দীপ মাথা নিচু করে একপাশে বসে আছে । আর চাকরটা উত্তেজনা মুখে ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জড়সড় হয়ে ।

রায়নাকে দেখে বীরেশ্বর বললেন, আরেক কাণ্ড হয়ে গেছে ইন্সপেক্টর । থানা থেকে ফিরেই একটা ফোন পেলাম ।

—সেই লোকটা ফোন করেছিল নাকি ?

—হ্যাঁ । বেপরোয়া ভঙ্গিতে সে আমায় জানাল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কসকটিনার চারা না পাওয়ায় সে নিজের কাজ আরম্ভ করেছে প্রদীপ এখন তার হাতে । সে ইচ্ছে করলেই এখন তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারে । কি রকম ব্যাড স্টার আমাকে ফলো করতে আরম্ভ করেছে তাই ভাবছি । কেন গাছের চারাটা তার কথা মত আমি দিলাম না ।

— প্রদীপকে ফিরিয়ে এনে দিন ইন্সপেক্টর । সন্দীপ করুণ গলায় বলল, দেরি হলে সত্যি হয়ত তাকে মেরে ফেলা হবে ।

—দুজনকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না ইন্সপেক্টর । অবশ্য এক মুহূর্তের জন্যে, তারপরই নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হলেন ।

বললেন, এখন ভেঙ্গে পড়বার সময় নয় । নিজেদের শক্ত করুন । প্রদীপবাবুকে

নিশ্চয় ফিরে পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে আমি ক্যালকাটা পুলিসকে অনুরোধ করেছি সুবিমল বসাকের গতিবিধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে। রমেশ গোয়েলের সন্ধানও করা হচ্ছে। এবার আপনারা আমার গোটা কয়েক প্রশ্নের উত্তর দিন।

বীরেশ্বর বসতে বসতে বললেন, বলুন ?

—প্রদীপবাবুকে আপনি শেষ কখন দেখেন ?

—তখন বেলা চারটে হবে। আমি গবেষণাগারের জানলা দিয়ে দেখতে পাই সে লনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রাত্রে খাওয়ার টেবিলে তাঁকে দেখতে না পেয়ে আপনার মনে সন্দেহ হয়নি ?

খাওয়ার টেবিলে প্রদীপের সঙ্গে আমার কোন দিন দেখা হয় না। কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় প্রতিদিন খাওয়া সেরেনি। পড়াশুনা সেরে খেতে আসতে তার দশটা হত।

- কোন কারণে কয়েকদিনের মধ্যে তাঁকে বকাবকি করেছিলেন কি ?

না। তাছাড়া বকুনি খাবার মত কাজ সে করত না।

রায়না মুখ ফিরিয়ে বললেন, সুদীপবাবু, আপনার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা কখন হয় ?

—আমি তাকে দুপুরে কলেজে দেখেছিলাম। বাড়ি ফিরি অনেক রাত্রে। কলেজ থেকেই অন্যত্র গিয়েছিলাম কাজে। খাওয়ার ঘরে গিয়ে সুরপতি মানে আমাদের চাকরের মুখে শুনলাম, কিছুক্ষণ আগে প্রদীপ খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে গেছে।

—তাঁর ঘরখানা একবার দেখতে চাই।

—আসুন।

সুদীপ ইন্সপেক্টরকে প্রদীপের ঘরে নিয়ে গেল।

ঘরখানা খুব বড় নয়। মাঝারি। পর পর দুটো জানলার কাছ ঘেঁষে খাট। খাটে পাতা রয়েছে ধপধপে নিভাঁজ বিছানা। টেবিল রাখা রয়েছে খাটের পাঁচ-ছ হাত দূরে দেওয়াল ঘেঁষে। একজন ছাত্রর টেবিল যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনি। একটা বই খোলা অবস্থায় রয়েছে।

টেবিলের কাছেই সুদৃশ্য আলমারিটা রয়েছে। কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় কয়েকটা তাকে বই আর কয়েকটা থাকে জামাকাপড় রয়েছে। আলমারি আর টেবিলের মাঝখানে মেঝের উপর একটা কাচের গেলাস রাখা। আলনাটা ঘরের আরেক প্রান্তে। কয়েকটা ট্রাউজার ও শার্ট হ্যাঙ্গার-বদ্ধ হয়ে ঝুলছে তাতে। শ্লিপিং সুটটাও রাখা রয়েছে।

ইন্সপেক্টর রায়না খুঁটিয়ে দেখলেন সমস্ত। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আপাতত এই ঘরখানা আমি নিজের 'লক অ্যান্ড কি তে' রাখতে চাই।

—বেশ তো। সুদীপ সম্মতি জানাল।

পার্লারে ফিরে এসে রায়না গেটে পাহারারত কনস্টেবলকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, থানা থেকে তালাচাবি ও শীল করার সামগ্রী নিয়ে আসতে। সুরপতি তখন সেখানে ছিল না। তাকে ডাকা হল। অসম্ভব নার্ভাস ভাব নিয়ে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে সে এল। তার এই হাবভাব কেমন অস্বাভাবিক মনে হল ইন্সপেক্টরের।

রায়না তার খুব কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, তুমি এত ঘাবড়ে গেছ কেন?

—আজ্ঞে, কই, না তো ···ঘাবড়াইনি তো ··

সুরপতি খাবি খেতে লাগল।

—প্রদীপবাবু হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন? এ বিষয়ে কিছু বলতে পার?

- আজ্ঞে আমি আমি কি করে বলব?

- গত পরশুদিন কটার সময় তিনি খেতে গিয়েছিলেন?

- আটটার বোধহয় কিছু আগে।

- তোমার সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছিল?

- খুব ভেবে বল।

- বিশেষ কোন কথা হয়নি। আমার সঙ্গে তিনি কথা তেমন বলতেন না। আধপেটা খেয়ে উঠে পড়েছিলেন। আমি বললাম, কি হল ছোটদাদাবাবু। তিনি বললেন মাথা ধরেছে। খেতে আর ভাল লাগছে না।

—তারপর তিনি নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন?

—তা বলতে পারব না।

তুমি এবার যেতে পার।

সুরপতি চলে যাবার পর রায়না বললেন, লোকটা অত্যন্ত ঘাবড়ে রয়েছে লক্ষ্য করেছেন?

বীরেশ্বর বললেন, তাইতো দেখলাম।

পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে। এখন আমি উঠলাম। দেখি কতদূর কি করে উঠতে পারি। আপনার প্রদীপকে খুঁজে বার করবার ত্রুটি আমি রাখব না জানবেন।

পরের দিন পরিস্থিতি আরো গুরুতর হয়ে উঠল।

দুপুরে থানায় এসে সুদীপ সংবাদ দিল, সকাল থেকে সুরপতিকে পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, বাগানের উত্তরদিকের অংশ কারা যেন তচনচ করে দিয়ে গেছে। তবে কসকটিনা চুরি যায়নি। তার চারা পোঁতা ছিল বাগানের অন্য ধারে।

—কি ব্যাপার বলুন তো ইন্সপেক্টর? কি হচ্ছে আমাদের বাড়িতে। কাকা তো ভেঙ্গে পড়েছেন।

উত্তর দেবার মত জোরাল উত্তর রায়নার কাছে ছিল না। তিনি সুদীপকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে রওনা দিলেন। বীরেশ্বর বাগানে ছিলেন। তাঁর শূন্য দৃষ্টিতে ভাঙ্গা, মোচড়ানো-ওপড়ানো গাছগুলো ধরা পড়ছিল বলে মনে হয় না। রায়না

সেখানে উপস্থিত হলেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বীরেশ্বর হাত প্রসারিত ক'রে বললেন, দেখছেন তো দীর্ঘদিনের পরিশ্রম একজনের খেয়াল খুশিতে কি হয়ে গেছে।

ইন্সপেক্টর চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন। বাগানের কিছু অংশের উপর যেন কোন মত্ত হাতি মাতামাতি করে গেছে। ইঁটের কেয়ারি করা ছিল। তাও উপড়ে গেছে কোথাও কোথাও। গাছগুলো অধিকাংশ ইন্সপেক্টরের পরিচিত। ফুলের গাছ—গোলাপ, রজনীগন্ধা, বেলফুল এই সব।

সুরপতিকে পাওয়া যাচ্ছে না কখন বুঝতে পারলেন ? তিনি প্রশ্ন করলেন।

—ভোর বেলাতেই। ছটায় চা দেয়ই। সময়মত চা এল না দেখে তাকে ডাকাডাকি করলাম। সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর থেকেই তার সন্ধান নেই। গেট পাহারার জন্য যে দুজন কনস্টেবলকে মোতায়েন করা হয়েছিল তারা কাছেই দাঁড়িয়েছিল। রায়না তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ বাড়ির চাকর সুরপতিকে তোমরা দেখেছ। গতকাল রাত্রে বা আজ সকালে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে লক্ষ্য করেছ কি ?

একজন সসম্ভ্রমে বলল, আজ্ঞে না। কাল দুপুরে একবার বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরেছিল ঘণ্টা দুয়েক পরে।

কাল রাত্রে বাগানের মধ্যে থেকে কোন রকম শব্দ তোমরা পেয়েছিলে ?

আজ্ঞে না।

সুদীপ বলল, গেট ছাড়া বাগান দিয়ে বেরুবার আর তো কোন পথ নেই। সুরপতি গেল কোন পথ দিয়ে ?

বীরেশ্বর বললেন, সে নিজে গেল কি তাকে কেউ ধরে নিয়ে গেল, সে বিষয়টা ভেবে দেখবার মত।

রায়না বললেন, গেট ছাড়াও বাগান থেকে বেরুবার অজস্র পথ রয়েছে। বাউণ্ডারি ওয়াল হাত পাঁচেক উঁচু বটে কিন্তু টপকান এমন কিছুই কঠিন নয়। আসুন চারধারটা একটু ঘুরে দেখি।

তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে বাউণ্ডারি ওয়ালের দূরত্ব বেশ কিছুটা। তিনজনে অগ্রসর হলেন। অজস্র নাম না জানা লেবেল লাগান গাছের পাশ দিয়ে প্রাচীরের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এগুতে এগুতে এক জায়গায় তাঁরা থামলেন। সেখানকার শ্যাওলা ধরা জায়গাটায় কয়েকটা ঘষা দাগ।

—দাগগুলো দেখে কি ধারণা হয় ? রায়না প্রশ্ন করলেন।

-সুদীপ উত্তেজিত গলায় বলল, কেউ যে প্রাচীর টপকেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঠিক তাই। হয়ত এই পথ দিয়ে প্রদীপবাবুকে চালান করা হয়েছে।

—বিচিত্র নয়। বীরেশ্বর বললেন, প্রদীপকে নিয়ে যাওয়ার অর্থ না হয় বুঝতে পারা গেল আমাদের ক্ষতি করা। সুরপতিকে গুম করার কি উদ্দেশ্য ?

—সেই অদৃশ্য ব্যক্তিটি এত প্ল্যান করে যখন কাজ করছে তখন ধরে নিতেই হবে

নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে। আচ্ছা সুরপতি আপনার কাছে থাকতে থাকতে গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে নিশ্চয় অনেক কিছু শিখে ফেলেছিল।

—ফেলেছিল বইকি। আমিই তাকে বহু বিদেশী গাছের নাম মুখস্ত করিয়ে দিয়েছিলাম। গাছ চিনিয়ে দিয়েছিলাম।

—এবার চলুন, ওর ঘরখানা একবার দেখে নেওয়া যাক।

পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ঘরখানা পরীক্ষা করেও কোন সূত্র পাওয়া গেল না। দুজন অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার বিচিত্র রহস্যের কথা চিন্তা করতে করতে রায়না বিদায় নিলেন। থানায় যখন তিনি পৌঁছালেন তখন তাঁর মনে প্রচুর অস্থিরতা। আট বছরের চাকরি জীবনে অজস্র তদন্ত তাঁর হাতে এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি সমাধানের কূলে পৌঁছেছেন। কিন্তু এবার—এমন রহস্যজনক ব্যাপারের মুখোমুখি তাঁকে কখনও দাঁড়াতে হয়নি। সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়া দূরে থাক, মূল্যবান একটা সূত্র পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেননি। কি পরিতাপের কথা।

অথচ অপরাধীকে ধরতেই হবে। তাঁর এতদিনের সুনাম এক ফুৎকারে নিভে যাওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বীরেশ্বর একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি। তাঁর ভাইপো অদৃশ্য হয়েছে একথা উপরওয়ালার কানে উঠতে বিলম্ব হবে না। তাঁদের কোন মতেই বোঝান যাবে না সঙ্গত কারণেই অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কৈফিয়ৎ দিতে দিতে নাজেহাল অবস্থায় পড়বেন রায়না। এদিকে শহরেও বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনাটা আর চাপা নেই সাধারণ মানুষের কাছে। চতুর্দিকে এই বিষয় নিয়েই আলোচনা চলেছে।

অফিসে প্রবেশ করেই ইন্সপেক্টর জানতে পারলেন, কলকাতা ও জয়পুর থেকে মেসেজ এসেছে। তাঁর মন কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হল। জয়পুর থেকে আসা মেসেজে তিনি প্রথমে মনোযোগী হলেন। ওখানকার পুলিস জানিয়েছে অনেক অনুসন্ধানের পর রমেশ গোয়েলের সন্ধান পাওয়া গেলেও, তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া যায় নি। বিকানিরের রাজস্থান জিপসন কোম্পানীর তিনি অংশীদার। আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত ভাল। মাস দুয়েক ধরে তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। নিজের কি চিকিৎসা করার জন্য বিকানির থেকে যে তিনি কোথায় গেছেন কেউ বলতে পারে না।

কলকাতা পুলিস জানিয়েছে যে সুবিমল বসাক একজন প্রখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী। টালিগঞ্জ অঞ্চলে তাঁর বাড়ি ও গবেষণাগার। তিনি অবিবাহিত। বাড়িতে একটা ম্যাস্টিক কুকুরকে সঙ্গী করে থাকেন। তাঁর কোন ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধব আছে জানা যায়নি। এমন কি পাড়ার কারুর সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত নেই। বর্তমানে তিনি টালিগঞ্জের বাড়িতে নেই। মাস চারেক হল কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যে গেছেন জানা যাচ্ছে না। তবে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা গেছে যে তিনি এইভাবে মাঝে মাঝে অদৃশ্য হন।

মেসেজে একটা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কেস যদি জটিল বলে মনে হয় তবে

একজনের সহযোগিতা নিলে উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রখ্যাত গোয়েন্দা বাসব বন্দ্যোপাধ্যায় একটা কেস হাতে নিয়ে মোরাদাবাদ গেছেন। সংবাদ পাওয়া গেছে ওখানে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। প্রয়োজন বোধ করলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ওখানকার রেনবো হোটেলে তিনি অবস্থান করছেন।

কথাটা মনে ধরল রায়নার। বাসবের নাম তিনি শুনেছিলেন। একথাও তাঁর জানা ছিল এই উত্তরপ্রদেশের রাণগাঁও-এ এসে বাসব এক দুরূহ হত্যা রহস্যের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল।

তার সহযোগিতা পেলে ভালই হয়। কিন্তু একটা টেকনিক্যাল বাধা তার সামনে দোদুল্যমান রয়েছে। তিনি পুলিসের লোক হয়ে এবং উপরওয়ালার সম্মতি ছাড়া বাসবের সহযোগিতা প্রার্থনা করতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একটা পথ দেখতে পেলেন। বীরেশ্বরকে দিয়ে আমন্ত্রণ জানান যেতে পারে। ভাইপোর জন্য ব্যাকুল বীরেশ্বর এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হবেন।

রায়না তাঁকে কথাটা বলার জন্য ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন।

সন্দীপ সন্ধ্যার কিছু আগে চোপরার আহ্বানে তাঁর বাড়িতে গেল। তিনি তখন বাথরুমে ছিলেন। শেলা সন্দীপকে বসাল। প্রদীপের জন্য তার মনের মধ্যেটাও হু হু করছে। সন্দীপের মুখের দিকে তাকাতে পাচ্ছে না।

সন্দীপ গাঢ় স্বরে বলল, কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল বলত ?

গলা নামিয়ে শেলা বলল, ভাবতে পারা যায় না।

প্রদীপ এখন কিভাবে আছে, কোথায় আছে কে জানে ? সুরপতির সন্ধান নেই। সেই বা গেল কোথায় ? আমি ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

—এত উতলা হয়ো না। আমার মন বলছে সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। প্রদীপ নিশ্চয় ফিরে আসবে আবার !

সেই আশাতেই তো বুক বেঁধে আছি শেলা। প্রাইভেট এনকোয়ারির ব্যবস্থাও হয়েছে। পুলিসের কাছ থেকে ইনফরমেশন পেয়ে একজন বিখ্যাত বেসরকারী গোয়েন্দার সঙ্গে কাকা ট্রাঙ্ককলে কথাবার্তা বলেছেন। তিনি মোরাদাবাদ থেকে কাল এসে পড়বেন। দেখা যাক তিনি কতদূর কি করতে পারেন।

শেলা কিছু বলার আগেই চোপরা এসে পড়লেন।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললেন, তোমাকে ডেকেছি কাল রাত্রের একটা ঘটনা বলবার জন্য। আমি অবাক হয়ে গেছি।

সন্দীপ উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল।

—পুলিসকে বললেই ভাল হত। তুমি তো জান আমি গোলমাল ঝামেলা একেবারেই পছন্দ করি না। পুলিসের আওতায় যাওয়া মানে নিজের জীবনকে বিড়ম্বিত করা। তোমাকে বলছি। তুমি হয়ত এর একটা অর্থ খুঁজে বার করতে পার।

শেলা বলল, কি হয়েছে বাবা ?

—এবার বলছি বেবি। চোপরা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, রাত তখন সাড়ে বারটা হবে আমাকে একবার ছাদে যেতে হয়েছিল। আমার বাড়ি ও তোমাদের বাড়ির মধ্যে আরো দুখানা বাড়ি আছে। সে দুখানা একতলা হওয়ার দরুণ সহজেই আমার দোতলার ছাদ থেকে তোমাদের বাগানের মধ্যেটা দেখতে পাওয়া যায়। ছাদ থেকে নেমে আসছিলাম, হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল—চাঁদের আলো থাকলেও তোমাদের বাগানটা যদিও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না, ঝাপসা অন্ধকারে ঘেরা ছিল. তবু আমি দেখতে পেলাম একজন লোক কাঁধে করে ভারি কিছু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

—বলেন কি ? সন্দীপের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

—তাইতো দেখলাম।

—সে গেল কোন দিকে ?

—তা বলতে পারব না। আমি তাকে বোধহয় সেকেণ্ড তিনেক দেখেছিলাম, তারপরই অদৃশ্য হয়ে যায় গাছের আড়ালে।

—চিনতে পেরেছিলেন তাকে ? সে কি সুরপতি ?

—এতদূর থেকে মুখ চেনা সম্ভব ছিল না। বিশেষ ওই ছায়া ছায়া পরিবেশে। তবে সে একটু ঝুঁকে চলছিল। সুরপতি হলেও হতে পারে।

সন্দীপ চিন্তিত গলায় বলল, আমাদের বাড়িকে ঘিরে ক্রমেই দেখছি রহস্যের জাল ঘন হচ্ছে। সংবাদটা দিয়ে আমায় ভালই করলেন। আমি বাসববাবুকে জানাতে পারব কথাটা।

—তিনি আবার কে ?

—আমরা একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ অ্যাপয়েণ্ট করেছি। তিনি কাল এসে পড়বেন। একটা বিষয় আমি চিন্তা করছি। উনি জানিয়েছেন কাজের সুবিধার জন্য আমাদের বাড়ির বাইরে থাকতে চান। আপনার সন্ধানে কোন খালি বাড়ি আছে কি ?

—খালি বাড়ি... চোপড়া চিন্তা করতে লাগলেন।

শেলা এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার বলল খালি বাড়ি খোঁজার কি দরকার বাবা। ভদ্রলোক তো আমাদের এখানেই থাকতে পারেন।

—এই বাড়িতে....চোপরা একটু দ্বিধা করলেন।

--তিনি একজন বিখ্যাত লোক। আমাদের বাড়িতে থাকলে বরং তাঁর কোন অসুবিধা হবে না।

—বেশ তো, তুমি, যখন বলছ—তাহলে ঐ কথাই রইল সন্দীপ। ভদ্রলোক আমার এখানেই থাকবেন। উনি কি প্লেনে আসছেন ?

—না, অমৃতসর মেলে।

মোরাদাবাদের কাজটা সারতে বাসবের বেশ কিছুদিন লেগে গেল। কেসটা বেশ জটিল ছিল। কাজ শেষ হবার পর শৈবাল বলেছিল, চল এই সুযোগে পাঠান-

কোট ঘুরে আসি। আবার কলকাতা থেকে এধারে কবে আসব তার ঠিক নেই।

তার কথা মেনে নিয়েছিল বাসব। পাঠানকোট রওনা হবার জন্য মালপত্রও বাধা-ছাদা হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় বীরেশ্বরের ট্রাংককল পৌছাল। অন্য কারুর কাছ থেকে আহ্বান পেলে কাজটা গ্রহণ করত না বাসব। বীরেশ্বরের পরিচয় পেয়ে—তাঁর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে এই বিপদে সহযোগিতা না করাটা সে যুক্তিসঙ্গত মনে করল না তাঁকে ভরসা দিল এবং জানিয়ে দিল কোন্ ট্রেনে রওনা হচ্ছে।

মোরাদাবাদ থেকে জালালগড়ের দূরত্ব দশঘন্টার কিছু বেশি। ট্রেনে বিশেষ কষ্ট হয়নি। স্টেশনে সন্দীপ এসেছিল। আন্দাজে ওদের চিনে নিয়ে চোপরার বাড়িতে নিয়ে এল সসম্মানে। চোপরা ও শেলা সমাদরে গ্রহণ করলেন বাসব ও শৈবালকে।

ঘটনাটা সন্দীপের মুখ থেকে শুনল বাসব। শৈবাল লক্ষ্য করল শুনতে শুনতে ওর একাগ্রভাব অন্যমনস্কতায় পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ মনের মধ্যে ঘটনাটাকে বাসব বিশ্লেষণ আরম্ভ করে দিয়েছে! নিজের ছাদ থেকে চোপরা যা দেখেছিলেন সন্দীপ সে কথা বলতেও ভুলল না।

ঘণ্টা দুই পর ওরা বাড়ি থেকে বেরুল। রিক্সায় চেপে থানায় পৌছতে দশ মিনিটের বেশি সময় লাগল না। ইন্সপেক্টর অফিসেই ছিলেন। সকলরবে অভ্যর্থনা জানালেন ওদের। একজন কনস্টেবলকে ডেকে চা আনতে আদেশ দিলেন। কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর বাসব বলল, সন্দীপবাবুর মুখে মোটামুটি ঘটনাটা শুনলাম। ও সম্পর্কে এবার আপনার মতামত জানতে চাই।

সুবিমল বসাক ও রমেশ গোয়েল সম্পর্কে যেটুকু তথ্য জানা গেছে তার বিবরণ দেবার পর ইন্সপেক্টর বললেন, সমস্ত ঘটনাটা আমার কাছে ধোঁয়ার মত মনে হয়েছে। কোন সূত্রই আবিষ্কার করতে পারিনি।

সুবিমল বসাককে কেন্দ্র করে যদি কাঠামো খাড়া করতে হয় তাহলে প্রদীপের অদৃশ্য হওয়ার একটা সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সুরপতি? তাকে হরণ করার উদ্দেশ্য কি?

—এই সম্পর্কে একটা সম্ভাবনার কথা আমি চিন্তা করছি।

—কি বলুন তো?

—সুরপতিকে আমি অত্যন্ত নার্ভাস ভঙ্গিতে দেখেছি। কথাবার্তাও অসংলগ্ন। যেদিন আমি তাকে প্রশ্ন করি তার পরদিন থেকে সে অদৃশ্য। আমার মনে হয় সুরপতি দুষ্কৃতকারীর দলের লোক। প্রদীপকে সরিয়ে ফেলার ব্যাপারে তার সহযোগিতা ছিল। তাই তার ব্যবহারে ওরকম অসঙ্গতি প্রকাশ পেয়েছে। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে শেষে সরে পড়েছে বলে মনে হয়।

বাসব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, আপনার অনুমান হয়ত নির্ভুল। স্টেটমেন্টগুলো একবার দেখাবেন তো।

ড্রয়ার থেকে বীরেশ্বর, সন্দীপ ও সুরপতির জবানবন্দী লেখা ডায়রীটা বার

করলেন ইন্সপেক্টর। বাসব একাগ্র মনে পড়ল। কি যেন চিন্তা করল কয়েক মিনিট।

বলল তারপর, উড়ো চিঠিটা দেখি।

চিঠিটা দিলেন ইন্সপেক্টর।

—এবার চলুন ঘটনাস্থলে অর্থাৎ ডক্টর করগুপ্তর ওখানে যাওয়া যাক।

মনে দুশ্চিন্তার প্রতিমূর্তি হয়ে বসেছিলেন বীরেশ্বর। কয়েক দিনে তাঁর চেহারার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। চিন্তায় চিন্তায় আরো বুড়ো হয়ে গেছেন। ইন্সপেক্টর রায়না বাসব ও শৈবালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। সময়োচিত দুচার কথার পর বাসব বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আপনার ভাইপোকে খুঁজে বার করবার আপ্রাণ চেষ্টা করব কিন্তু তার পরিবর্তে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা আমি চাই। যা প্রশ্ন করব কোন কিছু না লুকিয়ে তার উত্তর দেবেন।

নিশ্চয়। কি জানতে চান বলুন?

—যে গাছের চারা নিয়ে এত গোলমাল, সেই কসকাটিনার বিষয় বলছিলাম। আপনার কি দৃঢ় বিশ্বাস কসকাটিনা পেলে সুবিমল বসাক কোন যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসবেন।

বসাক অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত লোক। বড় কোন কাজ তার দ্বারা হবে বলে বিশ্বাস করা যায় না। আমার ধারণা, এই কীর্তিকলাপ যদি তার হয় তবে সে চারা কোন বিদেশী এম্বাসির কাছে মোটা টাকায় বিক্রি করতে চায়।

—ধরুন একাজ সুবিমল বসাক যদি না করেন। এবার আপনি কাকে সন্দেহ করবেন? এমন আর কেউ আছে কি?

একটু চিন্তা করে বীরেশ্বর বললেন, আরেকটা সন্দেহ আমার মনে ছায়া ফেলেছে। হয়ত –

—কে সে?

—কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়। কোন বিদেশী সরকার। ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি আমি যে বিষয়ের গবেষণায় ব্যস্ত আছি তা সাফল্যজনক ভাবে শেষ হলে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সাহায্যে চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তর আসবে। এ সম্পর্কে গোটা কয়েক প্রবন্ধও লিখেছি বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকাগুলিতে। হয়ত বিদেশী বিশেষজ্ঞদের টনক নড়েছে। তাঁদের মধ্যে হয়ত কেউ কেউ চান না আমার মত অনগ্রসর দেশের কোন লোক এই বিষয়ে সাফল্য লাভ করে। সেই দেশের সরকার তাঁদের এখানকার এম্বাসিকে নির্দেশ দিয়ে থাকতে পারেন আমাকে উত্যক্ত করবার জন্য। যাতে আমি ডাইভার্টেড হয়ে যাই। নিজের গবেষণায় সাফল্যলাভ করতে না পারি। এরকম যে না হয়ে থাকতে পারে তা নয়।

—হুঁ। সুরপতি কতদিন ধরে ছিল আপনার কাছে?

– বছর চৌদ্দ ধরে তো বটেই। একবার বিদেশও গিয়েছিল আমার সঙ্গে।

—সুদীপবাবু বাড়ি আছেন নাকি?

—আছে। নিজের ঘরে আছে।

—বাসব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলুন আপনার বাগানটা একবার ঘুরে দেখা যাক। ভাল কথা, আপনার পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই শোনা হল না। ও বিষয় আমার কিঞ্চিত আগ্রহ রয়েছে।

লন পেরুতে পেরুতে বীরেশ্বর সংক্ষেপে নিজের পারিবারিক ইতিহাস বললেন। চারজনে বাগানের প্রান্ত সীমায় এসে পড়েছিলেন। বাসব চারধার তাকিয়ে দেখল, ইঁটের কেয়ারির মধ্যে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে গাছের সারি লাগান হয়েছে। প্রত্যেকটা গুল্ম জাতীয়। প্রত্যেকের গায়ে লেবেল লাগান। বড় বড় গাছের সংখ্যাও প্রচুর। সেগুলোর গুঁড়ি রং করা। কোনটা লাল, কোনটা কালো।

কিছু দূরের ব্যবধান দিয়ে সুরকি ঢালা সরু পথ রয়েছে গোটা কয়েক। একটা পথ ধরে চারজনে এগিয়ে চললেন। বীরেশ্বর সকলের আগে। তিনি কোন কোন দুষ্প্রাপ্য গাছের পরিচয় দিতে দিতে চলেছেন।

বাসব প্রশ্ন করল, আপনার কসকটিনা কোথায় ?

—সামনে চলুন দেখাচ্ছি।

গজ দশেক আরো যাওয়ার পর বাউণ্ডারি ওয়ালের একাংশ দেখতে পাওয়া গেল। সেখানে কলকে গাছের মত ফিট চারেক লম্বা একটা গাছ রয়েছে। গোটা কয়েক চারাও রয়েছে তার তলায়।

বীরেশ্বর বললেন এই হল কসকটিনা। সোমালিল্যান্ডের দুর্ভেদ্য জঙ্গল থেকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে চারা এনেছিলাম। কয়েক বছরে এতটা বেড়েছে। বাসব গাছটা খুঁটিয়ে দেখল।

গোটা কয়েক চারাও বেরিয়েছে দেখছি।

—অদৃশ্য পত্রলেখক ওই চারাই তো চায়।

—কোন চারা চুরি যায়নি তো ?

—না। চারটে ছিল—এখনও রয়েছে।

বাসব ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে বলল, সেই অদৃশ্য আগন্তুক কোনখান থেকে প্রাচীর টপকে ছিল মিঃ রায়না।

রায়না বললেন, আরো একটু ওধারে যেতে হবে।

সকলে আবার অগ্রসর হলেন।

যেতে যেতে বাসব দেখতে পেল, একটা গাছকে ফিট চারেক উঁচু গ্রীল দিয়ে রাখা হয়েছে। গাছটা খেজুর গাছের মত। তবে লাল রং করা গুঁড়িটা অনেক মোটা। পাতাগুলো আরো বেশি কাঁটাযুক্ত এবং ঘন। এলিয়ে পড়ে আছে মাটির দিকে। উপরটা থালার মত। ইচ্ছা করলে দাঁড়ান যায়।

—এটা কি গাছ ডক্টর করগুপ্ত।

—ঘৃতকুমারী গাছ দেখেছেন তো ? তারই জায়েণ্ট সংস্করণ। একে ম্যাডক্স বলে। ম্যাডাগাস্কার থেকে এনেছিলাম।

ইন্সপেক্টর বললেন, মিঃ ব্যানার্জী, এই দাগটা দেখুন।

বাসব রায়নার আঙ্গুলকে অনুসরণ করল। শ্যাওলা ধরা প্রাচীরের ওই অংশে

গোটা কয়েক লম্বালম্বি ঘসড়ানির দাগ। বাসব এগিয়ে গিয়ে দাগগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল। তারপরই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। ওই দাগগুলোর হাত কয়েক দূরে একটা আমগাছ ছিল। ও অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেই গাছের উপর উঠে পড়ল। ওর কাণ্ড কারখানায় সকলেই হতভম্ব।

কয়েক মিনিট পরে গাছ থেকে নেমে এলে বিস্মিত গলায় ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার গাছে চড়লেন ?

নির্বিকার গলায় বাসব বলল, গাছে চড়ে দেখলাম, প্রাচীরের অপর পার কতটা দেখা যায়।

শৈবালের বুঝে নিতে অসুবিধা হল না, বাসব সত্যের অপলাপ করছে। নিশ্চয় অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ও গাছে উঠেছিল। সকলে আরো কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তচনচ করা ফুলবাগানের কাছে এসে পড়লেন।

বীরেশ্বর বললেন, কি অবস্থা করে গেছে দেখুন।

বাসব বলল, আপনার ফুলের শখও আছে দেখছি।

—আমার না। সুদীপ অবসর সময় এই ফুলবাগানটা গড়ে তুলেছিল। ইন্সপেক্টর ভেবেছিলেন, বাসব সাগ্রহে তচনচ করা ফুলবাগানটা খুঁটিয়ে দেখবে। কিন্তু ওর তেমন আগ্রহ দেখা গেল না।

—ডক্টর করগুপ্ত, আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আপনি লনে গিয়ে বসুন। ইন্সপেক্টর চলুন, প্রদীপবাবুর ঘরখানা গিয়ে দেখে নেওয়া যাক।

ইন্সপেক্টর বাসব ও শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। প্রদীপের ঘরের দরজা শীল করা ছিল। শীল ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকতে হল। সবই আছে, তবু যেন শূন্যতায় ঘরখানা খাঁ খাঁ করছে। বাসব টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে বই খাতা নাড়াচাড়া করল। তীক্ষ্ণ চোখে বিছানাটা পর্যবেক্ষণ করল।

হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল মেঝেতে রাখা কাচের গেলাসটার উপর। ঝুঁকে দেখে নিয়ে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ওতে কি আছে বলে আপনার ধারণা ?

—বোধহয় দুধ।

—দুধ শুকিয়ে গেলে শুধু দাগ থাকে। ভাল করে লক্ষ্য করুন গেলাসে সাদা রংয়ের কিছু গাঢ় পদার্থ লেগে রয়েছে।

ইন্সপেক্টর গেলাসটা হাতে তুলে নিতে যাচ্ছিলেন বাসব বাধা দিল।

—ওভাবে নয়। রুমাল জড়িয়ে তুলতে হবে। গেলাসটা অনেক সূত্রের সন্ধান দিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে।

ও পকেট থেকে রুমাল বার করে তার সাহায্যে সন্তর্পণে গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, দেখুন এবার মনে হচ্ছে না চটচটে গাঢ় কিছু লেগে রয়েছে।

ভাল করে দেখে ইন্সপেক্টর বললেন, তাইতো।

—এটা আমি পরীক্ষা করবার জন্যে নিয়ে যেতে চাই। কাল ফেরৎ পাবেন। চলুন, এবার ফেরা যাক। আমার কাজ শেষ হয়েছে।

—সুরপতির ঘরখানা দেখবেন নাকি ?

—না।

—সুদীপবাবুর সঙ্গে কথা বলবেন না ?

—তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

বাসব বীরেশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নিল।

জীপে স্টার্ট নেবার সময় ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন, কি রকম বুঝলেন ?

গোটা কয়েক প্রয়োজনীয় সূত্র আমার হাতে এসেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন। পরে আপনাকে জানাব। ভাল কথা, সুবিমল বসাকের অনুসন্ধানে লেগে আছেন তো ?

—নিশ্চয়। শহরে নতুন যারা আসছে তাদের উপর খব দৃষ্টি রাখা হয়েছে। স্টেশনে লোক মোতায়েন করেছি। বীরেশ্বরবাবুর কাছে বসাকের ছবি ছিল। তাঁর কাছ থেকে নিয়ে, কপি করিয়ে থানায় থানায় পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত—চলুন আপনাদের নামিয়ে দিয়ে যাই।

সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে শৈবাল বই পড়ছে। বই পড়ছে বললে ঠিক হয় না, বই হাতে নিয়ে উসখুস করছে। তিন ঘন্টার উপর প্রায় একইভাবে বসে আছে এখানে। প্রথমে বই পড়তে ভালই লাগছিল। তারপর বাসব ঘরেই আছে। সুটকেশ থেকে যন্ত্রপাতি বার করে, প্রদীপের ঘর থেকে আনা গেলাস ও উড়ো চিঠিটার কি সমস্ত পরীক্ষা করছে। ইতিমধ্যে শেলা চা জলখাবার দিয়ে গেছে। শৈবাল দক্ষিণ হাতের কাজ সেরে নিলেও বাসবকে ডাকেনি। সে জানে এই সময় ডাকলেই ভীষণ চটে যাবে ও। আধ ঘন্টাটাক আরো কাটবার পর বাসব ওখান থেকে উঠে এল : আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এসে বসল সোফায়।

শৈবাল বলল, আমি তো ভাবলাম ওই ভাবেই তুমি রাতটা কাটিয়ে দেবে বুঝি।

—একা বসে থেকে উত্যক্ত হয়ে উঠেছিলে বুঝি ? শোন ডাক্তার, এক লাফে চারটে সিঁড়ি পার হওয়া হয় তো যায় কিন্তু এক লাফে বিশটা সিঁড়ি পার হতে কাউকে দেখেছ ? এই ক-ঘন্টার চেষ্টায় সেই অসাধ্যসাধন আমি করেছি।

- অর্থাৎ—

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, এতক্ষণ পরিশ্রম করে গোটা কয়েক তথ্য আবিষ্কার করলাম, আর মনের একটা সম্ভাবনাকে মিলিয়ে আমি কেসটার প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পেঁছেছি।

বল কি ! এত তাড়াতাড়ি ?

—আপাতদৃষ্টিতে কেসটা যতই জটিল বলে মনে হোক, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তা নয় ! যদিও দুষ্কৃতকারী পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্য প্রচুর কৌশল অবলম্বন করেছে, তবুও আমি প্রকৃত ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলেছি।

—প্রদীপ আর সুরপতি কোথায় আছে তুমি জান ?

—না। ওই জায়গাটায় শুধু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ডাক্তার, তোমার কি মনে হয়, সুরপতি দুষ্কৃতকারীদের একজন ? প্রদীপ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার

মধ্যে তার হাত আছে ?

—এছাড়া তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আর তো কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রদীপ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর তার কথাবার্তা কেমন অসংলগ্ন হয়ে পড়েছিল ভুলে যেও না। আসলে সে দোষীদের অন্যতম। পুলিসের ভয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল।

—ইন্সপেক্টর রায়নারও এই মত! তোমাদের কথা মেনে নিলে আরেকটা অর্থহীন বিষয় চোখের উপর ধরা দেয় যে ?

কোন বিষয় ?

—তুমি শুনেছ সুরপতির দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া ছিল। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে আশা করা যায় সে কসকটিনা চিনত; তোমাদের কথা অনুসারে সে যদি দুষ্কৃতিকারীদের দলের লোক হয় তবে ও বাড়ি থেকে সরে পড়বার আগে কসকটিনার চারা নিয়ে গেল না কেন? যে ক্ষেত্রে ওই গাছের চরার জন্য এত কান্ড।

শৈবাল ইতঃস্তত করতে লাগল।

বাসব বলল! আবার, ওই কথার জের টেনে আরো দুটো সম্ভাবনার কথা বলা যায়। প্রথম, উড়ো চিঠি দেবার বা প্রদীপকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অত রিস্ক নেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুরপতি সহজেই কসকটিনার একটা চারা সরিয়ে ফেলতে পারত। দ্বিতীয়, ক্ষতি করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে সে বা তার দলের লোকেরা দুষ্প্রাপ্য গাছগুলো নষ্ট না করে দিয়ে, ফুলবাগান তচনচ করে দিয়ে গেল কেন ?

—তাইতো।

—ভাব, খুব মন দিয়ে বিষয়টা ভেবে দেখ ডাক্তার।

—আমার তো সমস্ত গুলিয়ে যাচ্ছে ভাই। শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াল বল ?

—শেষ পর্যন্ত এটুকু নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, সুরপতি দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে —কেউ নয়। সে প্রদীপের মতই বিপদে পড়েছে। থাক্, একথা। এবার বলত, মিঃ চোপরাকে তোমার কেমন লাগল ?

—ভালই !

—তাঁর কোন অসঙ্গতি পাওনি? সেদিন গভীর রাত্রে তিনি কেন ছাদে উঠেছিলেন, একবারও তোমার মনে হয়নি ?

—তোমার বিচিত্র প্রশ্ন! নিজের ছাদে ওঠাটাও সন্দেহজনক ?

—এই রক্ত জমাট করা শীতে রাত দুপুরে নিজের ছাদে ওঠাও সন্দেহজনক বইকি। তাছাড়া লক্ষ্য করেছ তিনি ধনী অথচ তাঁর বাড়িতে কোন চাকর-বাকর নেই।

—আমার কাছে কেমন তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত কিছু খুলে বলবে কি ?

বাসব মৃদু হেসে বলল, ধীরে বৎস, ধীরে—। এত উতলা হয়ো না। আগে

নিজের মনের মধ্যে সমস্ত ঘটনাটা সাজিয়েনি, তারপর নিশ্চয় বলব। তুমি এখন এক কাজ কর। নিচে গিয়ে গল্পের ফাঁদে চোপরাকে কিছুক্ষণ আটকে রাখ। ইতিমধ্যে একটা কাজ আমি দ্রুত সেরে নেবার চেষ্টা করব।

পরের দিন সকালে বাসব একাই থানায় গেল।

কোন রকম ভূমিকা না করে ইন্সপেক্টরকে বলল, এখানে কারুর কাছে পুরো ভলিউম এনসাইক্লোপিডিয়া আছে বলতে পারেন?

ইন্সপেক্টর অবাক।

এনসাইক্লোপিডিয়া।

— বৃটানিকা হলেই ভাল হয়। না পাওয়া গেলে নেলসন চলতে পারে।

এখানে আপনি কোনটাই পাবেন না। লক্ষ্মৌ ও এলাহাবাদে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কি করবেন এনসাইক্লোপিডিয়া নিয়ে?

— বিশেষ দরকার আছে। আজ বিকেলের দিকের কোন গাড়িতে আমি তাহলে লক্ষ্মৌ চলে যেতে চাই। আরেকটা ব্যাপার কিঞ্চিৎ সহযোগিতা করুন। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে আমার কিছু এনকোয়ারী আছে। তার ব্যবস্থা করে দিন।

—একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। ওখানে সব রকম সুবিধা পাবেন। আপনার তদন্তের পদ্ধতিটা কিন্তু বিন্দুমাত্র ফলো করতে পারছি না।

হাল্কা গলায় বাসব বলল, আমি তদন্ত করতে গিয়ে বেশির ভাগ সময় তুচ্ছ বিষয়গুলি নিয়ে প্রথমে নাড়াচাড়া করি। এবং প্রায় ক্ষেত্রে গুরুত্বর সূত্রের সন্ধান পেয়ে যাই। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। লক্ষ্মৌ থেকে ফিরে এসে আপনাকে সমস্ত কিছু জানাব।

বাসব একাই লক্ষ্মৌ গেল।

শৈবালকে বলে গেল চোখ কান খুলে রাখবার জন্য। এর গূঢ় অর্থ বুঝতে না পারলেও সে সতর্ক রইল। অবশ্য লক্ষ্য করবার মত বিশেষ কিছু তার নজরে পড়ল না। সকালে চোপরা কোথায় বেরুলেন। যাবার আগে শেলাকে বলে গেলেন তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে যেন বাড়ি থেকে না বেরোয়। আর হাজার পরিচিত লোক এলেও তাকে পার্লারে বসান হয়। উপরে বা বাড়ির মধ্যে যেন নিয়ে যাওয়া না হয়।

চোপরা চলে যাবার দশ মিনিট পরে সুদীপ এল।

—বাবার কথা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল শেলা। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কপোত-কপোতীর কলগুঞ্জন আরম্ভ হল নিশ্চয়। দোতালার বারান্দা থেকে সমস্তই লক্ষ্য করল শৈবাল। অলস পায়ে ঘরের দিকে ফিরে আসতে হঠাৎ তার মনে হল বাসব সেদিন চোপরাকে নিয়ে গোটা কয়েক কথা বলেছিল। তারপর ছাদে গিয়েছিল কি যেন দেখতে। কি দেখতে গিয়েছিল ও?

তার মনে হল এই অবসরে সেও তো পারে ছাদে একবার ঘুরে আসতে। বাসব কি দেখতে গিয়েছিল হয়ত তার হদিশ পাওয়া যেতে পারে। বারান্দার শেষ প্রান্তে

তেতলার সিঁড়ি। শৈবাল সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। সিঁড়ির উপরের দিকের শেষ ধাপের মুখে দরজা। দরজার ভারি পাল্লা অর্গল বন্ধ। শৈবাল অর্গল মুক্ত করে ছাদে গেল। চোখে পড়ার মত বিশেষ কিছু সেখানে নেই।

এক পাশে পড়ে আছে একটা জীর্ণ চৌকি। জলে ভিজে তার ঐ অবস্থা হয়েছে এক নজর দেখলেই বুঝতে পারা যায়। আর আছে একটি ট্যাঙক। শৈবাল উত্তর দিকের প্রাচীরের ধার ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে আর কোন উঁচু বাড়ি না থাকায় শহরের এক অংশ দেখা যাচ্ছে। ছবির মত দেখাচ্ছে জালালগড়কে। কয়েকদিন আগে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল। ধূলোর আবরণ না থাকায় পাহাড়ের নিকশ কালো রূপ এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার ভাবে। শৈবাল ওখান থেকে সরে এসে ছাদের আর এক প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। সন্দীপের বাগান ঘেরা বাড়িটা মনোরম লাগছে এখান থেকে দেখতে। ইংল্যান্ডের কান্ট্রিসাইডের বাড়িগুলোর ওই ধরনের চেহারা। বীরেশ্বর লনে বসে কি যেন পড়ছেন। আরো মিনিট পনের এধার ওধার করে ছাদ থেকে নেমে এল শৈবাল।

বাসব লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরল পরের দিন বিকেলে। বেশ হাসি হাসি ভাব ওর। দেখেই মনে হয় যে কাজে গিয়েছিল সফল হয়ে এসেছে। এসেই বলল, নতুন কোন খবর আছে ?

· তেমন কিছু নয়।

শৈবাল চোপরার শেলার প্রতি নির্দেশ ও সন্দীপের আসার কথা বলল।

বুঝলে ডাক্তার চোপরা চান না তাঁর বাড়ির ভেতরে কেউ ঢুকুক। আমাদের স্থান দিয়েছেন হয়ত অনন্যপায় হয়ে।

—আসল ব্যাপারটা কি ?

– ব্যাপার হল তিনি চান না তাঁর মাঝরাতে ছাদে যাওয়ার আসল রহস্যটা কেউ জেনে ফেলুক।

তুমি তো হেঁয়ালী আরম্ভ করলে। ঝেড়ে কাশবে কি ?

এই মুহূর্তে কাশতে কিঞ্চিৎ অসুবিধা আছে। তুমি নিচে গিয়ে শেলাকে ডেকে নিয়ে এস।

শৈবাল কয়েক মিনিটের মধ্যে শেলাকে ডেকে নিয়ে এল।

বাসব তাকে বসতে অনুরোধ করে বলল, আপনি নিশ্চয় সমস্ত ধরনের দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন ?

আচমকা এই ধরনের প্রশ্ন শুনে শেলা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

অসংলগ্ন গলায় বলল, আমি নিশ্চয়....। ঘৃণা করি বইকি।

আপনার নিজের লোক – ধরুন সন্দীপবাবু, আমি জানি আপনাদের দুজনের সম্পর্কের কথা, তিনি যদি কোন দুর্নীতিমূলক কাজ করেন আপনি তাঁকে ঘৃণা করবেন ?

হ্যাঁ মানে ... কি হয়েছে বলুন তো ' সন্দীপ কি—

না, তেমন বিশেষ কিছু নয়। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। আপনি এবার

নিচে যেতে পারেন।

চিন্তিত মনে শেলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর মানে কি ?

শৈবালের প্রশ্নে বাসব বলল, সইয়ে রাখলাম। এখানে বসে থাকলেই তুমি প্রশ্নে প্রশ্নে আমাকে অস্থির করে তুলবে বুঝতে পারছি। সুতরাং থানার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

ওদিকে—

থানায় হুলস্থুল পড়ে গেছে। সুশিমল বসাক ধরা পড়েছেন। স্থানীয় যাত্রী-নিবাস হোটেলে তিনি অবস্থান করছিলেন। ইনফর্মারের মুখ থেকে সংবাদ পেয়েই পুলিস হোটেল রেড করে। থানায় পৌঁছাতেই ইন্সপেক্টর রায়না সহর্ষে সংবাদটা পরিবেশন করলেন।

—যাক ইঁদুর শেষ পর্যন্ত কলে পড়ল। বাসব বলল, বসাকের বক্তব্য কি ?

তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। তাঁর বক্তব্য হল আজই তিনি জালাল-গড়ে এসেছেন বীরেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য। তিনি নাকি এতদিন দেরা-দুনের অরণ্যে গাছ-গাছড়ার সন্ধানে ছিলেন। প্রদীপ বা সুরপতির বিষয় কিছুই জানেন না। বীরেশ্বরকে একটা চিঠি লিখেছিলেন ঠিকই। সাক্ষাত করতে যাচ্ছেন এই কথাই তাতে লেখা ছিল আর কিছু নয়। তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারা যায় তিনি ডাহা মিথ্যে কথা বলে গেলেন। বসাকের সঙ্গে দেখা করবেন তো ?

—কি হবে দেখা করে ?

বাসবের কথা শুনে ইন্সপেক্টর ও শৈবাল দুজনেই অবাক।

- আমার আর একটা অনুরোধ আছে ইন্সপেক্টর। বাসব বলল কয়েকজনের হাতের ছাপ আমাকে সংগ্রহ করে দিতে হবে।

কার কার বলুন ?

সন্দীপবাবুর, আপনার, বীরেশ্বরবাবুর, সুবিমলবাবুর ও চোপরার।

রায়না আকাশ থেকে পড়লেন।

আমার। আমার হাতের ছাপ নিয়ে কি করবেন মশাই ?

বাসব মৃদু হেসে বলল, পুলিসের ফিঙ্গার প্রিন্ট অনেক সময় গোয়েন্দাদের দরকার হয় মশাই। সব কথা কাল বলব। এখন উঠি। এস ডাক্তার—

থানার বাইরে এসে বলল, তুমি ফিরে যাও। আমি সন্দীপবাবুর সঙ্গে গোটা কয়েক কথা বলে এখুনি আসছি।

—একটা কথার উত্তর দেবে ?

বল ?

—তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে—

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বাসব বলল, তুমি ঠিকই ধরেছ ডাক্তার কোন কিছুই আমার কাছে আর মিস্ট্রী নেই। আমি সমস্ত কিছু জেনে ফেলেছি। কাল

এই তদন্তের উপর যবনিকা ফেলে দিতে পারব। ওই যে একটা রিক্সা আসছে। তুমি ওটা ধরে নাও। আমি আরেকটার সন্ধান দেখি।

পরের দিন বেলা এগারটার কিছু আগে রায়না ফিঙ্গার প্রিন্টগুলো পাঠিয়ে দিলেন। সমস্ত দুপুর সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত রইল বাসব। শৈবাল কিছুক্ষণ জেগেছিল, তারপর বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল একসময়। ঘুম ভাঙল পাঁচটার পর। বাসব ঘরে ছিল না। আড়মোড়া ভেঙ্গে বিছানা থেকে নামতে যাবে বাসব ঘরে প্রবেশ করে বলল, ডাক্তার তৈরি হয়ে নাও। আমাদের এখুনি বেরুতে হবে।

—কোথায় ?

—থানায়। ইন্সপেক্টরকে ফোন করে এলাম। তিনি আর সকলকে ওখানে জড় করবেন।

থানায় নয়, রায়নার কোয়ার্টারে সকলে একত্রিত হয়েছেন।

বীরেশ্বর, সন্দীপ, চোপরা, শেলা সকলকে রায়না ডাকিয়ে আনিয়েছেন। সুবিমল বসাককেও আনা হয়েছে হাজত থেকে। সকলের মুখেই ঔৎসুক্যের ছাপ, শুধু বসাক অপ্রসন্ন মনে বসে রয়েছেন। এমন কি বীরেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাত হবার পরও একটা কথা বলেননি।

ঘরটি বেশ প্রশস্ত। সকলে বেশ আরাম করেই বসেছেন। রায়নার ইঙ্গিতে চা পরিবেশিত হয়েছে। বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। চেয়ারে বসতে বসতে বলল, বিলম্বের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অন্য একটা কাজ সেরে আসতে হল। আপনারা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন, কাজের কথা আরম্ভ করা যেতে পারে। প্রথমেই আপনাদের জানিয়ে রাখি, কেসের সমাধান আমি করে ফেলেছি এবং

সন্দীপ দ্রুত গলায় বলল, আপনি প্রদীপ ও সুরপতির সন্ধান পেয়েছেন ?

– আপনার জন্য আমার দুঃখ হয় সন্দীপবাবু। কিন্তু ও কথা এখন থাক। আগে আমি মিঃ চোপরাকে একটা প্রশ্ন করি। 'ওয়েল মিঃ চোপরা', আপনি বলেছেন, গভীর রাতে ছাদে উঠে আপনি দেখতে পেয়েছেন বীরেশ্বরবাবুর বাগানে ছায়ামূর্তি ইত্যাদি। ছায়ামূর্তি সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমার প্রশ্ন হল, আপনি গভীর রাতে ছাদে উঠেছিলেন কেন ?

—বিচিত্র প্রশ্ন আপনার। চোপরা উত্তেজিত গলায় বললেন, নিজের ছাদে ওঠার অধিকারও আমার নেই ?

—আছে বইকি। কালটা গরম হলে কোন প্রশ্নই উঠত না। গভীর রাত্রে এই রক্ত জমাট শীতে আপনি ছাদে উঠবেন কেন ? চাকর-বাকর রাখেন না ? কেন অতি পরিচিত লোককেও বাড়ির মধ্যে যেতে দিতে আপনার আপত্তি ?

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে চোপরা বললেন, আপনি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন !!

স্থূল প্রমাণ হাতে না থাকলে এত জোর গলায় আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতাম না। মাঝরাতে আপনার ছাদে যাওয়াটা আমার কেমন ভাল লাগেনি। আপনি

নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চান তাও লক্ষ্য করেছিলাম। ছাদে গেলাম অনুসন্ধান করতে। খুব বেশি কষ্ট আমায় করতে হয়নি! জলের ট্যাঙ্কের মধ্যে পলিথিনের প্যাকেটে মোড়া অবস্থায় হাজার হাজার টাকার নোটের সন্ধান আমি পেলাম। আপনি কর ফাঁকি দিয়ে কালোটাকার পাহাড় করে ফেলেছেন এই সন্দেহে পুলিস যদি কোনদিন বাড়ি রেড করে তাহলে ও টাকার সন্ধান যাতে না পায় তার জন্যই চমৎকার উপায় আপনি উদ্ভাবন করেছিলেন। বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। ইন্স-পেক্টর, আপনি আজই টাকাগুলো উদ্ধার করে আনবেন, আর ইনি তো আপনার ফ্লাটেই রইলেন।

কেউ কোন কথা বললেন না। চোপরাও না। তার দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ। শেলা নির্মম ভাবে নিজের দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছে। ঠেলে আসা কান্নাকে আপ্রাণ ভাবে চেপে রাখার চেষ্টা করছে মনে হয়।

বাসব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আবার বলল, মিস চোপরা, এই কারণেই প্রশ্ন করেছিলাম, নিজের লোকের কোন দুর্নীতিকে আপনি পছন্দ করবেন কিনা। যাক, এবার আসল কথায় আসা যাক। তদন্তভার গ্রহন করবার সময় কেসটা আমার অত্যন্ত জটিল মনে হয়েছিল। তারপর—

বাধা দিল সুদীপ। গলায় অধীরতা ফুটিয়ে প্রশ্ন করল, প্রদীপের কথা আপনি কিছু বলছেন না মিঃ ব্যানার্জী। সে এখন কোথায় আছে?

– বাস্তব সত্য সময় সময় অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে সুদীপবাবু। আপনি যে প্রশ্ন করলেন, তার উত্তর শুধু বেদনাদায়ক নয় হৃদয়বিদারকও বটে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি, তিনি এমন জায়গায় চলে গেছেন যেখান থেকে তাঁকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না।

– কি হয়েছে প্রদীপের।

—তিনি মারা গেছেন সুদীপবাবু। তাকে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে। শুধু তাকে নয়, সুরপতিকেও।

ঘরে যেন শক্তিশালী মেগাটন বোমা ফাটল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন সকলে। প্রদীপ খুন হতে পারে এ কল্পনা কেউ মনের মধ্যে লালন করেনি। সুদীপ আর্তগলায় বললেন, এ আপনি কি বলছেন—

তার গলা বুঁজে এল। নিজেকে রোধ করতে পারল না সে। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

বীরেশ্বর চিৎকার করে উঠলেন, প্রদীপ মারা গেছে! আমি যে ভাবতেও পারছি না। কিন্তু—

– কোন কিন্তু নেই ডক্টর করগুপ্ত। আমি যা বলছি বাস্তবে তাই ঘটেছে। হত্যাকারী অত্যন্ত চতুর। প্ল্যান সে ভালই সাজিয়েছিল। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে যা হয়, এখানেও তাই হয়েছে। অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে গোটা কয়েক স্থূল বিষয় তার চোখ এড়িয়ে গেছে। সেই সূত্র ধরে এগিয়েই আমি তার স্বরূপ জানতে পেরেছি। সুদীপবাবু, আপনাকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা নেই। বিচিত্র

আমার পেশা। দয়া, মায়া, ভব্যতাকে ঊর্ধ্বে রেখে নির্মম ভাবে নিজের কর্তব্য করে যেতে হয়।

বাসব থামল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল, আপনারা জানেন ঘটনাটা গড়িয়েছিল কি ভাবে? ডক্টর করগুপ্ত ফোন পেয়েছিলেন, কসকটিনার চারা ভয় দেখিয়ে চাওয়া হয়েছিল। থ্রেটনিং লেটার এসেছিল। কথামত তিনদিন পরে চারা না পেয়ে প্রদীপকে কৌশলে হরণ করেছিল সেই অদৃশ্য পত্রলেখক। সুদীপবাবু ও ডক্টর করগুপ্তর ধারণা হয়েছিল অদৃশ্য পত্রলেখক ও টেলিফোনকারী সুবিমল বসাক। তিনি উপস্থিত রয়েছেন এখানে। তাঁর বক্তব্য ইন্সপেক্টরের মুখ থেকে আমি শুনেছি। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, ঘটনাটা যে ভাবে প্রচারিত হয়েছে, প্রকৃত ঘটনাটা সে ভাবে ঘটেনি। ডক্টর করগুপ্ত কোন টেলিফোন পাননি। না পেয়েছেন কারুর কাছ থেকে ওই উড়ো চিঠিটা। সবই তাঁর নিজের সৃষ্টি।

ফেটে পড়লেন বীরেশ্বর করগুপ্ত। তাঁর বিশাল চেহারা থর থর করে কাঁপতে লাগল। শিষ্টাচারকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে বলে উঠলেন, ইডিয়টের মত কথা বলবেন না। আমি সমস্ত কিছু সাজিয়েছি। আপনার স্পর্ধার কথা শুনে আমার স্তম্ভিত না হয়ে উপায় নেই।

গালাগাল দিলেও আমি গট আপ কেসকে অন্য কিছু বলতে পারব না ডক্টর করগুপ্ত।

—আর এক মুহূর্ত আমার এখানে থাকা চলতে পারে না।

—ঘর থেকে বেরুতে চাইলেও আপনি সফল হবেন না। ইন্সপেক্টর এতক্ষণে আপনি বোধহয় বুঝতে পেরেছেন অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ও পরিকল্পনার সাহায্যে বীরেশ্বর করগুপ্ত নিজের ভাইপো প্রদীপকে ও সুরপতিকে হত্যা করেছেন।

চেয়ার থেকে ছিটকে পড়লেন বীরেশ্বর।

রক্তবর্ণ মুখে তীব্র গলায় বললেন, আপনার এই উক্তি কত সুদূর প্রসারী হতে পারে জানেন? জানেন আমি একজন ইন্টারন্যাশনাল ফিগার? আমার একটা কলমের আঁচড়ে ভারত সরকার আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর অ্যাকশন নিতে পারেন, এও নিশ্চয় জানেন?

জানি। সব জানি। আপনিও জেনে রাখুন, এ জীবনে সরকারের কাছ থেকে আর কোন সহানুভূতি আপনি পাবেন না।

সুদীপ এগিয়ে বীরেশ্বরের হাত চেপে ধরল।

—কাকা এ তুমি কি করলে?

তাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, কেন আমি প্রদীপ আর সুরপতিকে খুন করব। আমার উদ্দেশ্য কি?

পৃথিবীতে হাজার হাজার মার্ডার যে উদ্দেশে হয়ে থাকে, এখানেও সেই উদ্দেশ্য। 'অর্থ'। বেচারা সুরপতি নিজের ভুলেই বেঘোরে প্রাণ দিল। প্রদীপের পর সুদীপবাবুকে হত্যা করাই আপনার পরিকল্পনা ছিল। রুল অফ থ্রি-র উপর

নির্ভর করে আমি উদ্দেশের কথা বলছি। আপনার ভাগের পৈত্রিক সম্পত্তি আপনার দাদা ঠকিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত অর্পে গিয়েছিল সুদীপবাবু ও প্রদীপের উপর। গবেষণার জন্য অনেক টাকার দরকার। আপনি পরিকল্পনা ছকে নিলেন। ভাইপোরা পৃথিবীতে না থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের সম্পত্তি আপনার হাতে চলে আসবে। গবেষণায় সাফল্যলাভ করবার জন্য এ কাজ আপনি করেছেন সন্দেহ নেই। উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন, আইনের চোখে ক্রাইমের অন্য কোন পরিভাষা নেই, একথা বোধহয় আপনার জানা ছিল না।

এরপর প্রশ্ন উঠতে পারে দু-দুটো মৃতদেহ কোথায় গেল। হত্যা করার পদ্ধতি ও মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলার এমন অভিনবত্ব পৃথিবীতে আর কেউ বোধহয় দেখাতে পারেনি। ম্যাডাগাস্কার থেকে ম্যাডক্স গাছটা আপনি এখানে এনেছিলেন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও উদ্ভিদ জগতের বিস্ময়কর মাংসাসি ম্যাডক্স প্রদীপ ও সুরপতিকে উদরস্থ করেছে। আপনি হয়ত এই ভেবে অবাক হচ্ছেন আমি এত কথা জানলাম কিভাবে। অংক কষার মত আমি ধাপে ধাপে উত্তরের দিকে এগিয়ে গেছি। সমস্ত কথা যথাসময় ইন্সপেক্টরকে জানাব। আপনার বিরুদ্ধে আমি কি প্রমাণ সংগ্রহ করেছি জানতে চান—

—স্টপ—স্টপ ইট। বীরেশ্বর চিৎকার করে উঠলেন। পরমুহূর্তে তাঁর গলায় অনুনয় ঝরে পড়ল, আমায় যেতে দিন আপনারা। আমি—আমি নিজের ল্যাবরেটারিতে ফিরে যেতে চাই—

ইন্সপেক্টর তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি উতলা হবেন না ডক্টর করগুপ্ত। আসুন, আমরা থানায় যাই।

উদাস দৃষ্টিতে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকালেন বীরেশ্বর!

ধীরে ধীরে বসে পড়লেন চেয়ারে আবার।

কেস-এর নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ার পর ঘণ্টা কুড়ি কেটে গেছে। বীরেশ্বর শান্ত ভাবেই হাজতে গেছেন। কারুর সঙ্গে আর একটি কথাও বলেননি। শুধু মাঝে মাঝে নিজের মনে বিড় বিড় করে কি বলছেন। তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে ক্রমেই সন্দিহান হয়ে উঠছেন ইন্সপেক্টর। কালো টাকা রাখার অপরাধে চোপরাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাসবের কথামত জলের ট্যাংকের মধ্যে থেকে টাকা পাওয়া গেছে। টাকার অংক অল্প নয়—আশী হাজার।

গতকাল বাসব কলকাতা রওনা হতে পারেনি। আজ রাত্রের ট্রেনে যাবে স্থির হয়ে রয়েছে। সুদীপ নিজের বাড়িতে ওকে ও শৈবালকে আহ্বান করেছে। ইন্সপেক্টরও এসেছেন। শেলা তো আছেই। বাসবের মুখ থেকে এখন সকলে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনবেন। সুদীপ এখনও যথেষ্ট মিয়মান, প্রদীপের শোক সংবরণ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও এখনও সফলকাম হয়নি। শেলা হাজতে মিঃ চোপরার সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায়নি। মিসেস চোপরা গিয়েছিলেন। তিনি

ফিরে এসে জানিয়েছেন তাঁর স্বামী কৃতকর্মের জন্যে অত্যন্ত অনুতপ্ত।

রায়নার অনুরোধে বাসব আরম্ভ করল, প্রথম সুদীপবাবুর কাছ থেকে সমস্ত শুনে কেসটা আমার অত্যন্ত জটিল মনে হয়েছিল। বিশেষত সুরপতির কার্যকলাপ আমায় ভাবিয়ে তুলেছিল। ইন্সপেক্টর ও ডাক্তার তাকে শত্রুপক্ষের লোক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। আমার মন কিন্তু এই কথায় সায় দেয়নি। বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বাগানটা ঘুরে দেখবার সময় দুটো জিনিস আমার মনে ঘা দিল। আর দুটো জিনিস আগ্রহ সঞ্চার করল। দেখলাম কসকটিনা গাছটা বাউন্ডারি ওয়ালের ধারেই পোঁতা আছে। আর দুষ্প্রাপ্য গাছগুলোর কোন ক্ষতি না করে দুষ্কৃতিকারি ফুলবাগান তচনচ করে গেছে। আমি ভাবতে লাগলাম, সুরপতি যদি বিপক্ষ দলের লোক হয় তাহ'লে এত কাণ্ড বাধাবার কোন দরকারই ছিল না। সে সহজেই সকলের অলক্ষ্যে একটা কসকটিনার চারা তুলে নিয়ে সরে পড়তে পারত। বীরেশ্বর প্রথমে ধরতেও পারতেন না। তাছাড়া ফুলবাগান নষ্ট করে কি লাভ হল?

ইন্সপেক্টর শ্যাওলা ধরা প্রাচীরের দাগের উপর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এখান দিয়েই সুরপতি সরে পড়েছে অনুমান করা গেছে। একটা সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হওয়ায় আমি আম গাছে চড়ে প্রাচীরের উপরটা দেখলাম। প্রাচীরের উপর কোন দাগ নেই। অথচ প্রাচীর টপকাতে গেলে শুধু গায়ে নয় উপরেও দাগ থাকতেই হবে। আমি বুঝতে পারলাম কেউ প্রাচীর টপকায়নি। পুলিসের মনে বিশ্বাস জন্মাবার জন্য প্রাচীরের গা ঘেসে খানিকটা ঘসে রাখা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় ভেতরের লোক কেউ একাজ করেছে। বাড়িতে আছে বীরেশ্বর আর সুদীপ এঁরা—আমার মন সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগল। আরেকটা বিষয় আমার মনে আগ্রহের সঞ্চার করল। ঘৃতকুমারীর মত দেখতে বড় সাইজের একটা গাছকে লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। বীরেশ্বর বললেন, ওর নাম ম্যাডক্স। আমার চিন্তা আরো বিস্তারিত হল। যে কসকটিনাকে নিয়ে এত গোলমাল তাকে কোন লোহার প্রটেকশন দেওয়া হয়নি। অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। অথচ ম্যাডক্স— এই গাছকে এত পাহারার মধ্যে রাখবার দরকার কি?

বাসব থামল। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার বলতে আরম্ভ করল, আস্তানায় ফিরে গিয়ে অনেক ভাবলাম। গেট ছাড়া বেরুবার অন্য কোন পথ নেই। যেখানে পুলিস পাহারা, প্রাচীর টপকানো হয়নি, সুরপতি গেল কোন পথ দিয়ে? তবে কি প্রদীপ আর সুরপতিকে বাড়ির কোন গুপ্ত প্রকোষ্ঠে গুম করে রাখা হয়েছে? কেন? তবে কি সুবিমল বসাকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক? কোন বিশেষ কারণে এই সমস্ত কিছু কি বীরেশ্বর নিজেই করেছেন কিম্বা সুদীপবাবু? অথবা দুজনেই—কিন্তু টেলিফোন, উড়ো চিঠি এগুলো তো হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। বেশ বেকায়দায় পড়ে গেলাম। অগত্যা চিন্তা ছেড়ে উড়ো চিঠিটা পরীক্ষা করতে বসলাম। দুটো ফিঙ্গার প্রিন্ট তার থেকে তোলা সম্ভব হল। স্বাভাবিকভাবে তিনটে আশা করা যায়। একটা যে পাঠিয়েছে,

একটা বীরেশ্বরের, আর একটা ইন্সপেক্টরের। পেলাম দুটো! প্রদীপের ঘর থেকে আনা গেলাসটা পরীক্ষা করলাম। তাতে দুধের পরিবর্তে পেলাম চটচটে এক রকম পদার্থ। গাছের আঠা বলে মনে হল। একটা সম্ভাবনা মাথার মধ্যে নেচে উঠল। থানায় গেলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে ইন্সপেক্টর বললেন, এনসাইক্লোপিডিয়া পেতে হলে লক্ষ্ণৌ বা এলাহাবাদ যেতে হবে। তাঁরই সাহায্য নিয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে গেলাম। সেখানে অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, গত এক বছরের মধ্যে গোটা পনের ট্রাঙ্ককল ছাড়া কোন স্থানীয় কল পাননি বীরেশ্বর। এমন কি নিজেও মাসে তিনবারের বেশি ফোন করেন না কোথাও।

জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে সমস্ত কিছু। গত এক বছরের মধ্যে কোন ফোন পাননি বীরেশ্বর সুতরাং তিনবার উড়ো ফোন পাওয়ার কথা সর্বৈব মিথ্যা। ঘটনাটাকে অন্য লাইটে নিয়ে যাবার জন্য এইভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। বীরেশ্বরই নাটের গুরু। বুঝতে পারলাম উড়ো চিঠিটাও জাল। তিনি নিজেই নিজেকে লিখেছিলেন। এক বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেলেও আরো দুটো প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এক প্রদীপ আর সুরপতিকে কোথায় রাখা হয়েছে বা খুন করা হয়ে থাকলে মৃতদেহ কোথায়? দুই, ওদের গুম করে রাখার বা খুন করার মোটিভ কি? লক্ষ্ণৌ গেলাম। এক রকম বুনো হাঁসের পিছনে ছুটে গেলাম বলতে গেলে। ক্ষীণ সন্দেহকে নির্ভর করে ওখানে গিয়েছিলাম। গভর্ণমেণ্ট লাইব্রেরিতে অনুসন্ধান করতেই জানা গেল, ওখানে এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার সর্বাধুনিক সংস্করণ আছে। টাকা জমা দিয়ে লাইব্রেরিয়ানের সামনে বসে "এম" খণ্ডের "ম্যাডক্স" পাতা উল্টে বার করলাম। গাছটার ইতিহাস পড়তেই প্রদীপ ও সুরপতির ভাগ্যে কি ঘটেছে বুঝতে পারলাম।

"ম্যাডক্স" সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল আপনারাও তা শুনে রাখুন। গাছের উচ্চতা পাঁচ ফুট থেকে আট ফুটের মধ্যে হয়। ঘৃতকুমারী, ও আনারস মিশিয়ে তৈরি গুঁড়ি। কাণ্ডের উপর ব্যাস দেড় ফুট থেকে দু' ফুটের মধ্যে। সেখান থেকে কাঁটা ভর্তি লম্বা লম্বা পাতা বেরিয়ে মাটিতে এসে ঠেকে থাকে। কাণ্ডের মাথা চপচপে গন্ধযুক্ত রসে ভরপুর। সেই রস খেলে জোরাল নেশা হয় এবং ক্রমে জ্ঞান লুপ্ত হয়। ম্যাডাগাস্কারে এই গাছটির সন্ধান পেয়েছিলেন কার্ল রিচি ও হেনড্রিক। তাঁরা এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করেছেন। ম্যাডাগাস্কারে আদিম অধিবাসী মিকোডানদের মধ্যে তাঁরা দুজন কিছুদিন ছিলেন। মিকোডানরা একটা গাছকে দেবতার মত পূজা করে তাঁরা শুনেছিলেন। একদিন সেই গাছের সামনে একজন অপরাধীকে বলি দেওয়ার দৃশ্য দেখতে গেলেন। আদিম অধিবাসীরা দল বেঁধে একটি তরুণী নিয়ে গিয়েছিল সেখানে। তাকে সেই গাছের চটচটে রস খাওয়ান হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে জ্ঞান হারালে তার দেহ চাপিয়ে দেওয়া হল কান্ডের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল। গাছের লুটিয়ে পড়া কাঁটাযুক্ত পাতাগুলো তরুণীকে সাপটে ধরল। কিছু রক্ত কাঁধ গড়িয়ে পড়ল এধার ওধার দিয়ে। রিচি ও হেনড্রিক বুঝলেন, তরুণীকে ধীরে

ধীরে উদরস্থ করছে ওই ভয়ংকর গাছ। তারা মাংসভুক গাছের নামকরণ করেছিলেন ম্যাডক্স

বাসব থামতেই ইন্সপেক্টর উত্তেজিত গলায় বললেন, ওই ম্যাডক্স গাছটার সাহায্যে প্রদীপবাবু ও সুরপতিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন করগুপ্ত।

—অবিশ্বাস্য মনে হলেও কথাটা সত্যি। প্রথমে ওই গাছের রস দুজনকে খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলা হয়েছিল। প্রদীপবাবুর ঘর থেকে পাওয়া গেলাসে তার চিহ্ন আমি পেয়েছি।

সুদীপ বলে উঠল, কি ভয়ানক।

বাসব মৃদু হেসে বলল, পৃথিবী বিচিত্র জায়গা সুদীপবাবু। স্বার্থের জন্য পারি না আমরা এমন কাজ নেই। পরের কথাটা এবার শুনুন, লক্ষ্মৌ থেকে ফিরে সকলের হাতের ছাপ সংগ্রহ করলাম। উড়ো চিঠিটায় পাওয়া দুটো হাতের ছাপের সঙ্গে ইন্সপেক্টরের হাতের ছাপের মিল হল। অর্থাৎ প্রমাণ হয়ে গেল তৃতীয় কোন ব্যক্তি চিঠিটা পাঠায়নি। আরো একটা খটকা দূর করার জন্য আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করে জেনে নিলাম, টেলিফোন যে দুবার আসে আপনি সেখানে ছিলেন কি না? আপনি আপনার কাকার মুখ থেকে টেলিফোনের কথা শুনেছেন। আপনার উপস্থিতিতে কিছু হয়নি।

শৈবাল বলল, মিঃ চোপরার বাড়িতে একবার ফোন করা হয়েছিল কেন?

—ঘটনাকে আরো সঙ্গীন করে তোলা আর কি? পুলিসকে বুঝিয়ে দেওয়া সুবিমল বসাক বা আর কেউ সত্যিই একাজ করেছে।

—বীরেশ্বরবাবুর পরিকল্পনা ছিল প্রদীপ ও সুদীপবাবুকে খুন করা। তবে তিনি কেন সুরপতিকে খুন করলেন?

—সেই কথায় এবার আসছি। মোটিভের কথাটা আগে শুনে নাও। বীরেশ্বর-বাবুর মুখেই আমি তাদের পারিবারিক ইতিহাস শুনেছিলাম। তিনি হত্যাকারী এ সম্বন্ধে স্যাঙ্গুইন হবার পরই, মোটিভ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তার পৈতৃক অর্ধেক সম্পত্তি তার দাদা করায়ত্ব করেছিলেন। দাদার মৃত্যুর পর স্বাভাবিক ভাবেই সমস্তটা অর্পে গেছে ভাইপোদের উপর। নিশ্চয় তার অনেক টাকার দরকার হয়ে পড়েছিল। গবেষণার জন্যই বোধহয়। পরিকল্পনাটি খাড়া করলেন। নিজে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকার জন্য কসকটিনার মাধ্যমে সমস্ত ব্যাপারটাকে অন্য লাইটে নিয়ে গেলেন। সুরপতির মুখ থেকে জানা গেছে প্রদীপ সেদিন কিছু অসুস্থতা বোধ করছিল। কাজেই ওষুধের অজুহাতে ম্যাডক্সের রস খাওয়ান তাকে তার শক্ত হয়নি। এরপর সঙ্গাহীন প্রদীপকে মাংসভুক গাছের সাহায্যে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। সুদীপবাবুকেও ওই ভাবে পৃথিবী থেকে যেতে হত। গোলমাল করল সুরপতি। তার অত্যাধিক নার্ভাসনেস ও অসংলগ্ন কথাবার্ত্তার একটা অর্থ আমি বার করতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস বীরেশ্বর যখন প্রদীপের দেহ বয়ে নিয়ে বাগানে যাচ্ছিলেন সুরপতি দেখে ফেলেছিল। সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ায় তার হাব ভাব ওরকম হয়ে পড়েছিল। বীরেশ্বর ব্যাপারটা আঁচ করে ফেললেন। তার ভয় হল সে হয়ত পুলিসকে বলে দিতে পারে কাজেই সুরপতি বেঁচে থাকা

অধিকার হারাল। তার দেহ যখন ম্যাডক্সের দিকে বীরেশ্বর বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন—নিজের ছাদ থেকে মিঃ চোপরা দেখতে পান। ছায়া ছায়া ভাব থাকায় চিনতে পারেননি। সুবিমল বসাক এসমস্ত ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানেন না। তিনি সত্যিই বীরেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমার কথা শেষ হয়েছে। আপনারাও পরিষ্কার ভাবে সমস্ত কিছু বুঝতে পেরেছেন বোধহয়? এবার আমাদের উঠতে হবে। ট্রেনের সময় হয়ে এল প্রায়।

বাসব উঠে দাঁড়াল। আর সকলেও আসন ত্যাগ করলেন।

ইন্সপেক্টর বললেন, আপনার তীক্ষ্মবুদ্ধির প্রশংসা করে আপনাকে ছোট করতে চাই না। একটা অনুরোধ রাখবেন, আজকের দিনটাও থেকে যান না।

—আপনার অনুরোধ রাখতে পারলে আমি সুখী হতাম মিঃ রায়না। উপায় নেই, আজকে কলকাতায় ফিরতেই হবে।

ইতঃস্তত করে সুদীপ বলল, কিন্তু…

—কি বলুন তো?

—পেমেন্টের কথা বলছিলাম।

বাসব মৃদু হেসে বলল, ব্যস্ততার কি আছে। সুবিধামত আমার কলকাতার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। মিস চোপরা, আমরা বোধহয় এবার এগুতে পারি?

—আসুন।

শেলাকে অনুসরণ করে সকলে মিঃ চোপরার বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন।

তরঙ্গে তরঙ্গে

বেলা তখন সাড়ে আটটা।

শীতের সকাল।

বাসব নিজের হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়ির বাইরের ঘরে বসে সিগারেটে রিং রচনায় ব্যাপৃত ছিল। দিনকয়েক আগে ও একটা হত্যা-রহস্যের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। ইচ্ছে ছিল শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার বাইরে ঘুরে আসবে কয়েকদিন, কিন্তু শৈবাল ছুটি সংগ্রহ করতে না পারায়, পরিকল্পনাটি সুষ্ঠু রূপ নিতে পারেনি।

বাসব শেষবারের মত সিগারেটে টান দিয়ে টুকরোটা ফেলে দিল অ্যাসট্রেতে। ওয়াল ক্লকের দিকে তাকাল, আটটা পঁয়ত্রিশ। এখনও শৈবালের দেখা নেই কেন?

ওর চিন্তাকে উপহাস করেই ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করল।

—ডাক্তার, আজ এত লেট যে?

শৈবাল বসতে বসতে বলল, তোমার মত তো আর ঝাড়া হাত-পা নই। সংসারী মানুষ, কতরকম ঝামেলায় ব্যস্ত থাকতে হয়।

—ঝামেলা? দাম্পত্য কলহে ব্যস্ত ছিলে নাকি?

—দাম্পত্য কলহে যে কি নিদারুণ মিষ্টতা আছে, তা তুমি কি বুঝবে। একবার বিয়ে করেই দেখ না?

বিয়ে !!!

কথা দিচ্ছি ঘটক বিদায় নেব না।

কোন গোয়েন্দাকে কখনও বিয়ে করতে শুনেছ? শার্লক হোমস প্রভৃতি কাল্পনিক গোয়েন্দাদের কথা বাদ দিয়ে, সত্যিকারের কোন বিখ্যাত গোয়েন্দাকে বরের পিঁড়িতে সহজে উঠতে দেখবে না। সাম্প্রতিক কালে এরকম চেষ্টা একজন করেছিল কিন্তু শেষকালে নিজের বৌয়ের হাতে গুলি খেয়েই মারা পড়তে হল বেচারাকে।

— কি রকম?

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আমেরিকার সুবিখ্যাত বেসরকারী গোয়েন্দা আলফ্রেড গ্রের নাম শুনে থাকবে। গ্রের কর্মকেন্দ্র ছিল নিউইয়র্ক। ভদ্রলোক বহু জটিল তদন্ত দ্রুত সমাধান করেছিলেন। চোর, ছ্যাঁচড়, গুণ্ডা, খুনীদের কাছে তিনি বিভীষিকারূপে বিরাজিত ছিলেন। এ হেন গ্রের সঙ্গে টাইম স্কোয়ারের মোড়ে সাক্ষাত হল একদিন লিডিয়া চ্যাপস্যানের। প্রথম সাক্ষাতেই রং ধরল এবং পরের হপ্তায় বিয়েও হয়ে গেল দুজনের। তারপর কি হল জান? বিয়ের পরের দিন গভীর রাত্রে ঘুমন্ত গ্রেকে গুলি করে মারল লিডিয়া।

—কেন ? এভাবে মারার উদ্দেশ্য ?

— উদ্দেশ্য খুবই জোরাল ছিল। গ্রের চেষ্টাতেই নাকি লিডিয়ার বাবা নোট জাল করার অপরাধে ধরা পড়ে এগার বছরের জন্য জেলে যেতে বাধ্য হন। তারই প্রতিশোধ নেবার জন্যে লিডিয়া এইরকম পরিকল্পনা করে গ্রেকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে হত্যা করে। অবশ্য লিডিয়া তার প্রকৃত নাম নয়। কাজেই বুঝতে পারছ

আমাদের দেশটা আমেরিকা নয়। শৈবাল আলোচনার মোড় ঘোরাল। তুমি আজকের কাগজ পড়েছ—

না। ওই খাড়াবড়ি থোড় রোজ আমার ভাল লাগে না। সংবাদে কোন বৈচিত্র না থাকলে আমার কাছে সংবাদপত্র সম্পূর্ণ অর্থহীন ডাক্তার।

আজকের কাগজে তোমার মনের মত একটা সংবাদ আছে।

তাই নাকি ? কোথায়, দেখি ?

শৈবাল টিপয়ের উপর থেকে আনন্দবাজারখানা তুলে নিয়ে, তৃতীয় পাতার এক জায়গায় আঙ্গুল নির্দেশ করে বলল, পড়ে দেখ।

বাসব বলল, তুমিই পড়, শুনি।

শৈবাল অনুচ্চ গলায় পড়ল : গতকাল রাত্রে রবীন্দ্র সরোবরে একটি সাঁকোর ওপর দক্ষিণ কলকাতার ধনাঢ্য নাগরিক শৈলবিকাশ চৌধুরীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মস্তকে গভীর ক্ষত বিদ্যমান। কে বা কাহারা তাঁহাকে এইভাবে হত্যা করিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। সংবাদে প্রকাশ, গতকাল প্রায় এগারটার সময় তিনি একটি বিবাহ উৎসবে যোগ দিয়া নিজের গৃহ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, পথেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। জোর তদন্ত চলিতেছে।

—হুঁ। বড়লোক হওয়ার অনেক ঝামেলা। সংবাদটি ছোট হলেও গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যেটুকু আমরা জানতে পারলাম, তাতে কোন ব্যতিক্রম তোমার চোখে পড়ছে কি ?

—ব্যতিক্রম ? কই না !

ব্যতিক্রম আছে বইকি। বেশ, আমি বলছি শোন। শৈলবিকাশ চৌধুরী একজন ধনী লোক, তাঁর নিশ্চয়ই মোটরকার আছে। অথচ তিনি নির্জন লেকের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন, কেন বলতে পার ? যদি কিছুক্ষণের জন্যে ধরে নেওয়া যায় তাঁর গাড়ি ছিল না, তবু তিনি পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরবেন কেন ? লেকের মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন অনুমান করা যায় সার্দার্ন এভিনিউয়ের কোন বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি হয় টালিগঞ্জ ব্রীজের দিকে যাচ্ছিলেন, নয়তো ঢাকুরিয়া বা যাদবপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। কাজেই তাঁর গন্তব্যস্থল কাছাকাছি ছিল না। এক্ষেত্রে গাড়ি না থাকলেও তিনি ট্যাক্সির সাহায্যে বাড়ি ফিরবেন, তাই নয় কি ডাক্তার ?

— তাই তো। তুমি কি বলতে চাও ভদ্রলোকের গাড়ি রাস্তায় অপেক্ষা করছিল, তিনি অন্য কোন কারণে ওখানে গিয়েছিলেন ?

—আমার ধারণা, যে কোন উপায়ে কেউ তাঁকে ওখানে নিয়ে যেতে বাধ্য

করেছিল।

বাহাদুর এসে সংবাদ দিল, বাইরে একজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। বাসব তাঁকে এখানে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দীর্ঘকায় দৃঢ়দেহী এক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন।

বাসব তাঁকে বসতে অনুরোধ করল।

ভদ্রলোক কোচে বসে পড়েই বললেন, আমি ইন্সিওরেন্স ডিপার্টমেণ্টের পক্ষ থেকে আসছি।

—আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন ?

—আপনিই কি বাসব বন্দ্যোপাধ্যায় ?

বাসব মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

—আমার নাম তাপস দত্ত। বিশেষ প্রয়োজনেই আপনার কাছে আসতে হল।

—বলুন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি ?

আজকের কাগজে শৈলবিকাশ চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন ? আমি সেই সম্পর্কেই এসেছি। উনি আমাদের ডিপার্টমেণ্টের একজন প্রথম শ্রেণীর মক্কেল ছিলেন। এক লক্ষ টাকা বীমা ছিল তাঁর।

বাসব শৈবালের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, এখন ওই টাকাটা আপনাদের শৈলবিকাশ চৌধুরীর নমিনিকে দিতে হবে, তাই না ?

—কিন্তু টাকাটা দেবার আগে আমরা এই হত্যারহস্যের মীমাংসা চাই। এইভাবে যদি আমাদের বড় বড় মক্কেলরা খুন হতে থাকেন, তাহলে আমাদের কিরকম আর্থিক সংকটে পড়তে হবে তা নিশ্চয়ই আপনি অনুমান করছেন ? এই কেসটিতে আমরা আপনার ওপরই নির্ভর করতে চাই। অবশ্য আপনার যা দক্ষিণা, তা আমরা দেব।

—বেশ, আমার আপত্তি নেই। কাজ তাহলে এখুনি আরম্ভ করা যেতে পারে ?

—নিশ্চয়ই।

—প্রথমে আপনি আমাকে পুরো ব্যাপারটা বলুন। অর্থাৎ এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আপনার যা জানা আছে।

তাপস দত্ত বললেন, আপনারা কাগজে যা পড়েছেন তার চেয়ে এক বর্ণ বেশি আমার জানা নেই। রাত সাড়ে তিনটের সময় সৌর্যবিকাশের ফোন পেয়ে আমি মিস্টার চৌধুরীর বাড়ি যাই। সেখানেই ব্যাপারটা আমি জানতে পারি।

—সৌর্যবিকাশ কে ?

—শৈলবিকাশ চৌধুরীর ছোটভাই।

—মিস্টার চৌধুরী হত হয়েছেন একথা প্রথমে কে জানতে পারে ?

—বিটের কনেস্টবল। সেই থানায় খবর দেয়। মিস্টার চৌধুরীর পকেটে ভিজিটিং কার্ড ছিল, কার্ড থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে পুলিসের পক্ষ থেকেই বাড়িতে খবর দেওয়া হয়।

—মিস্টার চৌধুরীর বাড়িতে কে কে আছেন ?

ওঁর স্ত্রী রত্নমালা, দুই ভাই সৌর্যবিকাশ ও চন্দ্রবিকাশ।

—আপনাকে এত তাড়াতাড়ি খবর পাঠান হয়েছিল, কেন বলতে পারেন?

—আজ পনের বছর ধরে আমি চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে আমার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। সেই সূত্রেই তিনি আমার থ্রু দিয়ে বীমা করিয়েছিলেন।

—আপনাকে আমি আর দুটো প্রশ্ন করব। প্রথম মিস্টার চৌধুরীর কত বয়স হয়েছিল। আর দ্বিতীয় তাঁর নমিনি কে?

—সাঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়েছিল তাঁর। ছোটভাই চন্দ্রবিকাশ চৌধুরীই তাঁর নমিনি। উঠে দাঁড়ালেন তাপস দত্ত।—আমি এবার নিশ্চয়ই যেতে পারি?

—হ্যাঁ, আপনি এখন যেতে পারেন। তবে আমার কথা পুলিসকে জানিয়ে রাখবেন। আর মিস্টার চৌধুরীর ঠিকানাটা দিয়ে যান।

—বেশ।

পকেট থেকে নিজের ঠিকানা লেখা কার্ড বার করে তার পিছনে শৈলবিকাশ চৌধুরীর বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়ে মিস্টার দত্ত বললেন আমার ঠিকানাটাও রইল।

তিনি বিদায় নিলেন।

বাসব কার্ডটা তুলে ধরে বলল, আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি, মৃত মিস্টার চৌধুরীর বাড়ি যাদবপুর অঞ্চলে।

আমি ভাবছি—শৈবাল বলল, স্ত্রী বর্তমান থাকতে ভদ্রলোক নিজের ছোটভাইকে নমিনি করলেন কেন?

—ভাল একটা পয়েন্টের ওপর তুমি মাথা ঘামাচ্ছ দেখে খুশি হলাম। চল এখন বালিগঞ্জ থানা থেকে ঘুরে আসা যাক।

অফিসার ইনচার্জের সঙ্গে আলাপ ছিল না বাসবের।

কিন্তু পরিচয় দিতেই, অত্যন্ত পরিচিতের মত আহ্বান জানালেন ও.সি অশোক রায়।

—কি সৌভাগ্য—আপনি!—ভাবছিলাম আমিই যাব আপনার কাছে। এই মাত্র ডি. সি'র কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে ইন্সট্রাকশন পেলাম।

বাসব বলল, তাহলে তো আর কিছু বলার রইল না। এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যেতে পারে। কি রকম বুঝছেন?

—টাকার লোভেই কেউ তাঁকে খুন করেছে।

—কি রকম?

—মৃত মিস্টার চৌধুরীর হাতের হীরের আংটি ও ঘড়ি অদৃশ্য হয়েছে। ওর সঙ্গে ওয়ালেটটাও পাওয়া যাচ্ছে না।

—হুঁ। ওয়ালেটে কত টাকা ছিল কিছু জানেন?

মিসেস চৌধুরীর মুখে শুনলাম শ' আস্টেক টাকা ছিল।

—কোন সূত্র পেয়েছেন?

সূত্রের মধ্যে কেবল একটা রিভলবার পাওয়া গেছে। মৃতদেহের হাত অনেক দূরে পড়েছিল। রিভলবারটি মিস্টার চৌধুরীরই।

—কোন ছাপ পাওয়া গেছে রিভলবারে?

—না। বোধহয় দস্তানা পরে ছোঁড়া হয়েছিল। চেম্বারে পাঁচটা গুলি আছে। একটা মিস্টার চৌধুরীর ওপর ব্যবহার করা হয়েছিল।

বাসব চিন্তিত ভাবে টেবিলের ওপরকার পেপারওয়েটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল খানিক, তারপর বলল, গুলি লেগেছে কোথায়?

—ডান দিকের কপালে।

—আচ্ছা, তাঁর পকেটে আর কোন কাগজপত্র ছিল?

—না! বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার আগে, ড্রেস আপ হবার সময় মিসেস চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। তিনি জোর দিয়েই বললেন, ওয়ালেট ও রিভলবার ছাড়া আর কিছু নেননি মিঃ চৌধুরী।

—সব সময়ই কি তিনি নিজের কাছে রিভলবার রাখতেন?

—হ্যাঁ।

বাসব অশোক রায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কিন্তু মার্ডারের মোটিভ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। অবশ্য অস্বীকার করছি না, হত্যাকারী মিস্টার চৌধুরীর ঘড়ি, আংটি ও টাকা নেয়নি। কিন্তু ওই সঙ্গে আরো কোন গভীর উদ্দেশ্য তার সাধিত হয়েছে।

—কিসের ওপর নির্ভর করে আপনি একথা বলছেন?

—তার আগে আমায় জেনে নিতে দিন মৃতদেহ কি পজিশনে পড়েছিল।

—ব্রীজের রেলিংটার ফুট খানেক এধারে পাশ ফিরে পড়েছিলেন মিস্টার চৌধুরী। ক্ষতস্থানটা মাটির দিকে ছিল।

—তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে খুব বিপর্যস্ত ভাব ছিল?

—না।

—তাহলেই দেখুন, চোরের যদি চুরি করাই উদ্দেশ্য হত, তাহলে সে সহজেই মিস্টার চৌধুরীকে আহত করে টাকাকড়ি নিয়ে সরে পড়তে পারত। অযথা কে আর খুন করার রিস্ক নিতে চায় বলুন। এক্ষেত্রে আরো একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে। রিভলবারটা মিস্টার চৌধুরীর ছিল, অথচ হত্যাকারী অস্ত্রটা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিল কোনরকম ধবস্তাধবস্তি না করেই। ধবস্তাধবস্তি হলে পোশাক-পরিচ্ছদে একটা বিপর্যস্ত ভাব থাকত। তাই নয় কি?

—আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে....

—এখন আমি জোর দিয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে আমার নিশ্চিত ধারণা, চুরি হত্যার আসল উদ্দেশ্য নয়—হত্যার মোটিভকে হাল্কা করার জন্যে ওই ধাঁধার সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন আমাদের সবচেয়ে আগে কি নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে জানেন? যখন অনুমান করা যাচ্ছে রিভলবারটা পকেট থেকে বার করবার সময় হত্যাকারীর সঙ্গে মিস্টার চৌধুরীর কোন রকম ধবস্তাধবস্তি হয়নি, তখন এটাই ভেবে

নিতে হবে যে তিনি নিজেই ওটা বার করেছিলেন। কেন? আর কি ভাবেই বা ওটা হত্যাকারীর হাতে গিয়ে পড়েছিল।

— অশোক রায় বললেন, আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রশংসা আমি সর্বত্র শুনেছি। প্রথম সাক্ষাতেই আজ আর কিছুটা নমুনা পেয়ে আনন্দিত হচ্ছি।

বাসব অল্প একটু হাসল। বলল, আপনার যদি সময়ের অভাব না হয়, তাহলে এখন একবার আমাদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে গেলে বিশেষ উপকৃত হব।

—বেশ তো। চলুন।

আরেকটা কথা, মিঃ চৌধুরীর রিভলবারটা একদিনের জন্যে আমাকে ধার দিতে হবে।

অশোক রায় বললেন, যদিও আমরা রিভলবারটা পরীক্ষা করে দেখেছি—ওতে আর কিছু দেখার নেই, তবু আপনার কথা স্বতন্ত্র—

তিনি ড্রয়ার থেকে কাগজে মোড়া অস্ত্রটা বার করে বাসবের হাতে দিলেন।

থানা থেকে বেশ কিছুটা দূরে ঘটনাস্থল।

নিজের জীপেই অশোক রায় বাসব ও শৈবালকে ওখানে নিয়ে গেলেন।

সেখানে দুজন কনেস্টবল মোতায়েন ছিল। সাঁকোর ওপরকার টালির রাস্তার এক জায়গায় রক্তের ছোপ লেগে রয়েছে।

ইন্সপেক্টর বললেন, এখানেই পড়েছিলেন শৈলবিকাশ চৌধুরী।

বাসব খুঁটিয়ে দেখল জায়গাটা। হাজার হাজার লেক ভ্রমণকারীর পদদলিত সাঁকোটি অবশ্য এখন বেশ পরিষ্কার অবস্থায় রয়েছে। বাসব সাঁকোর লোহার রেলিং ভাল করে দেখে বলল, সম্প্রতি রং করা হয়েছে। আচ্ছা, এই দাগটা কিসের বলুন তো?

রেলিং-এর ওপরে এবং অপর পারের নিচের বিটে ইঞ্চিখানেক চটা ওঠা দাগ। অশোক রায় দাগটা ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, রঙমিস্ত্রিদের বুরুশের ঘায়ে দাগটা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়।

বাসব কিছু বলল না। কয়েকবার এমুড়ো-ওমুড়ো চক্কর দেওয়ার পর, ও নিচেকার ঘাস-জমিটায় নামল। সাঁকো এখানেই শেষ হয়ে গেছে। কয়েকটা গাছ পর পর। দূরে লিলিপুলের কাছে মোটরকারের সমারোহ। বাচ্চাদের নিয়ে অনেকেই এসেছেন ওখানে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলল বাসব।

হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল কেয়া ঝাড়ের সামনেকার ঘাস-জমিটার ওপর। ইঞ্চি-দেড়েক লম্বা কি একটা পড়ে রয়েছে না? বাসব এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল সেটা। দেখলে রবার বলে মনে হয়, কিন্তু রবার নয়। অথচ চামড়া হিসেবে ধরে নিতেও মন চায় না। পাতলা ছিপছিপে বস্তুটি। একদিকের রং চকোলেট, অপর দিকটা গোলাপের গায়ের মত বিচিত্র রেখায় রেখায় সমাকীর্ণ।

বাসব চিন্তিত ভাবে কুড়িয়ে নিয়ে সেই অমূল্য সম্পদ (!) নিজের পকেটে রাখল।

আবার সাঁকোতে ফিরে এল। বলল, ব্রীজ আর জলের মধ্যেকার ডিফ কতখানি বলে আপনার ধারণা ?

ইন্সপেক্টর বললেন, ফুট দশেক হবে।

—হুঁ। চলুন যাওয়া যাক। এখানকার কাজ আমার শেষ হয়েছে ল মর্গে যেতে চাই। ডেডবডি না দেখলে কাজের অনেক অসুবিধা হবে।

—চলুন।

অশোক রায় জীপের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাসব ও শৈবাল তাঁকে অনুসরণ করল।

এরপর লম্বা যাত্রা শুরু হল। দক্ষিণ থেকে প্রায় উত্তর কলকাতা।

টেবিলের ওপর শোয়ান ছিল শৈলবিকাশ চৌধুরীর মৃতদেহ।

বিরাট হলটার চতুর্দিক থেকে ছুটে আসা চাপ চাপ উৎকট গন্ধ ওদের যেন ঘিরে ধরল। বাসব ভাল করে দেখল মৃতদেহটা। উচ্চতায় সাড়ে পাঁচ ফুটের কিছু বেশি ছিলেন মিঃ চৌধুরী। দোহারা গড়ন। সুছাঁদ মুখের গড়ন। মৃত্যুর হিম শীতলতায় মুখের ভাব কিছু পরিবর্তন হলেও, বুঝতে প্যারা যায় ভদ্রলোক সুশ্রী ছিলেন। আসল বয়স জানা না থাকলে মনে হত পঁচিশের কোঠা তিনি বুঝি পার হননি।

ডান কপালে আড়াআড়ি ভাবে একটা ক্ষত। দেখতে খুব ভয়াবহ হলেও ক্ষত খুব গভীর নয়।

বাসব শৈবালের দিকে ফিরে বলল, উণ্ড সবন্ধে তোমার কি অভিমত ডাক্তার ?

শৈবাল ঝুঁকে একমিনিট প্রায় ক্ষতটা পরীক্ষা করল। তারপর বলল, খালি চোখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, গুলি মাথার মধ্যে নেই, কপালের কিছু মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে।

—এই ধরনের উণ্ডে মানুষ মরতে পারে ?

—নিশ্চয়ই। হেমারেজ হয়ে হয়ে সে নিশ্চয়ই মারা যাবে।

—অর্থাৎ কিছুক্ষণ সে বেঁচে থাকবে। বেশ কিছুটা রক্ত পড়ে মৃত্যু হওয়ার আগে তার সাহায্যের জন্যে কিছুদূর ছুটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এক্ষেত্রে তা হয়নি। তিনি গুলি খেয়ে ওখানেই পড়ে মারা গেছেন। আপনার কি মনে হয় ইন্সপেক্টর, মৃত্যু খুব দ্রুত হয়েছিল ?

—আমার ধারণা তাই। কারণ মিস্টার চৌধুরী, বিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় নেন পৌনে এগারটায় আর তাঁর মৃতদেহ বিটের কনেস্টবল দেখতে পায় এগারটা কুড়িতে। কাজেই এই পঁয়ত্রিশ মিনিট সময়ের মধ্যে হত্যাকারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, বোধহয় কিছু কথাও হয় এবং তিনি মারাও যান। সুতরাং…

—আপনার সঙ্গে আমি একমত ইন্সপেক্টর। তাহলে ডাক্তার ? এবার তুমি কি বলবে ?

আরেকটা সম্ভাবনা আছে,—শৈবাল বলল, এই ধরনের অগভীর ক্ষতেও মানুষের

হতে পারে, যদি হত ব্যক্তি কোন মারাত্মক স্নায়বিক রোগের রুগী হয়।
নিতে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে মৃত্যু হওয়া অস্বাভাবিক নয়।
ওটা হত্যা পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট কালকের মধ্যেই রেডি হয়ে যাবে, কি বলেন ?

— আশা তো করা যায়। অশোক রায় বললেন।

প্রথম সাম্প্রা রিপোর্টের এক কপি আমায় দেবেন।

বাসব- চলুন, এবার ফেরা যাক।

এখন ইন্‌স্পেক্টর রায় বাসব ও শৈবালকে হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যা সাতটার পর মৃত শৈলবিকাশ চৌধুরীর বাড়িতে এল বাসব।

সঙ্গে শৈবালও আছে। চমৎকার বাড়িখানা মিঃ চৌধুরীর। ওয়ালনাট কালারের দোতলা সাউদার্ণটন প্যাটার্ণের বাড়ি। সামনে লন। লনের গায়ে গায়ে হলিহকের কেয়ারি।

পোর্টিকোতে তাপস দত্ত দাঁড়িয়েছিলেন। ওদের অপেক্ষাতেই। বাসব আগেই ফোনে জানিয়েছিল তাঁকে, আজ সন্ধ্যার সময় তিনি যেন এখানে উপস্থিত থাকেন। মিঃ দত্ত ওদের ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

বাসব বলল, আপনি নিশ্চয় আমার বিষয় বাড়ির সকলকে বলে রেখেছেন মিস্টার দত্ত ?

—হ্যাঁ। আপনি যে এখন আসবেন একথাও জানিয়ে রেখেছি।

—বেশ। তাহলে সৌর্যবিকাশ চৌধুরীকে একবার ডেকে পাঠান। আমি প্রথমে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তাপস দত্ত। সৌর্যবিকাশকে তিনি ডেকে আনতে গেলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সৌর্যবিকাশ এলেন ঘরে। ছোটখাট মানুষটি। বয়স বোধহয় ত্রিশ। দেখতে মন্দ নয়। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। শুকনো মুখে তিনি একটা কোচে এসে বসলেন।

বাসব বলল, আপনার মনের অবস্থা ভাল নেই, তবু আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত।

সৌর্যবিকাশ বললেন, মিস্টার দত্তর মুখে আমি আপনার কথা শুনেছি, আমাকে কি বলতে চান বলুন ?

—গোটাকতক প্রশ্ন আমি আপনাকে করব! একটা খুনের তদন্ত নিঃসন্দেহে জটিল ব্যাপার। আশা করি আপনি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবেন ?

—চেষ্টা করব।

—আপনি কি করেন ?

— নিজেদের ব্যবসা দেখি।

— কিসের ব্যবসা ?

—আমাদের কন্সট্রাকশন ফার্ম আছে। 'চৌধুরী অ্যান্ড চৌধুরী'র নাম সকলেই

জানে।

—আপনারা তিনভাই কি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ?

—হ্যাঁ।

— আপনি বিয়ে করেছেন ?

— না।

— কেন ?

সৌর্যবিকাশের মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল। তিনি বেশ দ্রুত-গলায় বললেন, নিশ্চয় কোন সঙ্গত কারণ আছে।

দুর্ঘটনার দিন অর্থাৎ কাল রাত ন'টার পর আপনি কোথায় ছিলেন ?

- বাড়িতেই। নিজের ঘরে বসে টেণ্ডার ফর্ম ফিল আপ করছিলাম।

— কাজটা শেষ করতে কতখানি সময় লেগেছিল ?

— ঘন্টা দেড়েক।

— তারপর ?

—তারপর আমি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ি।

—হুঁ। আপনাদের মোটর আছে।

—দুটো গাড়ি আছে আমাদের।

—কাল আপনার দাদা কোথায় নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন ?

—বিকাশ সেনের বাড়ি।

—আপনাদেরও নেমন্তন্ন ছিল, না তিনি একলাই ইনভাইটেড হয়েছিলেন ?

— বাড়ির সকলেরই ইনভাইটেশন ছিল. আমরা যাইনি। কারণ...

— কারণ ?

—মিস্টার সেনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না। আগে আমাদের জয়েণ্ট বিজনেস ছিল। উনি ব্যবসায় প্রচুর গোলমাল করায় এই মনোমালিন্যের সৃষ্টি।

তবু তিনি আপনাদের ইনভাইট করেছিলেন এবং আপনার দাদা সেখানে গিয়েও ছিলেন—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—আসলে প্রকাশ্যে আমাদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য নেই। দু'তরফে তাই সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়া-আসা আছে। অবশ্য আমাদের তরফ থেকে দাদা ছাড়া আর কেউ যেত না ওঁর বাড়ি।

বাসব কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, আপনার দাদা কি রকম ধরনের লোক ছিলেন।

—তিনি রগচটা ও একগুঁয়ে লোক ছিলেন।

—তাঁর কি কোন শারীরিক অসুস্থতা ছিল ?

—ছিল। অত্যন্ত দুর্বল স্নায়ু ছিল তাঁর। একটুতেই নার্ভাস হয়ে পড়তেন।

—তাঁকে কে খুন করতে পারে বলে আপনার ধারণা ?

—ও বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই।

— আচ্ছা মিস্টার চৌধুরী আপনি কি নিয়মিত নিজেই সেভ করেন ?

সেভ !—এই রকম অদ্ভুত প্রশ্নে অবাক হলেন সৌর্যবিকাশ চৌধুরী।

শৈবাল ও মিস্টার দত্তও কম বিস্মিত হলেন না। নিজের হাতে দাড়ি কামানোই আমার অভ্যাস।

—কম আলোয় দাড়ি কামিয়ে ছিলেন কি ? গালের যা অবস্থা

শৈবাল সৌর্যবিকাশের মুখের দিকে তাকাল। গালের এখানে ওখানে ব্লেডের আঘাত।

— হ্যাঁ। কাল রাত্রে দাড়ি কামাতে গিয়ে, তাড়াতাড়ি করার দরুণ গাল কেটে গেছে।

রাত্রে কামাবার হঠাৎ প্রয়োজন হল ?

—আজ ভোরেই আমার এক জায়গায় যাবার কথা ছিল, তাই ...কিন্তু দাদার মৃত্যুর সঙ্গে এসব কথার কি সম্পর্ক বুঝতে পারছি না।

বাসব সে কথায় কান না দিয়ে বলল তাহলে আপনি কাল রাত্রে শুধু টেণ্ডার ফর্মই ফিল আপ করেননি, দাড়িও কামিয়েছিলেন। কই আগে একথা তো আমায় বললেন না ?

—না....মানে এই সামান্য কথাটাও যে বলতে হবে ভাবতে পারিনি।

—ধন্যবাদ। আপনাকে বেশ কিছুক্ষণ বিরক্ত করলাম। এবার আপনি যেতে পারেন। শুধু আপনার ছোটভাইকে পাঠিয়ে দেবেন।

সৌর্যবিকাশ চৌধুরী দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যেন তিনি। বাসব একটা সিগারেট ধরাল।

বোধহয় মিনিট দুয়েক পরেই চন্দ্রবিকাশ ঘরে এলেন। বয়স সাতাস-আটাশ উচ্চতায় খুব বেশি নন তিনি। গায়ের রঙ ফরসা। মুখের গড়ন মেজভাইয়ের মত। মুখের ওপর একটা শীর্ণ ভাব লেগে আছে। মনে হয় দাদার মৃত্যুতে বিশেষ শোকাহত হয়েছেন তিনি।

--আমায় ডেকেছেন ? বললেন ক্ষীণ গলায়।

বাসব বলল, নিশ্চয়ই আপনি শুনে থাকবেন, আপনার দাদার হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে আমি এসেছি।

হ্যাঁ, আমি শুনেছি। হত্যাকারীকে যে কোন উপায়ে আপনি ধরুন। এ সম্পর্কে আপনি আমার কাছ থেকে যে ধরনের সাহায্য চাইবেন আমি করব।

—ধন্যবাদ। আপনার এই সহযোগিতামূলক মনোভাব দেখে খুশি হলাম। আপনার দাদার কি কোন শত্রু ছিল ?

-থাকা বিচিত্র নয়। ভাল লোকদের শত্রুর অভাব হয় না।

--আপনার কথা ঠিক ধরতে পারলাম না।

যদিও তিনি রগচটা ও একগুঁয়ে লোক ছিলেন, তবু তাঁর মত দয়ালু ও স্নেহ-প্রবণ মানুষ খুব কমই দেখা যায়। আমাদের আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, চাকর-বাকর, এমন কেউ নেই যে তাঁর এই ব্যবহারের প্রশংসা করে না।

—কিন্তু এর জন্য শত্রু থাকার কি সম্ভাবনা বুঝতে পারছি না।

আবার কিছু লোক আছে চন্দ্রবিকাশ বললেন, যারা দাদাকে ঈর্ষা করত 'তাদের মধ্যে একজন আমাদের ব্যবসার আগেকার অংশীদার বিকাশ সেন। আর—

—আর - ?

—অনুমানের ওপর নির্ভর করে আর কারুর নাম করা ঠিক নয়।

—কাল রাত নটা থেকে, আপনার দাদার মৃত্যু-সংবাদ শোনা অবধি আপনার মুভমেন্টের বিষয় কিছু বলুন।

ক্লাব থেকে আমি সাড়ে আটটার সময় বাড়ি ফিরি। দাদা তখন মিঃ সেনের ওখানে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। আমার সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন, কাল সকালের ট্রেনেই বেলডাঙ্গা চলে যাবে। খবর পেয়েছি দিন তিনেকের মধ্যেই কন্‌-সালটিং ইঞ্জিনিয়ারের ভিজিট হবে ওখানে। বেলডাঙ্গায় আমরা বিরাট একটা ব্রীজের কাজ হাতে নিয়েছি।

—আর কোন কথা হয়েছিল ?

হ্যাঁ। আমার উপস্থিতিতেই দাদা বৌদির কাছ থেকে রিভলবারটা চেয়ে পকেটে রাখলেন। আমি বললাম, সব সময় তুমি কেন যে ওটা ক্যারি কর, বুঝতে পারি না। তিনি হেসে বললেন, সাবধানের মার নেই ছোটবাবু। পকেটের একপাশে পড়ে থেকে বিপদের সময় যদি আমায় রক্ষা করে, ক্ষতি কি ?

—তারপর ?

—আমি নিজের ঘরে চলে যাই। শরীর ভাল ছিল না। না খেয়েই শুয়ে পড়ি ন'টার মধ্যে। ঘুম ভাঙে হরিহরের ডাকে। আমাদের চাকর হরিহর। সে কাঁদতে কাঁদতে আমায় দাদার মৃত্যু সংবাদ জানায়। রাত তখন বোধহয় একটা।

—হুঁ। আপনার দাদার ক'বছর বিয়ে হয়েছে ?

—বছর তিনেক।

—কোন ইস্যু নেই বোধহয় ?

—না।

—আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, ইদানীং কি আপনার দাদা খুব চিন্তিত থাকতেন ?

—হ্যাঁ। মাস খানেক ধরে তাঁকে সব সময় চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে থাকতে দেখতাম ; এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করলে তিনি আমাদের ওপর বিরক্ত হতেন।

—আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করব না। শুধু আপনার দাদার অফিস ঘরে আমাদের নিয়ে চলুন।

—আসুন। —চন্দ্রবিকাশ চৌধুরী আগুয়ান হলেন।— বাসব ও শৈবাল তাঁকে অনুসরণ করল। তাপস দত্ত ড্রইংরুমেই রয়ে গেলেন। কোথায় যেন ফোন করবেন, তাই।

ড্রইংরুমের পাশের ঘরখানাই শৈলবিকাশ চৌধুরীর অফিস-রুম।

বাসব বলল, আমি এই ঘর পরীক্ষা করতে চাই। হয়তো কাগজপত্র নেড়েচেড়ে দেখারও প্রয়োজন হতে পারে। আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।

—আপত্তি কিসের ? আমি কি এখন যেতে পারি ?

—স্বচ্ছন্দে।

চন্দ্রবিকাশ চৌধুরী ধীর পদক্ষেপে বারান্দা ধরে এগিয়ে চললেন। বাসব ও শৈবাল অফিস রুমে প্রবেশ করল। ঘরখানা খুব বড় নয়, ১০×১০ হবে বোধহয়। পলিথিনের স্বচ্ছ আবরণে চারিদিকের দেওয়াল মোড়া। তাই বোধহয় দেওয়ালে ছবি বা ওই জাতীয় কিছু টাঙানো নেই। আড়াআড়ি ভাবে সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা রাখা। টেবিলের ওপর খানকয়েক ফাইল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস। দেওয়ালের একধারে দাঁড় করান লম্বা বুককেশ। খান ছ'য়েক চেয়ারও আছে টেবিলের এপাশে-ওপাশে।

বাসব চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে টেবিলের খুব কাছে এগিয়ে গেল। টেবিলের দু'পাশ মিলিয়ে ছ'টা ড্রয়ার। বাসব ডান ধারের প্রথম ড্রয়ারটা খুলল। বলতে গেলে খালি। শুধু ওয়েস্টার্ণ নভেল রয়েছে একখানা। এই ভাবে আরো চারখানা ড্রয়ার খুলে খুলে দেখল ও। একখানা কেবল খোলা গেল না। ছোট ছোট দুটো কড়ায় ছোট একটা তালা দিয়ে বন্ধ সেটা।

বাসব বলল, ডা ার, দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিয়ে এস তো।

শৈবাল ওর কথামত কাজ করল। বাসব পকেট থেকে ছোট ছুরি বার করে কড়ার জয়েণ্টে চাপ দিতে দিতে কড়াটা খসিয়ে আনল টেবিলের বিট থেকে।

শৈবাল বলল, একি করলে ?

এছাড়া ড্রয়ার খোলবার আর তো কোন উপায় ছিল না। অথচ না খুললেও নয়। দেখছ না, শুধু এইটাই বন্ধ। বলা তো যায় না, এর মধ্যেই হয়তো প্রয়োজনীয় কিছু পাওয়া যেতে পারে।

ড্রয়ার খোলা হল। তার মধ্যে রয়েছে হিসেবের খাতা, এনগেজমেণ্ট-বুক, আদালত সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র, চেক বই, ব্যাঙ্ক বুক, বীমার প্রিমিয়াম রিসিট; রবারের রিং আবদ্ধ কয়েকটা চিঠি ও একটা ফটোগ্রাফ। জনৈক মহিলার হাফ সাইজের ছবি। মহিলাটি দেখতে সুশ্রী, বয়স বাইশ-তেইশ হবে। ফটোগ্রাফখানা কিছু ফেড হয়ে গেছে।

বাসব চিঠির তাড়া, ফটোগ্রাফখানা ও এনগেজমেণ্ট বুকটা পকেটস্থ করল। তারপর বলল, চল, বাইরে যাওয়া যাক।

ওরা ঘরের বাইরে এল।

তাপস দত্ত বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওদের দেখে এগিয়ে এলেন।

বাসব বলল, এবার মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—চলুন।

তাপস দত্তকে অনুসরণ করে ওপরে এল। দোতালার বারান্দার শেষ প্রান্তে মিসেস চৌধুরীর ঘর। মিঃ দত্ত নক করলেন। দরজা খুলে বাইরে এলেন মিসেস চৌধুরী। তাঁর মুখখানা বাসি ফুলের মতই শুকিয়ে উঠেছে। অপূর্ব সুন্দরী তিনি নন। তবে তাঁকে দেখতে খারাপ বলা চলে না। বয়স বোধহয় বছর আটাশ

হবে। প্রচুর কেঁদেছেন। চোখের কোলে কোলে এখনো জল।

তাপস দত্ত বললেন, এঁরা তদন্তে এসেছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

রত্নমালা চৌধুরী ধরা গলায় বললেন, আসুন।

সকলে ঘরে প্রবেশ করলেন।

বাসব বলল, আপনার মনের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয় তা জানি। শুধু তদন্তের সুবিধার জন্যেই আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।

—বসুন আপনারা। আমার কাছ থেকে কি জানতে চান বলুন।

কাল মিস্টার চৌধুরী বিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন, তখন আপনার সঙ্গে তাঁর কি কথা হয়েছিল?

কোন কথাই হয়নি। শুধু রিভলবারটা আলমারি থেকে বার করে দিতে বলেছিলেন।

- আর কোন কথা হয়নি?

— না। তিনি বেশি কথা বলতেন না। তাছাড়া আমার সঙ্গে তাঁর কোন কথাই হত না।

—কি রকম?

— ইতস্তত করতে লাগলেন রত্নমালা চৌধুরী।

তাপস দত্ত বললেন, ওঁকে অন্য প্রশ্ন করুন মিস্টার ব্যানার্জী। এ বিষয়ে আমি আপনাকে পরে বলব।

-- মিস্টার চৌধুরী নিজের ছোটভাইকে কেন বীমার নমিনি করেছিলেন বলতে পারেন?

--তিনি ওকে খুব ভালবাসতেন।

—কাল মিস্টার চৌধুরী বেরিয়ে যাওয়ার পর আপনার দুই দেবর বাড়িতেই ছিলেন কি?

—বলতে পারছি না। কারণ উনি বেরিয়ে যাওয়ার পরই আমি খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ি।

আচ্ছা, আপনার স্বামী বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছিলেন. নিশ্চয়ই কোন প্রেজেণ্টশন নিয়ে গিয়েছিলেন?

- হ্যাঁ, একটা জড়োয়া হার নিয়ে গিয়েছিলেন।

ওই আটশো টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কি স্বার্থকতা?

বাসব পকেট থেকে সেই ফটোগ্রাফখানা বার করল। রত্নমালা চৌধুরীর দিকে এগিয়ে ধরে বলল, দেখুন তো মিসেস চৌধুরী, এই মহিলাটিকে চেনেন কিনা?

—ব্যক্তিগত ভাবে অবশ্য এঁকে আমি চিনি না। তবে এঁর পরিচয় আমার জানা আছে?

—ইনি কে?

—আমার স্বামীর সঙ্গে এঁর বিয়ে হবার কথা ছিল।

বাসব উঠে দাঁড়াল। —এখন আমার আর কোন প্রশ্ন নেই। ভবিষ্যতে

প্রয়োজন হলে আবার আসব।

—বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শৈবালও। মিঃ দত্ত ওদের অনুসরণ করলেন।

—আবার ড্রইংরুমে—।

—কি ব্যাপারটা বলুন তো? বাসব প্রশ্ন করল।

—মিঃ দত্ত বললেন, ওই ছবিটা আপনি কোথা থেকে পেলেন ভেবে অবাক হচ্ছি। যাই হোক, ওই মহিলাটির সঙ্গে চৌধুরীর অন্তরঙ্গতা ছিল। দুজনের বিয়েও হত। কেন জানি না হল না। শুনলাম মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে। তারপর থেকে চৌধুরী আমায় প্রায়ই বলত, ছায়ার মত মৃত্যু আমার পিছু পিছু আছে দত্ত। তাই তো রিভলবার নিয়ে ঘুরি। সে যদি আমায় অ্যাটেম্পট করে, আমিও তাকে রেহাই দেব না।

– কে তাঁকে মারতে চায়– এ সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন কোনদিন?

না। বিয়েও করতে চাইছিল না। আমরাই কয়েকজন জোর করে ওকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছিলাম অন্য মেয়ের সঙ্গে। স্ত্রীর সঙ্গে বেশ বনিবনাও হয়েছিল। কিন্তু মাস কয়েক ধরে ও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পূর্ণ বাক্যালাপ বন্ধ করেছিল।

—কেন?

—তা বলতে পারছি না।

—ওই পাগল মহিলার ঠিকানা দিতে পারেন?

- মেয়েটি এখন কাঁকেতে। ওর মা থাকেন কসবাতে। ঠিকানা আমার কাছে লেখা আছে, আপনাকে পরে দেব।

—এখন তাহলে আমরা উঠলাম। আপনি ঠিকানাটা এক সময় পাঠিয়ে দেবেন।

চারটের সময় শৈবাল হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে এল।

বাসব তখন বাড়ি ছিল না। বাহাদুরের মুখে শুনল একটার সময় ও কোথায় বেরিয়ে গেছে।

শৈবাল ড্রইংরুমে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোতে লাগল। মিনিট দশেক পরে বাসব ফিরল। বলল, তোমাকে বোধহয় অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, তাই না ডাক্তার?

অনেকক্ষণ কিছু নয়, মিনিট দশেক।

—আরো কিছুক্ষণের জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি এখুনি আসছি।

বাসব ড্রইংরুমের দক্ষিণ দিকের ঘরটার মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। ওই ঘরটি ওর ল্যাবরেটরি বিশেষ। প্রায় প্রত্যেকটি তদন্তে ওই ঘরের যন্ত্রপাতিগুলি ওতপ্রোত ভাবে সাহায্য করে বাসবকে।

ঘড়ির কাঁটা সরে চলেছে। ক্রমে পাঁচটা বাজল, তারপর সাড়ে পাঁচটা। বাসব তখনো ওই ঘরের মধ্যে। পৌনে ছ'টার সময় ইন্সপেক্টর রায় এলেন।

—মিস্টার ব্যানার্জী কোথায়?

—বাড়িতেই আছেন। বসুন।

মিনিট কয়েক পরে বাসব ড্রইংরুমে এল। একটু হেসে বলল, ইন্সপেক্টর, ডাক্তারের সঙ্গে আপনাকেও অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি দেখছি। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট এনেছেন নাকি ?

—হ্যাঁ, এই যে –

তিনি রিপোর্টের নকল এগিয়ে ধরলেন। বাসব ভ্রূ কুঁচকে পড়ল রিপোর্টটা।

—ডাক্তার, তোমার কথাই ঠিক। আঘাতের জন্যে নয়, ভয় পেয়েই মারা গেছেন মিস্টার চৌধুরী। তাছাড়া তার মাথার মধ্যে গুলি পাওয়া যায়নি। যাক- এবার আমরা এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করতে পারি।

অশোক বললেন, কি রকম বুঝছেন কেসটা ?

—যদিও এখন সম্পূর্ণ অন্ধকারেই আছি. তবু খুব জটিল বলে মনে হচ্ছে না আমার। কারণ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাবার অনেকগুলো পথের সন্ধান আমি পেয়েছি।

—কি রকম।

—তার আগে আমি আপনাদের একটা জিনিস দেখাতে চাই।

বাসব নিজের পকেট থেকে দুর্ঘটনাস্থলের কাছে কুড়িয়ে পাওয়া সেই বিচিত্র না-চামড়া না-রবারের টুকরোটা বার করল।

আপনারা বলুন তো এটা কি ?

শৈবাল ও অশোক রায় বস্তুটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

শৈবাল বলল, বোধহয় রিফাইন প্লাস্টিকের টুকরো।

আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম, আসলে কিন্তু তা নয়। সারা দুপুর আমি কি করেছি বল তো ? এই টুকরোটাকে নিয়ে আমার বন্ধু জুলজির প্রফেসর হাজরার কাছে গেছি। সেখান থেকে আবার আমায় অস্ট্রেলিয়ান ট্রেড কমিশনে যেতে হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ান ট্রেড কমিশন। ইন্সপেক্টর রায়ের গলায় বিস্ময়।

শুনুন, আপনাদের বুঝিয়ে বলছি। দুর্ঘটনাস্থলের কাছেই আমি এই টুকরোটা কুড়িয়ে পাই। প্রথমে আমি প্লাস্টিকই ভেবেছিলাম। কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝলাম ওটা প্লাস্টিক নয়, রবারও নয়—চামড়া। টুকরোটার গায়ের সূক্ষ্ম আঁশগুলো আমায় এই সিদ্ধান্তে পেঁছিতে সাহায্য করল। কিসের চামড়া কোন মতেই ঠিক করতে না পেরে হাজরার কাছে গেলাম। হাজরা দেখে শুনে বলল, ক্যাঙ্গারুর চামড়া। আমি অবাক হলাম, কলকাতার লেকের ধারে অস্ট্রেলিয়ান ক্যাঙ্গারুর চামড়া পড়ে কেন ? জু-গার্ডেন থেকে একটা ক্যাঙ্গারু বেরিয়ে লাফাতে লাফাতে গিয়ে নিজের চামড়ার একটু নমুনা ফেলে এসেছে, একথা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাহলে ? গেলাম অস্ট্রেলিয়ান ট্রেড কমিশনে। রিশেপ-সানিস্ট মহিলাটি সুরূপা এবং নবীনা। আমি তাঁকেই নিজের সমস্যার কথা বললাম। তিনি চামড়াটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, ইউরোপ ও আমেরিকায় ক্যাঙ্গারুর মাংস বিক্রি করে আমাদের সরকার প্রচুর লাভ করছেন। টিনে বন্ধ

ক্যাঙ্গারুর আচারের মত লোভনীয় খাদ্য পৃথিবীতে কমই আছে। কথাটা বলেই মনে হল, তিনি যেন ঝোল টানলেন। আমি তখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, আমার আগ্রহ মাংসের ওপর নয়, চামড়ার ওপর। তিনি বললেন, ক্যাঙ্গারুর চামড়ায় তৈরি অনেক কিছু সর্বত্র চালান হয় ওখান থেকে। তাদের মধ্যে চশমার খাপ, সিগারেট কেশ, সুটকেশ, র‍্যাকেটের কভার ইত্যাদি। আমি এই কথাতেই সন্তুষ্ট হয়ে চলে এলাম। এই তো গেল চামড়া ঘটিত। এবার অন্য কথায় আসা যাক। তার আগে আমি আপনাদের একটা কথা বলেনি, অস্ট্রেলিয়ান ট্রেড কমিশন থেকে বেরিয়ে আমি বিকাশ সেনের বাড়ি গিয়েছিলাম। মিস্টার সেনের মেয়ের বিয়েতেই গিয়েছিলেন সেদিন শৈলবিকাশ। আমি নিজের পরিচয় দিয়ে গোটাকতক প্রশ্ন করলাম মিস্টার সেনকে। তিনি সহযোগিতামূলক মনোভাব দেখালেন। তার কাছ থেকে শুনলাম, রাত সাড়ে দশটার সময় ওখানেই মিস্টার চৌধুরীকে কে ফোন করে। ফোন পেয়েই তিনি বেরিয়ে যান, তারপর আর ফিরে আসেননি।

—তাই নাকি? শৈবাল বলল।

তাহলে মোটামুটিভাবে দাঁড়াচ্ছে এইরকম, যদিও এখন অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, তবে আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত এই থিয়োরিই কারেক্ট হবে। মিস্টার চৌধুরী সাড়ে দশটার সময় ফোন পান। কোন পরিচিত ব্যক্তিই তাঁকে ফোনে বলেছিল, লেকের ওই ব্রীজটার কাছে যেতে। নিশ্চয়ই এমন কোন কথা বলেছিল, যার জন্যে তিনি ওখানে না গিয়ে থাকতে পারেননি। তারপর হত্যাকারী তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে গুলি চালায়। কাজেই সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, হত্যাকারী মিস্টার চৌধুরীর পরিচিত ব্যক্তি ছিল।

—আপনি যত সহজভাবে বললেন, ব্যাপারটা কি এত সহজে হয়েছিল? ইন্সপেক্টর রায় বললেন, যে রিভলবার দিয়ে মিস্টার চৌধুরী নিহত হয়েছিলেন, সেটা ছিল তাঁরই। হত্যাকারী কিভাবে অস্ত্রটা ধস্তাধস্তি না করেই তাঁর কাছ থেকে আদায় করেছিল, তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

বাসব বলল, আপনার প্রশ্নের মধ্যে ধার আছে। কিন্তু এর উত্তর যে আমার কাছে নেই তা মনে করবেন না। উত্তর দেবার আগে আমি আপনাদের একটা প্রশ্ন করব। বলুন তো, নতুন রঙ করা ব্রীজের রেলিংএর ওপর ঘসা দাগ আর রেলিং-এর তলায় জলের দিকে একটু রঙ ওঠা দাগ কেন ছিল?

শৈবাল ও ইন্সপেক্টর রায় বাসবের দিকে তাকালেন।

ধরতে পারছেন না? আপনাদের এবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই মৃতদেহের পজিশন। রেলিং-এর কাছ থেকে হাত দুয়েক দূরে পড়েছিল দেহটা। তাও ধরতে পারলেন না? শুনুন, মিস্টার চৌধুরীর রিভলবার দিয়ে গুলি ছোড়া হয়নি, ওটা ফলে রাখা হয়েছিল পুলিসকে বিপথগামী করবার জন্যে।

আপনি কিভাবে বুঝলেন?

—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রিভলবারের ব্যারেলটা আমি খুলে ফেলি, তারপর ব্যারেল ধোয়া ডিস্টিল ওয়াটার পরীক্ষা করে দেখি তাতে সালফিউরিক অ্যাসিডের

সন্ধান পাওয়া গেল না। এতে কি প্রমাণ হল জানেন? প্রমাণ হল, অন্তত দিন দুয়েকের মধ্যে এই রিভলবার থেকে গুলি ছোঁড়া হয়নি।

শৈবাল বলল, রেলিং-এর দাগের কথা কি বলছিলে?

—রেলিং-এর ওপকার দাগ দেখে মনে হয় হত্যাকারী রেলিং-এ ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

—মিস্টার চৌধুরীও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন।

—এর উত্তর ইন্সপেক্টর রায় দিতে পারবেন। মিস্টার চৌধুরীর পোশাকে রঙের দাগ ছিল?

– না।

– অথচ তিনি ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালে রেলিং-এর কাঁচা রঙ তাঁর পোশাকে লাগতই। কাজেই আমার কথাই ঠিক ডাক্তার। ওইভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে হত্যাকারী নিজের রিভলবার দিয়ে মিস্টার চৌধুরীকে গুলি করে। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেই, সে তাঁর ঘড়ি ও আংটি খুলে নেয়। পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে নেয় এবং তাঁর রিভলবারটা ফেলে রেখে সরে পড়ে। এখানে আমাদের ধরে নিতে হবে হত্যাকারীর নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল, তার গুলিতেই মিস্টার চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে। এবার রেলিং-এর নিচের দিকের দাগের কথায় আসা যাক। আমার অনুমান গুলি করবার সময় হত্যাকারীর হাত কেঁপে যাওয়ায় রিভলবার খসে পড়ে এবং রেলিং-এর নিচের দিকে ধাক্কা খেয়ে জলে গিয়ে পড়ে।

—আপনি বলতে চান হত্যাকারীর রিভলবার লেকের জলের তলায় পড়ে আছে।

—খোঁজ করিয়ে দেখুন, বোধহয় আমার কথাই সত্য প্রমাণিত হবে।

—কয়েক মিনিট ঘরের মধ্যে পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করল।

শৈবাল বলল, যে ক্যাঙ্গারুর চামড়ার টুকরো পাওয়া গেছে, তোমার কি মনে হয়, তা কোন সিগারেট কেসের ছেঁড়া অংশ?

-- এখন সঠিক ভাবে কিছুই বলা যায় না। ভাল কথা, ইন্সপেক্টর আপনি খোঁজ নেবেন, দুর্ঘটনার দিন রাত সাড়ে দশটার সময় বিকাশ সেনের বাড়িতে কোথা-থেকে ফোন এসেছিল।

—বেশ।

—এরপর কথাবার্তা তেমন জমল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই ইন্সপেক্টর বিদায় নিলেন। শৈবালও উঠে পড়ল। শৈবাল চলে যাবার পর বাসব সিগারেট ধরাল। ভাবতে লাগল। বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলো নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

সিগারেটটা পুড়ে পুড়ে ক্রমে ছোট হয়ে গেল।

বাসব উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে মিস্টার চৌধুরীর এনগেজমেণ্ট বুক আর চিঠির তাড়াটা নিয়ে এল। রবারের রিং খুলে প্রথমে চিঠিগুলো বার করল ও। দশখানা খাম সমেত চিঠি। একের পর এক চিঠি খাম থেকে বার করে দেখতে লাগল বাসব। বেশির ভাগই ব্যবসা সংক্রান্ত। শেষে একটা চিঠি ওকে উৎসাহিত করল। সেখানা প্লেন একটা খামের মধ্যে রাখা ছিল। চিঠিটা এইরকম—

প্রিয়,

দিন কয়েকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। তুমি গতকাল যা বললে, তাতে আমি বেশ ভিত হয়ে পড়েছি। সত্যি যদি ও সমস্ত ব্যাপারটা জেনে ফেলে থাকে, তাহলে আমাদের খুবই অনিষ্টের আশংকা। তবে আমার ধারণা তোমার সন্দেহ অমূলক। সেরকম কিছু হলে ও চুপ করে থাকত না। যাই হোক, আমি ফিরে এসেই ওর মনকে ঘোরাবার চেষ্টা করব। তুমি ওর হাত থেকে মুক্তি পাবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। কারণ ওর গতিবিধির ওপর আমি দৃষ্টি রাখছি। বলতে গেলে অন্য ফুলের মধুর সন্ধান আমিই ওকে দিয়েছি।

—শৈলবিকাশ চৌধুরী

ছ'মাস আগেকার লেখা চিঠি। কিন্তু কি রকম হল, চিঠিটা শৈলবিকাশ অন্য কাউকে লিখেছিলেন, অথচ সেখানা তাঁরই কাছে রয়ে গেছে কেন? তাছাড়া চিঠির ভাষাটাও একটু কেমন কেমন. ঠিক যেন ধরি মাছ না ছুঁই পানি-

এই চিঠিটাকে আলাদা করে রেখে, এনগেজমেন্ট বুকটা টেনে নিল বাসব। পাতার পর পাতায় তারিখে তারিখে কত লোকের সঙ্গে দেখা করবার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এক জায়গায় ওর দৃষ্টি একাগ্র হল! লেখা রয়েছে ১৮।২।৬১, কাল দুপুরে সুমিকে দেখে আসতে হবে। আবার ২৩।২।৬১ সন্ধ্যায় ৪১৪৯এ ডাঃ করকে ফোন করতে হবে। তিনি ফোন নম্বর রেখে গেছেন। বাংলাতেই সমস্ত কিছু লিখেছেন মিঃ চৌধুরী। ২৬।২।৬১তে আবার—সুমির জন্যে কাল রাঁচি যেতে হবে।

সুমি—কোন মেয়ের নাম। পুরো নামের শেষ বা প্রথমাংশ নিশ্চয়ই। ভ্রূ কুঁচকে বাসব কয়েক মিনিট চিন্তা করল। তারপর টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল। ডায়াল করল—৪১৪৯। থেমে থেমে কয়েকবার রিং হবার পর লাইনের অপর প্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল. হ্যালো

—কোথা থেকে কথা বলছেন?

—আরোগ্য মেন্টাল হসপিটাল থেকে।

বাসব লাইন কেটে দিল। তার যা প্রয়োজন তা সে জেনেছে। কলকাতার মাইল কয়েকের মধ্যেই এই মেণ্টাল হসপিটাল। বছর তিনেক হল সরকারের সহযোগিতায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খবর কাগজের মাধ্যমে একথা জানা ছিল বাসবের। সুমি—যার ছবি ড্রয়ারের মধ্যে পাওয়া গেছে। যে মেয়েটির সঙ্গে মিঃ চৌধুরীর অন্তরঙ্গতা ছিল অথচ যে পাগল হয়ে গেছে, সেই কি? কিন্তু তাপস দত্ত বললেন, মেয়েটি কাঁকেতে আছে, এদিকে

হাই তুলে উঠে দাঁড়াল বাসব। ঘড়ির দিকে তাকাল সাড়ে ন'টা। এখন আর কোন বিষয় মাথা না ঘামিয়ে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লেই হয়।

বাসব খাবার ঘরের দিকে রওনা দিল।

পরের দিন ভোরে বাসব একটা সুবার্বন ট্রেনে চড়ে বসল।

ঘণ্টা দেড়েকের বেশি লাগল না আরোগ্য মেণ্টাল হসপিটালে পৌঁছতে ওর। বেশ খানিকটা কম্পাউণ্ড নিয়ে এই হাসপাতালটি। লাল রঙের তিনটে বড় বড় বাড়িতে এই হাসপাতাল। দক্ষিণ দিকের বাউন্ডারি ঘেঁষে কোয়ার্টারের শ্রেণী। ডাক্তার, স্টাফ ও অন্যান্যরা ওখানে থাকেন নিশ্চয়ই।

গেটের গোড়ায় দারোয়ান ছিল। বাসব তাকে প্রশ্ন করল ডাঃ করের সম্বন্ধে। সে বলল, আট নম্বর কোয়ার্টারে ডাক্তার কর থাকেন, গেলে দেখা হবে।

ডাঃ কর বেশ কিছুক্ষণ আগেই ঘুম থেকে উঠেছিলেন। চা পর্ব সেরে বাইরের বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বাসবকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। বাসব নিজের পরিচয় দিয়ে মিঃ চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ জানাল তাঁকে।

ডাঃ কর বললেন, তাঁর মৃত্যু সংবাদ কাগজে পড়েছি কিন্তু আপনি···

—তাঁর হত্যার তদন্ত আমি করছি। সেই সূত্রেই আপনার কাছে আমার আসা।

—আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি বলুন? ডাঃ করের গলা যেন কেঁপে উঠল।

গোটা কতক প্রশ্নের সঠিক উত্তর চাই। আমি কথা দিচ্ছি এই ব্যাপারে পুলিস আপনাকে যাতে আর বিরক্ত না করে সে ব্যবস্থা আমি করব।

বাসব বলল, একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন মিস্টার চৌধুরীর হত্যাকারী ধরা পড়ুক? তাছাড়া তিনি আপনার পরিচিত লোক ছিলেন। কোন্ সূত্র ধরে আমি আপনার কাছে এলাম, সে প্রশ্ন অবান্তর। মিস্টার চৌধুরী এখানে একটি মেয়েকে রেখেছিলেন। যদিও জানি সে পাগল। তবু আপনাকে কোন প্রশ্ন করবার আগে যদি আমার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দেন, তাহলে বিশেষ উপকৃত হব।

- আমি আপনার নাম শুনেছি মিস্টার ব্যানার্জী। এই লাইনের আপনি একজন দিকপাল তা আমি জানি। আপনার কথা রাখতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না।

— অবশ্য আমি উপর থেকে অনুমতি আনতে পারি। শুধু দেরি হবে বলেই

দ্বিধা জড়িত গলায় ডাঃ কর বললেন, উপর থেকে অনুমতি আনলেও তার সঙ্গে দেখা হবে না।

- কারণ?

—দিন ছয়েক থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—কি বলছেন?

সুমিতা অন্যান্য রুগীর মত ছিল না। সে বাগানে ঘুরে বেড়াত। শুধু রক্ষীরা নজর রাখত তার ওপর। দিন ছয়েক আগে রক্ষীদের অসতর্ক মুহূর্তে সে সরে পড়ে। স্থানীয় পুলিস অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি।

—আপনি এখুনি বললেন, সুমিতা অন্যান্য রুগীর মত ছিল না, তার অর্থ কি?

—অর্থ? তাহলে অনেক কথাই বলতে হয়। আমার দৃঢ় ধারণা সুমিতা পাগল নয়। তাকে এখানে আটকে রাখা হয়েছিল পাগল সাজিয়ে।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। অনুগ্রহ করে আমায় সমস্ত খুলে বলুন।

একটু ভেবে নিয়ে ডাঃ কর বললেন, আমি প্রায় বছর খানেক হল এই হাসপাতালে এসেছি। আমি এখানে কাজে যোগ দেবার পরই সুমিতার হাবভাব লক্ষ্য করে এবং তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছিলাম, মেয়েটি পাগল নয়। আমি উপরওয়ালাকে জানালাম একথা। তিনি বললেন, ও কেসটা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। মেয়েটি যেভাবে আছে থাকতে দিন। এখানে আপনাকে আমি বলে রাখি, শৈলবিকাশ চৌধুরী এই হাসপাতালের অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন। যাই হোক, মেয়েটির জন্যে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। এই পাগলা গারদের মধ্যে মিছিমিছি কেন তাকে ধরে রাখা হয়েছে? শেষে একদিন মিস্টার চৌধুরীকে বললাম। এমনও আভাষ দিলাম, এই কথা পুলিসের কানে উঠলে তাঁর মানসম্মান সমস্তই নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি আমায় বলেন, তাকে শিগগিরই এখান থেকে নিয়ে যাবেন। তারপর হচ্ছে হবে করে এতগুলো দিন গড়িয়ে গেল।

বাসব বলল, মিস্টার চৌধুরী প্রায়ই আসতেন এখানে?

—সপ্তাহে দু'তিনবার তো বটেই।

—মেয়েটিকে তাহলে ছ'দিন হল পাওয়া যাচ্ছে না।

—হ্যাঁ।

—মেয়েটির ঠিকানা জানেন আপনি?

—না।

—ধন্যবাদ ডাক্তার কর। উপস্থিত আমার আর কোন প্রশ্ন নেই। এবার আমি উঠব।

—সে কি, চা না খেয়ে...

—না, না, ওসব হাঙ্গামা আর করবেন না। আমি ন'টা ছাপান্নর ট্রেনটা ধরতে চাই।

বাসব উঠে পড়ল। ওকে গেট অবধি পেঁছে দিয়ে গেলেন ডাঃ কর।

চিন্তিত মনে বাসব স্টেশনের দিকে চলল। ও যেসব প্রশ্ন ডাঃ করকে করবে বলে এখানে এসেছিল, তার কোন প্রয়োজনই পড়ল না। বরং অনেক মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করে ও ফিরে চলেছে।

ড্রইংরুমেই অপেক্ষা করছিল শৈবাল। বাসবকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই বলল, শুনলাম ভোরেই বেরিয়ে গিয়েছিলে? কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

বাসব সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে নির্বিকার গলায় বলল, পাগলা গারদে।

—কেন?

—ওখানেই নিজের পাকা ব্যবস্থা করে নেব বলে।

শৈবাল কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠল। বাসব এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।—হ্যালো....কে ইন্সপেক্টর রায়? বলুন?

সকালেই লেকের জলে লোক নামিয়েছিলেন....রিভলবার পাওয়া গেছে কাদার মধ্যে আটকে ছিল দেখা যাচ্ছে আমার অনুমান মিথ্যে হয়নি টেলিফোনের সম্বন্ধে কি হল ? খোঁজ নিয়ে দেখলেন...সেদিন সাড়ে দশটার সময় মিস্টার চৌধুরীর বাড়ি থেকেই ফোন করা হয়েছিল ...দুটো উত্তরই সন্তোষজনক। শুনুন, আজ সন্ধ্যার সময় চৌধুরীদের পুরানো চাকর হরিহর না হরিপদ কি নাম যেন তাকে নিয়ে আমার এখানে আসবেন ? আসবেন, বেশ আমি অপেক্ষা করব।

বাসব ফোন ছেড়ে দিল।

—ডাক্তার, শুনলে কথাগুলো, ক্রমে ক্রমে কি রকম অ্যাকিউরেট হয়ে পড়ছি দেখছ তো ? কিন্তু এখন একবার বাহাদুরের খোঁজ করতে হয়।

শৈবাল বলল, আমি আসার পরই ও বেরিয়ে গেছে।

তুমি কতক্ষণ হল এসেছ ?

- ঘণ্টা দেড়েক হবে।

—বাহাদুর তাহলে এ খুনি ফিরবে।

বাসবের কথা শেষ হবার পরই বাহাদুর ঘরে প্রবেশ করল। সে পকেট থেকে একটা খাম বার করে বাসবের হাতে দিল। খামের মধ্যেকার কাগজটা দেখে নিয়ে বাসব বলল, চল ডাক্তার. কসবা থেকে ঘুরে আসি।

—ভাই, ক্রমেই তুমি রহস্যময় হয়ে উঠছ। কেনই বা তুমি পাগলাগারদে গিয়েছিলে ? বাহাদুর খামের মধ্যেই বা কি আনল ?

—বিশেষ কিছু নয়। আমার চিঠি নিয়ে বাহাদুরকে যেতে বলেছিলাম তাপস দত্তর কাছে। সেই মেয়েটির ঠিকানা নিয়ে আসবার জন্যে। মিঃ দত্ত চিঠির উত্তর দিয়েছেন, ঠিকানাও পাঠিয়েছেন ওই সঙ্গে। আর পাগলাগারদের ব্যাপারটা চল পথ যেতে যেতে বলব।

রং চটে যাওয়া সেকেলে একতলা বাড়ি।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলেন এক বৃদ্ধা। বৃদ্ধার দেহে বিধবার বেশ। বয়স আন্দাজ করা দুষ্কর। কমঠ দেহ। বলিরেখা কণ্টকিত মুখ। বোধহয় এককালে সুন্দরী ছিলেন। বাসব ও শৈবালকে দেখে তিনি কর্কশ গলায় বললেন, কি চাই ?

—এটা কি সুলোচনাদেবীর বাড়ি ?

—আমিই সুলোচনা। কি দরকার আপনাদের ?

—শুনেছেন বোধহয়, শৈলবিকাশ চৌধুরী নিহত হয়েছেন ? সেই সম্পর্কেই

—ঠিক সেই সম্পর্কে নয়, অর্থাৎ আমি সুনিতাদেবী ও মিস্টার চৌধুরী সম্বন্ধে গোটা কতক কথা আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে এসেছিলাম।

বৃদ্ধা ওদের দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, পুলিসের লোক! তোমাদের শৈলবিকাশ চৌধুরী মরে গেছে শুনে খুশি হলাম। না মরলে আমিই বোধহয় একদিন বঁটি দিয়ে তার গলাটা কেটে ফেলতাম। তার মত ছোটলোক ও ইতর

পৃথিবীতে জন্মায়নি।

বাসব বলল, তা হতে পারে। কিন্তু .

কিন্তু আবার কি? বড়লোকের দালালি: লোকটা মরেও আমাকে জ্বালাচ্ছে।

—আপনি কি খবর পেয়েছেন, সুমিতাদেবীকে পাওয়া যাচ্ছে না?

তাকে ধরে রাখবার মত পাগলাগারদ এখনো এদেশে তৈরি হয়নি।

কথাটা বলেই তিনি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বাসব ও শৈবাল মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

তোমাদের শাস্ত্রে এটাকে কি রোগ বলে ডাক্তার?

মৃদু হেসে শৈবাল বলল, মহিলাটি বোধহয় কম্বোফোবিয়ায় ভুগছেন।

ওরা ফিরে এল হ্যাঙ্গারফোড স্ট্রীটে।

সারাটা দুপুর বাসব ল্যাবরেটরিতে কাটিয়ে দিল।

সুলোচনাদেবীর ওখান থেকে ফিরেই শৈবাল নিজের বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। আজ তার ফার্স্ট আওয়ারেই ডিউটি। শৈবাল যখন বিকেলে আবার এখানে এল, তখন বাসব ড্রইংরুমে বসে সিগারেট টানছে। মুখে ওর প্রফুল্ল ভাব।

এস ডাক্তার। সহাস্যে আহ্বান জানাল বাসব।

শৈবাল বসতে বসতে বলল, কিহে, এত হাসি-হাসি ভাব যে?

অনেকখানি এগিয়ে গেছি। আর একটা অবস্ট্রাকসন পার হতে পারলেই হত্যাকারীকে তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরতে পারব।

তুমি বুঝতে পেরেছ কে খুনী?

মোটামুটি পেরেছি বৈকি। তোমার কি মনে হয় সুমিতাদেবী হত্যাকারী হওয়া সম্ভব?

সুমিতাদেবী!

কেন নয়? আমরা জানতে পেরেছি তিনি পাগল নন। যে কোন কারণেই হোক মিস্টার চৌধুরী তাঁকে ওখানে আটক রেখেছিলেন। ঘোর অবিচার করেছিলেন তাঁর প্রতি—এতে কি তাঁর মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠতে পারে না?

তা অবশ্য পারে। তিনি মিস্টার চৌধুরীর মৃত্যুর আগেই পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে গেছেন, এতে মোটিভ স্ট্রং হচ্ছে। তবে ...এখন মহিলাটি কোথায় আছেন বলে তোমার ধারণা?

সুলোচনাদেবীর কাছে। সেই রকমই অনুমান করছি।

তাহলে পুলিসে খবর দিলেই তো হয়।

বাসব সিগারেট দীর্ঘ টান দিয়ে নির্বিকার ভাবে বলল, কি দরকার।

শৈবাল সব সময় বাসবকে বুঝে উঠতে পারে না। সুমিতাকে সন্দেহই হয়, তাহলে তাকে খুঁজে বার করতে দোষ কি? শৈবাল আর ও সম্বন্ধে প্রশ্ন করল না। বলল, তুমি সেদিন সৌর্যবিকাশ চৌধুরীকে নিজের হাতে দাড়ি কামান কিনা প্রশ্ন করছিলে কেন?

তাঁর গালে কতকগুলো কাটা দাগ দেখে আমায় প্রশ্ন করতে হয়েছিল।

এই তদন্তের সঙ্গে ওই কাটা দাগের সম্পর্ক কি?

হয়তো কিছু সম্পর্ক আছে। তাঁর মুখে কাটা দাগ দেখে আমি নিশ্চিত হলাম কোন নাপিতের হাতে এ রকম হয়নি। নাপিতের পেশা দাড়ি কামানো। সে কখনো কারুর দাড়ি কামাতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে না। প্রশ্নের উত্তরে জানলাম, দাড়ি তিনি নিয়মিত নিজে কামান। কাজেই কোন হ্যাবিচুয়েটেড লোক রাত্রে দাড়ি কামালেও নিজের গলা ওই ভাবে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে না। তাহলে গালের অবস্থা ওরকম হল কেন? যদি তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে বলতেন, ভোরে বেরুবার তাড়া থাকায় রাত্রেই দাড়িটা কামিয়ে নিতে গিয়ে গাল কেটে ফেলেছিলেন, তাহলে কোন সন্দেহ হত না। কিন্তু কথাটা এড়িয়ে গিয়েই তিনি আমাকে সন্দেহকুল করে তুলেছেন। আমার দৃঢ় ধারণা দাড়ি কামাতে কামাতে তিনি এমন কিছু দেখে-ছিলেন, যাতে তিনি নার্ভাস হয়ে পড়েন, হাত কেঁপে যায় এবং কেটে যায় গালের এখানে ওখানে।

—কিন্তু দেখেছিলেন কি?

ইন্সপেক্টর রায় ঘরে প্রবেশ করলেন এই সময়। তার সঙ্গে আধাবয়সী একটি লোক।

তিনি বললেন, হরিহরকে সঙ্গে নিয়ে এলাম।

আপাদমস্তক হরিহরকে দেখে নিয়ে বাসব বলল, চৌধুরী বাড়িতে কতদিন কাজ করছ?

- আজ্ঞে, বছর কুড়ি হবে।

ঘিয়ে ভাজা চেহারা হরিহরের। মুখে নির্লিপ্ত ভাব।

—শৈলবিকাশবাবু তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন?

—সব বড়লোক মনিব এক ধরনের হয় না কর্তা।

বুঝতে পারা গেল হরিহরের কথায় বেশ বাঁধুনি আছে।

—তিনি লোক কেমন ছিলেন?

—অনেকেই তাঁকে ভাল বলত।

—আচ্ছা হরিহর, শৈলবাবুর ছাড়া ও-বাড়িতে আর কারুর বন্দুক আছে কি?

—মেজবাবুর আছে। পিস্তল না কি বলে, তাই।

বাসব ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি হরিহরকে নিয়ে একটু আসছি।

ও হরিহরকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট দশেক পরে ফিরে এল একলা।

লোকটা কোথায় গেল? ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন।

তাকে ছেড়ে দিলাম।

শৈবাল বলল, ওকে আড়ালে নিয়ে গেলে যে?

কিছু কথা ছিল, তোমাদের বলব পরে।

কিন্তু লোকটার কথাবার্তা কি রকম দেখেছ? কুড়ি বছর কাজ করছে, তবু

মালিকের সম্বন্ধে ধারণা খুব উঁচু নয়।

বাসব অল্প একটু হেসে বলল, ইংরাজিতে একটা কথা আছে, 'নো ম্যান ইজ হিরো টু হিজ ভ্যালে।' এবার চৌধুরীবাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসা যাক।

সকলেই যে যার ঘরে ছিলেন। শুধু তাপস দত্ত অপেক্ষা করছিলেন ড্রইংরুমে। বাসব তাঁর কাছে বাহাদুরকে দিয়ে যে চিঠি পাঠিয়েছিল, আজ সন্ধ্যায় এখানে উপস্থিত থাকার বিষয় উল্লেখ ছিল তাতে।

মৃত্যুর মতই নীরব হয়ে রয়েছে চৌধুরীদের বাড়িটা।

বাসব বলল, সৌর্যবিকাশবাবুকে ডাকান তো।

তাপস দত্ত ডেকে আনলেন তাঁকে। তিনি কোচে এসে বসার পরই বাসব প্রশ্ন করল, আপনার রিভলবারটা নিয়ে আসুন তো?

সৌর্যবিকাশের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

রিভলবার ...মানে .

ইতস্তত করছেন কেন?

আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, প্রায় দিন দশেক থেকে রিভলবারটা আমি পাচ্ছি না।

আমরা পেয়েছি। লেকের জলে পাওয়া গেছে সেটা।

লেকের জলে!!!

আপনার কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে রিভলবারটা চুরি গিয়েছিল ধরে নিতে হবে। কে চুরি করেছিল সন্দেহ করেন? আপনি এর কি উত্তর দেবেন, তা আমি জানি। শুনুন মিস্টার চৌধুরী, আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করব, তার উত্তর যদি সঠিক না দেন তাহলে ইন্সপেক্টর আপনাকে থানায় নিয়ে যেতে বাধ্য হবেন

কাঁপা গলায় সৌর্যবিকাশ বললেন, বলুন?

সেদিন রাত্রে দাড়ি কামাতে গিয়ে আপনার হাত কেঁপেছিল কেন? কেন আপনি নার্ভাস হয়ে গিয়ে নিজের গাল কেটে ফেলেছিলেন?

আমি .

ঠিক সেই সময় চন্দ্রবিকাশ ঘরে এলেন। বললেন তীব্র গলায়, যদি কিছু জানা থাকে তবে বল, কেন তুমি মিছিমিছি চেপে যাচ্ছ। তুমি কি চাও না দাদার হত্যাকারী ধরা পড়ুক?

তুমি আমাকে উপদেশ দিতে এস না চন্দ্র। কাকে আমি কি বলব না বলব তা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন। শুনুন, মিস্টার ব্যানার্জী—সেকথা চেপে রেখে আর লাভ নেই। তখন প্রায় সাড়ে দশটা। আমি সবে দাড়ি কামাতে বসেছি, এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলেন সুমিতাদি। তাঁর সঙ্গে দাদার বিয়ে হবার কথা ছিল, কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে রাখা হয়েছিল মেণ্টাল হসপিটালে। সেই সুমিতাদিকে আমার ঘরে ঢুকতে দেখে ঘাবড়ে গেলাম। রেজারের ঘা লাগল গালের কোথাও কোথাও। তিনি তখন উত্তেজনায় ফুলছিলেন। আমাকে প্রশ্ন

করলেন, সে কোথায়। বললাম, কার কথা জিজ্ঞেস করছেন? তিনি ঘর থেকে আবার ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন।

আগে একথা আমাদের বলেননি কেন?

কেন জানি না ভুল হয়েছিল।

এই সময় দ্বারপ্রান্তে হরিহরকে দেখা গেল। তার হাতে বেশ বড় গোছের একটা খবরের কাগজের প্যাকেট। বাসব উঠে গেল। হরিহরকে নিয়ে আড়ালে গেল একটু। মিনিট কয়েক পরে আবার যখন নিজের জায়গায় ফিরে এল তখন ওর হাতে সেই বড় প্যাকেটটা।

এবার আমি আপনাদের একটা চিঠি দেখাব। হাতের লেখাটা চেনবার চেষ্টা করুন।

শৈলবিকাশ চৌধুরীর অফিস ঘরের ড্রয়ারে পাওয়া সেই চিঠিটা বাসব পকেট থেকে বার করল, সেটা তিনি কাকে যেন লিখেছিলেন বুঝতে পারা যাচ্ছে না। চিঠিটা প্রথমে চন্দ্রবিকাশের দিকে এগিয়ে ধরল বাসব।

চন্দ্রবিকাশ একনজর দেখে নিয়ে বললেন, দাদার হাতের লেখা নয়।

—আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তাঁর নাম সই করে চিঠিখানা অন্য কেউ লিখেছে।

-- সৌর্যবিকাশবাবু আপনি দেখুন তো?

চন্দ্র ঠিকই বলেছে। হাতের লেখা বা সই দাদার নয়।

— তাপসবাবু, আপনার কি মত?

বাসব চিঠিখানা এবার তাপস দত্তর দিকে এগিয়ে দিল। তিনি চিঠিখানা নেড়ে-চেড়ে বললেন, চৌধুরীর হাতের লেখা নয়।

—কার লেখা হতে পারে?

—তা আমি বলব কিভাবে?

—আপনি একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। নিজের হাতের লেখা চিনতে আপনার কি এতই কষ্ট হচ্ছে মিস্টার দত্ত?

—নিজের হাতের লেখা !!!

ঘরের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠল। তাপস দত্ত কিছু বলবার জন্যে মুখ খুলছিলেন, কিন্তু তার আগেই বাসব বলল, প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করবেন না। আজ সকালে আমার বাহাদুরের হাত দিয়ে যে চিঠি আপনি পাঠিয়েছিলেন, সেই হাতের লেখার সঙ্গে এই চিঠির হাতের লেখার হুবহু মিল আছে। শুধু তাই নয়, আমি এও জানি চিঠিখানা আপনি কাকে লিখেছিলেন। পরস্ত্রীকে ...

—মিস্টার ব্যানার্জী ভুলে যাবেন না, আপনাকে অ্যাপয়েন্টেড আমিই করেছি।

—এত দুর্বল স্মরণশক্তি আমার নয়। কিন্তু আপনি আমার সম্বন্ধে কিছু ভুল ধারণা নিয়ে আছেন মিস্টার দত্ত। আপনি আমাকে অ্যাপয়েন্টেড করেছেন বলে আপনার সমস্ত দোষ-ত্রুটি আমি ওভারলুক করব এর কোন সঙ্গত কারণ আছে কি?

ঠিক এই সময় ঝনঝন শব্দে কাচ ভাঙার শব্দ পাওয়া গেল। পরমুহূর্তে নারী-কণ্ঠের তীব্র চিৎকার। সকলে সচকিত হয়ে উঠলেন। তারপর শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেলেন সকলে। শব্দটা যেন মিসেস চৌধুরীর ঘর থেকে এল।

অনুমান মিথ্যে নয়, খাটের ওপর উপুর হয়ে পড়ে আছেন রত্নমালা চৌধুরী। সকলকে দেখে তিনি কোনরকমে উঠে বসলেন। ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে উঠেছে। সৌর্যবিকাশ কাছে গিয়ে বললেন, কি হয়েছে বৌদি ?

ভীতভাবে তিনি বললেন, বাগানের দিকের জানলার কাচ ভেঙ্গে কে আমায় দেখল।

—কে ? কে ছিল, তুমি বুঝতে পারনি ?

—বোধহয় সুমিতা !

—সুমিতা‍া !!

চন্দ্রবিকাশ বাগানের দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন, বাসব তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, এখন বাগানে গিয়ে লাভ নেই। আপনার সুমিতাদিকে আর ওখানে পাবেন না।—ও ফিরে দাঁড়াল ইন্সপেক্টরের দিকে।—আমি ভেবেছিলাম, আজ বোধহয় কাজ গুটিয়ে ফেলতে পারব না। কিন্তু হরিহরের অনবদ্য সহযোগিতা পেয়ে এই রহস্যের উপর যবনিকা এখুনি ফেলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আপনিও নিশ্চয়ই সেই বিশেষ ব্যক্তিটির হাতে হ্যান্ডকাপ পরাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন ? হ্যাঁ, আমি বলব, এখুনি বলব মিস্টার চৌধুরীর হত্যাকারী কে। এখন তিনি আমাদেরই সঙ্গে এই ঘরে উপস্থিত রয়েছেন।

ইন্সপেক্টর রায় বললেন, কার কথা আপনি বলছেন মিস্টার ব্যানার্জী ?

আপনারা সকলে বসুন। হত্যাকারীর নাম বলার আগে আমি আরো গোটা-কতক কথা বলব।

সকলে বসলেন।

বাসব আবার বলল, আপনাকে আগেই বলেছিলাম ইন্সপেক্টর, মিস্টার চৌধুরীকে হত্যাকারী আংটি, ঘড়ি ইত্যাদির জন্যে হত্যা করেনি, তার ছিল অন্য উদ্দেশ্য। এখনও আমি সেই কথারই পুনরুক্তি করছি। সেই সঙ্গে জানিয়ে রাখছি হত্যার উদ্দেশ্য। কারুর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মিঃ চৌধুরী, কাজেই তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হত্যাকারী কে ? আপনারা আমার হাতে একটা কাগজের মোড়ক দেখছেন, এর সাহায্যেই হত্যাকারীকে সকলের সামনে আমি তুলে ধরব।

সকলে উৎসুক হয়ে বাসবের হস্তস্থিত মোড়কটার দিকে তাকাল। বাসব মোড়কের কাগজটা খসিয়ে ফেলে বলল, এই সেই ক্যাঙ্গারুর চামড়ার ওভারকোট —যা পরে সেদিন হত্যাকারী মিস্টার চৌধুরীকে হত্যা করেছিল। ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটেছিল এবার আপনাদের বলি। সাড়ে দশটার সময় হত্যাকারী মিস্টার চৌধুরীকে বিয়ে বাড়িতে ফোন করে বলে সে তাঁর জন্যে লেকের অমুখ জায়গায় অপেক্ষা করছে। বিশেষ কথা আছে। মিস্টার চৌধুরী সরল মনে

নির্দিষ্ট জায়গায় আসেন। হত্যাকারী তাঁর অপেক্ষায় কেয়াঝাড়ের কাছে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় কাঁটায় খোঁচা লেগে কোটের কিছুটা চামড়া ছিঁড়ে যায়। সে আগেই সৌর্যবাবুর রিভলবারটা হাতিয়ে রেখেছিল। মিস্টার চৌধুরী এসে পড়বার পর তাঁর সঙ্গে তার কথা হতে থাকে। সে সময় হত্যাকারী ব্রীজের রেলিংয়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রেলিংয়ের কাঁচা রঙ তাই তার কোটে লেগে যায়। আপনারা তাকিয়ে দেখুন আমার কথা ঠিক কিনা।

ওভারকোটের পিছন দিকে রুপোলি রঙ লেগে রয়েছে আড়াআড়ি ভাবে।

সকলে দেখলেন। কেউ কিছু বললেন না। পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করতে লাগল ঘরের মধ্যে।

আপনারা কেউ কিছুই বলছেন না। বেশ, আমিই প্রশ্ন করছি, সৌর্যবাবু, এই কোটটা কার বলতে পারেন?

সৌর্যবিকাশ মাথা নত করলেন।

চন্দ্রবাবু, আপনি ?

তিনিও মাটির দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

তাপসবাবু, আপনি বলবেন কিছু ?

তাপস দত্তও নীরব রইলেন।

বাসব বলল, আশা করেছিলাম আপনারা সত্যি কথা বলবেন, যে ক্ষেত্রে এই কোটটি আপনাদের অপরিচিত নয়। মিসেস চৌধুরী আপনি কিছু বলবেন?

রত্নমালা চৌধুরী কাঁপা গলায় বললেন, আমি…

হ্যাঁ, আপনি। এই কোটটি আপনার ছাড়া আর কার হতে পারে? সকলেই কোটটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ব্যাপারটা আঁচ করেছেন। তবু আমি পরিষ্কার করে বলি, আপনি রত্নমালা চৌধুরী, আপনার স্বামী শৈলবিকাশ চৌধুরীকে স্বার্থ অনুকূলে হত্যা করেছেন।

রত্নমালা কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। সারা শরীর তাঁর কাঁপছে। এই শীতেও অজস্র ঘামের ফোঁটায় ক্রমেই ভিজে উঠছে মুখ।

মিসেস চৌধুরী, আমি জানি অন্তর্দ্বন্দ্বের শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছেন আপনি। এই রকম একটা গর্হিত কাজ করবার পর আপনার মন অনুশোচনায় ভরে রয়েছে। স্বামীর কাছ থেকে বারবার উপেক্ষা পেয়ে আপনার মন মোড় নিয়েছে—আর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিলেন তাপসবাবু। আপনাদের দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সমস্ত সাবধানতাকে ছাপিয়ে শৈলবিকাশের চোখে একদিন এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এবং এর পর আপনাদের দুজনের মধ্যে কি হয়েছিল আমি জানি না। তবে এটুকু অনুমান করতে পারি, আপনি নিজে ভাল ভাবে বাঁচবার জন্যে মিঃ চৌধুরীকে পথ থেকে সরাবার পরিকল্পনা করেছিলেন তারপরই।

ঘরের মধ্যে এখনো পরিপূর্ণ নীরবতা।

শুধু রত্নমালার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অজস্র জল। বিছানায় মুখ রেখে

ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন তিনি। ইন্সপেক্টর রায় উঠে দাঁড়ালেন। একটু ইতস্তত করে বললেন, মিসেস চৌধুরী, আমার সঙ্গে আপনাকে থানায় যেতে হবে। বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে।

পরের দিন সন্ধ্যায় হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়ির ড্রইংরুমে বসে বাসব, শৈবাল ও ইন্সপেক্টর রায় গল্প করছিলেন। মিসেস চৌধুরী কনফেস করেছেন, সেই কথাই বলছিলেন ইন্সপেক্টর।

শৈবাল বলল, তুমি ধরলে কি ভাবে মিসেস চৌধুরীই মার্ডারার?

বাসব বলল আমি ঠিক ধবব বলে ধরিনি। ভদ্রমহিলা দৈবাৎ আমার চোখে পড়ে গেছেন।

কি রকম?

চৌধুরীবাড়িতে তদন্তে যাওয়ার পর আমি যখন সকলের সঙ্গে কথা বললাম, তখনো কারুর ওপর সন্দেহ করতে পারিনি। কিন্তু মিস্টার চৌধুরীর অফিস ঘরে যে তিনটি জিনিস সংগ্রহ করলাম, তাতেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। এখানে আমি বলে রাখি ডাইরেক্ট কোন প্রমাণ আমি মিসেস চৌধুরীর বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারিনি। যাই হোক তিনি কনফেস করেছেন, কাজেই সমস্ত গোলমাল মিটে গেছে। এখন প্রকৃত ব্যাপারটা বলি। মিঃ চৌধুরীর অফিস-ঘরের ড্রয়ার থেকে যে বিশেষ চিঠিখানা পেয়েছিলাম তার থেকে তিনটে ফিঙ্গারপ্রিণ্ট পাওয়া গেল। একটা নিশ্চয়ই মিঃ চৌধুরীর—বাকি দুটো কার? তাছাড়া মিস্টার চৌধুরী কাউকে চিঠি লিখে আবার চিঠিখানা নিজের কাছে রেখে দেবেন কেন? আমি ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা আমার মনে জাগল। এমন তো হতে পারে, এই চিঠিটা মিস্টার চৌধুরীর নাম দিয়ে কেউ অন্য কাউকে লিখেছিল। তাই বোধহয় তিনটি ছাপ পাওয়া যাচ্ছে চিঠির কাগজে। সমস্যা আমার চোখের ওপর উত্তরোত্তর ঘন হতে লাগল। এই চিঠিটা কি খুনের ব্যাপারে আলোকপাত করবে? আমি প্রত্যেকের হাতের লেখা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হলাম। সুমিতাদেবীর বাড়ির ঠিকানা তাপস দত্ত আমাকে দেবেন বলেছিলেন। কাজেই তাঁকে দিয়েই কাজ আরম্ভ করা গেল। একটা চিঠি দিয়ে আমি বাহাদুরকে পাঠালাম তাঁর কাছে। তিনি একটা চিঠি লিখে আমায় জানালেন সুমিতাদেবীর ঠিকানা। চিঠিটা পেয়েই আমি হাতের লেখা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলাম। ড্রয়ারে পাওয়া চিঠির হাতের লেখা এক। এবার আমি সুমিতাদেবীর ছবি থেকে হাতের ছাপ তোলবার চেষ্টা করলাম। ছবিখানা হাতে নিয়ে দেখেছিলেন মিসেস চৌধুরী। কাজেই তাঁর হাতের ছাপ পাওয়া গেল। এবং তাঁর হাতের ছাপের সঙ্গে চিঠিতে পাওয়া হাতের ছাপের হুবহু মিল হল। এবার আমি মোটামুটি ভাবে ব্যাপারটা আঁচ করে নিলাম, স্ত্রীকে ভালবাসতেন না মিস্টার চৌধুরী। উপেক্ষা আর অবজ্ঞাই দেখাতেন বোধহয় তাঁকে। এই কারণেই বোধহয় তাপস দত্ত আর তাঁর মধ্যে অন্তরঙ্গতা হয়। তাপস দত্ত তাঁকে প্রয়োজন বোধে শৈলবিকাশ চৌধুরীর নামসই

করেই চিঠি দিতেন। এই ভাবেই চলছিল। চলতও বোধহয়, যদি না আমার পাওয়া চিঠিটা মিস্টার চৌধুরী হাতে পেতেন। নিশ্চয়ই তিনি এ বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বলেছিলেন এবং এই বলার জন্যেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হল।

বাসব একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন, আমার সন্দেহ গিয়ে পড়ল তাপস দত্তর ওপর! কারণ তাঁর পক্ষেই মিস্টার চৌধুরীকে মেরে পথ পরিষ্কার করা সম্ভব। কিন্তু ক্যাঙ্গারুর চামড়ার সেই টুকরোটা গোলমাল বাধাল। আমি এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম, চামড়াটা চশমার খাপ বা স্যুটকেশের নয়। কারণ খুনী খুন করবার সময় স্যুটকেশ বয়ে নিয়ে যাবে কেন? আর চশমার খাপের চামড়া হ'লে টুকরোটা ওভাবেই বা ওখানে ছিঁড়ে পড়ে থাকবে কেন? আমি আবার অস্ট্রেলিয়ান ট্রেড কমিশনে গেলাম। ওখানে গিয়ে খোঁজ নিলাম ক্যাঙ্গারুর চামড়ার পোশাক তৈরি হয় কিনা। তাঁরা বললেন, জ্যাকেট ইত্যাদি তৈরি হয়। আমার বুঝতে বিলম্ব হল না, হত্যাকারীর গায়ে ওভারকোট ছিল। কেয়া গাছের কাঁটায় লেগে ওই চামড়াটুকু ছিঁড়ে যায় কোন সময়। ওভারকোটটা কার এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে আমি হরিহরের সাহায্য নিলাম। প্রথমে সে কিছুতেই বলতে চায় না, শেষে তার হাতে দুটো দশ টাকার নোট গুঁজে দিতেই বলল, ওই ধরনের কোট বৌমার আছে। আর একটা নোট তার হাতে গুঁজে দিতেই সে রাজি হল আমায় কোটটা এনে দেখাতে। এরপর আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাছাড়া সৌর্যবিকাশের রিভলবার বাইরের লোক তাপস দত্তর পক্ষে চুরি করা খুবই কষ্টকর। অথচ এই কাজটা সহজেই করতে পারেন মিসেস চৌধুরী। এরপরের ঘটনা সকলের চোখের ওপর ঘটেছে—।

ইন্সপেক্টর বললেন, মিসেস চৌধুরী মিস্টার চৌধুরীকে লেকের কাছে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন কি বলে?

এ বিষয়ে আমি সঠিক কিছু বলতে পারব না। তবে মনে হয় তিনি বোধহয় বলেছিলেন, সুমিতা হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছে। তাকে আমরা লেকের অমুক জায়গায় আটকে রেখেছি। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস ইত্যাদি। আবার অন্য কোন কথাও বলে থাকতে পারেন।

কিন্তু একটা বিষয় তুমি মোটেই উল্লেখ করলে না। শৈবাল বলল।

কোন বিষয়।

সুমিতাদেবী সংক্রান্ত বিষয়।

ওটা একটা আলাদা ইসু ডাক্তার। আমি এই খুনের সঙ্গে ওই ব্যাপারটাকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। অবশ্য অস্বীকার করছি না যে ওই ব্যাপারে কোন রহস্য নেই। মিস্টার চৌধুরী কেন একটি সুস্থ মেয়েকে পাগলাগারদে আটকে রেখেছিলেন তার নিশ্চয়ই কোন সঙ্গত বা অসঙ্গত কারণ আছে। তবে তার সঙ্গে এই খুনের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ কোয়েন্সিডেন্স দেখ ঠিক এই সময়ই সুমিতাদেবী পাগলাগারদ থেকে অদৃশ্য হয়েছিলেন।

গতকাল তাহলে সত্যিই সুমিতাদেবী মিসেস চৌধুরীর জানলা ভেঙ্গেছিলেন।

সত্যি হতেও পারে। তাঁর অজানা নয় মিস্টার চৌধুরীর হত্যার কথা। হয়তো এসেছিলেন মিসেস চৌধুরীকে কিছু বলতে। হয়তো তিনি মিসেস চৌধুরীকে সন্দেহই করেছিলেন ?

ইন্সপেক্টর বললেন, লোকে যা বলে মিথ্যে বলে না।

কোন বিষয় ?

আপনার প্রতিভার বিষয়।

অল্প একটু বাসব হাসল।

বাহাদুর সেই সময় ট্রেতে কফির পেয়ালা সাজিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

উৎসর্গ

মাঝোলকে ঠিক শহর বলা যায় না।

আবার গ্রামও নয়।

শহর ও গ্রামের মাঝামাঝি একটা জায়গা করে নিয়েছে বিহারের এই জনপদটি। মাঝোলের প্রায় চারদিকেই পাহাড়। পাহাড়ের মধ্যে দিয়েই এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে মুঙ্গের-পাটনা হাইওয়ে। হাইওয়ের দুপাশে দেবদারুর সমারোহ। তাছাড়া পাহাড়ের তরাই অঞ্চলে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র বাওবাব আর মেহগিনি। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ মাঝোল ক্রমেই সমস্ত ভারতের স্বাস্থ্য সঞ্চয়-কারীদের কাছে লোভনীয় হয়ে উঠছে।

অক্টোবর মাস থেকে এখানে জনসমাগম আরম্ভ হয় এই মিছিল চলে মার্চ মাস পর্যন্ত। এই কমাসে মাঝোলে ভারতের সমস্ত প্রান্তের মানুষকেই দেখা যায়। দেখা যায়, ব্রীচেস বা কাউবয় ট্রাউজার পরে বাঙ্গালীরা চলেছেন বন্দুক হাতে নিয়ে শিকারের সন্ধানে। অথবা দেখা যাবে, প্রাকৃতিক লেকে হাল্কা নৌকা ভাসিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতেছেন পাঞ্জাবের অধিবাসীরা। হোটেলের বারান্দায় বা পাহাড়ের কোলে হ্যারিংটন চেয়ারে চোখ বুজে বসে স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় অবগাহন করছেন এরকম বহু মহারাষ্ট্রের অধিবাসীকে দেখা যাবে, যে কোন শীতকালে মাঝোলে গেলে।

অবশ্য মাঝোলের এই সুনাম খুব বেশি দিনের নয়। মাত্র বছর ত্রিশেক আগে বিহারের লোকেরাও এই অঞ্চলের নাম জানতেন না। মুঙ্গের জেলার শেষ প্রান্তে মাঝোল, এরপরই আরম্ভ হয়েছে পাটনা জেলা। ডেভিড স্টকপোর্ট ছিলেন তখন মুঙ্গেরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। শিকারের প্রতি তাঁর অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। প্রায়ই যেতেন নিজের প্রিয় মার্টিন হেনরী রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে শিকার করতে এখানে ওখানে। গোটা পনের বাঘের তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করেছিলেন। হায়না, হরিণ আর ভাল্লুক যে কত মেরেছিলেন, তা গুণে বলা শক্ত। তিনিই একদিন শিকার করতে গিয়ে মাঝোলে কয়লার সন্ধান পেলেন। তাঁর ধারণা হল এখানে বহু সহস্র একর জুড়ে কয়লার স্তর রয়েছে।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

মুঙ্গেরে ফিরেই এই সংবাদ নিজের উপরওয়ালাকে জানালেন ডেভিড স্টকপোর্ট।

সরকারের টনক নড়ল। এক্সপার্টরা এলেন। এবং পরিশেষে ডেভিড স্টকপোর্টের কথাই সত্য প্রমাণিত হল। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল এরপর, কোন বিদেশী ফার্মই এই অঞ্চল থেকে কয়লা তুলতে সম্মত হলেন না। কারণ-স্বরূপ তাঁরা বললেন, পাথর কেটে কয়লার স্তর বার করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। দ্বিতীয়তঃ, রেলপথ না থাকায় ব্যবসা মোটেই লাভজনক হবে না।

পরিস্থিতি যখন প্রায় অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন রণদাকান্ত রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হলেন। সরকারের কাছ থেকে ওই অঞ্চলটি ইজারা নিয়ে কয়লা তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

তিন পুরুষের পাটের ব্যবসায় অর্জিত অপর্যাপ্ত অর্থ উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিলেন রণদাকান্ত নাগচৌধুরী। সহস্র রকমের বয়ে যাবার পথ থাকা সত্ত্বেও টাকাগুলো নিয়ে বয়ে যাননি তিনি। তবে কেন জানা যায় না পাটের ব্যবসা ছেড়ে কয়লার ব্যবসায় মন দিয়েছিলেন। ঝরিয়ার কয়লাক্ষেত্র এক সাহেবের কাছ থেকে কিনেছিলেন। কয়লার খনি। যাই হোক, মাঝোলের কয়লা অঞ্চলেরও তিনি কর্তা হয়ে বসলেন। এবং বিদেশী কোম্পানীর ক্যালকুলেশনকে ভুল প্রতিপন্ন করে দিন দিন তিনি নিজের ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুললেন।

এরপর কত বছর কেটে গেছে।

কয়লার খনি নিয়েই শুধু ব্যস্ত থাকেননি রণদাকান্ত। স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতি নজর দিয়েছেন, মাঝোলকে মনোরম করবার চেষ্টায় সর্বদা ব্যাপৃত থেকেছেন।

তিনি এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন হাসপাতাল, পার্ক, রাস্তাঘাট আরো কত কি। হঠাৎ কি ভাবে যেন স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে মাঝোলের নাম ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। তারপর থেকেই জলস্রোতের মত প্রতি বছর এখানে লোক আসছে বেড়াতে।

যৌবনের সে উদ্দামতা আর নেই রণদাকান্তর। বুড়ো হয়ে গেছেন। ধপ ধপে সাদা না হলেও তাঁর মাথার চুল বিশেষ কালো নেই। বলিষ্ঠ দেহ এখন বেশ কিছুটা শীর্ণ। আজীবন সুখী এই মানুষটির মুখের উপর এখন ছেয়ে রয়েছে ক্লান্ত ছায়া।

আরো কিছুদিন স্বাস্থ্য সম্পদে উজ্জ্বল হয়ে থাকতেন তিনি হয়তো, যদি সুজাতা তাঁকে ছেড়ে না যেতেন। রণদাকান্তর জীবনে এই একটি মাত্র ট্রাজেডি। স্ত্রী সুজাতাকে তিনি ধরে রাখতে পারেননি। সৈকতের যখন মাত্র দশ বছর বয়স তখন রণদাকান্তকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সুজাতা।

দশ বছরের সৈকত এখন আঠাশ বছরের পূর্ণ যুবা। কলকাতা থেকে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট হয়ে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিল মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। দিন দশেক হল ভারতে ফিরেছে। মাঝোলেই আছে এখন। সৈকতই রণদাকান্তর একমাত্র সন্তান।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

ড্রইংরুমের কোচে গা এলিয়ে দিয়ে রণদাকান্ত নাগচৌধুরী একটা ফর্দ দেখছিলেন। কাছেই বিনীত ভাবে দাঁড়িয়েছিল তাঁর একান্ত সচিব সরোজ রুদ্র। এই শিক্ষিত উদ্বাস্তু যুবককে কলকাতা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তিনি।

ফর্দটা ভাল করে দেখে নিয়ে, সরোজের দিকে এগিয়ে ধরে রণদাকান্ত বললেন, ঠিক আছে। অতিথিদের যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখবে। বাড়িতেই সকলের স্থান সংকুলান হয়ে যাচ্ছে না গেস্টহাউসেও ব্যবস্থা

করতে হবে ?

সরোজ বলল, বাড়িতেই সকলের স্থান সংকুলান হয়ে যাবে।

ভাল। কালই তো সকলে আসছে, তাই না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্ধ্যা সাতটার সময় তুফান এক্সপ্রেসে সকলে মোকামায় এসে পেঁছাবেন।

রণদাকান্ত সিগার ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, দুখানা গাড়ি নিয়ে তুমি অপেক্ষা করবে ওখানে ওঁদের জন্যে। গোটা কয়েক ব্ল্যাঙ্কেট সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলো না। নইলে এই ঠাণ্ডায় গেস্টদের এতটা পথ মোটরে আসতে কষ্ট হবে। তুমি এখন যাও সরোজ।

সরোজ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, রণদাকান্ত আবার বললেন, সৈকতকে পাঠিয়ে দিও গিয়ে।

সরোজ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর নাগচৌধুরী সুজাতার অয়েল পেণ্টিং-এর দিকে তাকালেন। নামী শিল্পীর আঁকা চিত্রটি অদ্ভুত প্রাণবন্ত। সুজাতা হাসছেন।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন রণদাকান্ত। আজ সুজাতা বেঁচে থাকলে কত সুখী হতেন। তাঁর আদরের সৈকত বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরেছে। শুধু কি তাই, তার বিয়ের ব্যবস্থাও পাকাপাকি করে ফেলেছেন রণদাকান্ত।

ছোটখাট উৎসবের আয়োজনও করেছেন।

কলকাতা থেকে কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এখানে আসবার জন্যে। তাঁরা আসছেন কাল সন্ধ্যায় তুফান এক্সপ্রেসে, সৈকতের ভাবী স্ত্রী সুচেতাও আসছে ওই সঙ্গে।

রণদাকান্ত ছেলেকে অত্যন্ত স্বাধীনতা দিয়ে মানুষ করেছেন। কৈশোর অতিক্রম করবার পর থেকেই তার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন বন্ধুর মত। ইংল্যাণ্ডে যাবার আগেই নিজের মনের কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করেছিল সৈকত।

পাঠ্য জীবনে সুচেতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল ও। সেই পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পরিণত হতে খুব বেশি সময় নেয়নি। ছেলের আকাঙ্ক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে চাননি রণদাকান্ত। কেনই বা দাঁড়াবেন। সৈকতকে তিনি জানিয়েছিলেন, ইংল্যাণ্ড থেকে ও ফিরে এলেই ওদের বিয়ের ব্যবস্থা তিনি করবেন।

মেয়েটিকে রণদাকান্ত দেখেছেন।

পছন্দ হয়েছে তার।

বেশ শ্রীময়ী সুচেতা।

অবশ্য অতিথিদের কাছে ভেঙ্গে কিছু জানান হয়নি। তাঁদের ধারণা অতীতে কয়েকবার যেমন রণদাকান্ত সকলকে শিকার করবার জন্যে ডেকেছেন, এবারকার আমন্ত্রণও বুঝি সেই গোছেরই কিছু।

সৈকত ঘরে প্রবেশ করল।

একহারা লম্বা চেহারা ওর। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। সুশ্রী মুখ।

—আমায় ডাকছ বাবা? সৈকত বলল।

চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল রণদাকান্তর। তিনি বললেন হ্যাঁ। বস। কথা আছে।

বিসর্পিল গতিতে ধীরে ধীরে তুফান এক্সপ্রেস মোকামা স্টেশনে প্রবেশ করল। আসানসোল ছাড়বার পরই কিছু লেট হয়ে গিয়েছিল। তুফান অবশ্য মোকামায় ইন করেছে রাইট টাইমেই।

সরোজ একাই আসেনি অতিথিদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে। সৈকতও এসেছে। একে একে নেমে এলেন সকলে। তিনখানা প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে অতিথিরা নামলেন। ট্রেন থেকে প্রথমে যিনি নেমে সৈকতকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি ডাঃ দিবাকর গুপ্ত। তারপর প্ল্যাটফর্মের উপরই অভিনন্দনের বন্যা বয়ে গেল। সস্ত্রীক প্রশান্ত রায়, অরবিন্দ দত্ত, রত্নাদেবী, রজত ভৌমিক সকলেই ইংল্যান্ড থেকে যোগ্যতার সঙ্গে মাইনিং ডিগ্রী নিয়ে আসবার জন্যে অভিনন্দন জানালেন সৈকতকে। সুচেতা মুখে কিছু বলল না।

মিষ্টি করে হাসল শুধু।

সবশেষে ট্রেন থেকে নামল বাসব।

সম্প্রতি একটি রহস্যজনক তদন্তে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করবার পর নিজের কলকাতার বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সন্ধ্যার পর প্রত্যহ গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর সামন্ত আসতেন, চুটিয়ে গল্প হত দুজনের মধ্যে। ইদানীং অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বাসব।

গত পরশুদিন সন্ধ্যায়ও এই ধরনের গল্প গুজব হচ্ছিল।

টেলিফোন বেজে উঠল ঝনঝন শব্দে। ট্রাঙ্ক সিগন্যাল।

রিসিভার তুলে নিল বাসব। মাঝোল থেকে সৈকত ফোন করছে।

কলেজে কয়েক বছর একই সঙ্গে পড়েছে দুজনে। খুবই গাঢ় বন্ধুত্ব।

রিসিভার কানের কাছে তুলে নেবার পর তারের অপর প্রান্ত থেকে সৈকতের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই বিস্মিত বাসব বুঝতে পারল, ইংল্যান্ড থেকে সৈকত ফিরে এসেছে কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা না করেই বাড়ি চলে গেছে।

সৈকত তখন বলে চলেছে, রাগ কর না প্লীজ। দমদমে নেমেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া উচিত ছিল আমার। যাক ওকথা, এখন ফ্রি আছ নাকি?

বাসব বলল, বর্ত্তমানে আমার হাতে কোন কেস নেই।

— যাক, বাঁচালে। তোমার হাতে কেস থাকলে আমি ভীষণ মুষড়ে পড়তাম।

—কেন বলত?

তারের মধ্যে দিয়ে সৈকতের হাসি ভেসে এল।—আসল কথা হল, আগামী পরশু তুমি আমাদের এখানে চলে আসবে এই আমার ইচ্ছে। অনেকেই আসছেন। বাবা সকলকে নিয়ে আনন্দে কয়েকদিন কাটাতে চান এই আর কি। কি হে

আসছ তো ?

– তোমার এই ঘোড়ায় লাগাম দেওয়া স্বভাবটা আজো গেল না সৈকত। চুপচাপ বসে রয়েছি, যেতে আপত্তি কি। কোন্ ট্রেনে গেলে সুবিধা হবে।

—শুনে থাকবে বোধহয় মাঝোলে ট্রেনে আসবার উপায় নেই। মোকামাই হল আমাদের স্টেশন। ওখান থেকে মাঝোলের দূরত্ব তেতাল্লিশ মাইল। তুমি আগামী পরশু তুফান অ্যাভেল করবে। অন্য অতিথিরা ওতে আসছেন।

আরো দুচার কথা বলে লাইন কেটে দিল সৈকত।

বাসব কয়েকদিন থেকেই ভাবছিল এই অলস দিনগুলো যেন আর কাটতে চাইছে চাইছে না। ভালই হল, কয়েকদিন অন্ততঃ বেশ বৈচিত্রের মধ্যে দিয়েই কাটবে

বাসবকে ট্রেন থেকে নামতে দেখে সৈকত বলল, আমি ভাবলাম তুমি বুঝি আর এলে না।

—কেন ? তোমার এ-ধারণা হবার কারণ।

– তুমি হলে গোয়েন্দা মানুষ। হয়তো আমাকে ফোনে কথা দেবার পরই কোন রহস্যজনক কেস তোমার হাতে এল। তুমিও ছুটলে সেই রহস্যের পিছনে।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে বাসব বলল, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেরকম ঘটনা ঘটেনি। ভাল কথা, এখানে আমার জন্যে কোন রহস্য ওৎ পেতে নেই তো ?

সহাস্যে সৈকত বলল, নিশ্চিত থাকতে পার। তুমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠ এরকম কোন ঘটনা নিশ্চয় ঘটবে না এখানে।

স্টেশনের বাইরে দুখানা মোটর অপেক্ষা করছিল।

দুদলে বিভক্ত হয়ে অতিথিরা বসলেন দুখানা গাড়িতে।

চওড়া অ্যাসফ্যাল্টে মোড়া রাস্তার উপর দিয়ে ছুটে চলল গাড়ি দুটো। আরোহীরা সকলেই নিজের পায়ের উপর কম্বল ফেলে নিয়েছেন। গায়ে অপর্যাপ্ত গরম কাপড় রয়েছে, তবুও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় প্রত্যেকের শরীর কুঁকড়ে আসছে।

প্রায় দশটার সময় মাঝোলে পৌঁছালেন সকলে।

বাসব গাড়ি থেকে নেমেই চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। রণদাকান্ত নাগচৌধুরী শুধু কীর্তিমানই নন, রুচিবানও বটে। মার্বেল মোড়া তাঁর বিরাট প্রাসাদ দেখলে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। প্রাসাদের সামনে সযত্নে লালিত সুন্দর ফুলবাগান। বাগান ও প্রাসাদকে ঘিরে রেখেছে গ্রানাইটের শ্ল্যাব দেওয়া সুদৃশ্য বাউণ্ডারি ওয়াল।

পার্লারেই অপেক্ষা করছিলেন রণদাকান্ত। অতিথিদের স্বাগত জানালেন। কুশল প্রশ্ন বিনিয়ম হল। দীর্ঘ ট্রেন ভ্রমণে সকলেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আলাপ আলোচনা খুব বেশি দূর অগ্রসর হল না। গৃহকর্তার অনুরোধে অতিথিরা তাড়াতাড়ি আহার সেরে নিয়ে নিজের নিজের নির্দিষ্ট ঘরে গেলেন বিশ্রাম করতে।

পরের দিন সারাটা দুপুর বাসব ও সৈকত একই সঙ্গে রইল। মাঝোলের যত্রতত্র ঘুরে বেড়াল দুজনে। খনি অঞ্চলেও গেল। কি পদ্ধতিতে কয়লা তোলা

হয় তার নিখুঁত বর্ণনা দিল ওকে সৈকত। বাসবের কাছে সমস্তই নতুন অভিজ্ঞতা।

অতিথিদের মধ্যে ডাঃ দিবাকর গুপ্ত সারাটা দুপুর সঙ্গে নিয়ে আসা মোটা একটা ডাক্তারী বই পড়ে কাটালেন। রজত ভৌমিক শিল্পী লোক। ওয়াটার কালারে নাগচৌধুরীদের মার্বেল প্রাসাদের ছবি আঁকলেন বসে বসে। তাঁর ইচ্ছে আছে যাবার সময় ছবিখানা প্রেজেণ্ট করে যাবেন রণদাকান্তকে। অরবিন্দ দত্ত ও প্রশান্ত রায় লাঞ্চ সেরেই বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়েছেন। বিগ গেমের সন্ধানে অবশ্য নয়। জঙ্গল হাজার গভীর হলেও এই দুপুরবেলা বিগ গেমের সন্ধান পাওয়া একরকম অসম্ভব। তাঁরা প্রাকৃতিক লেকের দিকেই গেলেন, যদি গোটা কয়েক সুরবাব বা নাক্টা মারতে পারেন।

বিছানায় কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করে সুচেতা মিসেস রায়ের ঘরে গেল। তিনি তখন জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আনমনে তাকিয়ে ছিলেন বাইরের দিকে। দুপুর কেটে গেল দুজনের গল্পের মধ্যে দিয়ে। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে যে সুচেতা আনমনা হয়ে পড়েনি তা নয়। এখনও পর্যন্ত সৈকতের সঙ্গে তার নিরিবিলিতে দেখা হয়নি। কোথায় যে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে। রত্নাদেবীও সারাটা দুপুর কাটালেন নিজের ঘরে। রাত্রে তাঁর ভাল ঘুম হয়নি। দুপুরে টানা ঘুম দিয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিলেন

বিকেলে চায়ের টেবিলে সকলে জড় হলেন।

চাপর্ব শেষ হবার পর আবার ছিটকে পড়লেন এদিকে ওদিকে। রণদাকান্ত অবশ্য চায়ের টেবিলে উপস্থিত ছিলেন না। বেলা দশটার সময় খনিতে গিয়েছিলেন, এখনও ফেরেননি।

বাড়ির পিছন দিকে, সুইটপিব ঝাড়ের পাশে গিয়ে বসল সুচেতা ও সৈকত।

আমার কথা বুঝি তোমার মোটেই মনে পড়ছিল না? সুচেতার গলায় অভিমানের আমেজ।

তোমার স্বভাব এই তিন বছরেও পাল্টাল না সু। অভিমান সবসময় নাকের ডগায়।

--মিছিমিছি অভিমানকে দোষ দিলে তো চলবে না মশাই। সারাটা দুপুর বাইরে ঘুরে না বেরিয়ে, আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাতে পারতে না বুঝি?

পারতাম বই কি। কিন্তু বাসবকে নিয়ে না বেরুলেও তো ভাল দেখাত না। হাজার হোক সে আমার পুরানো বন্ধু। ও সমস্ত কথা থাক এখন। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি নিজেই আসবে না।

সুচেতা সৈকতের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, অবস্থা প্রায় সেই রকমেই দাঁড়িয়েছিল। দাদা বললেন, সামনে পরীক্ষা, তোর গিয়ে কাজ নেই। শেষে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তবে এসেছি।

—অরবিন্দদার পরীক্ষা-পরীক্ষা বাতিক এখনও গেল না। কিন্তু তুমি কি এ বছর পরীক্ষা দিতে পারবে?

—কেন?

অল্প একটু হেসে সৈকত বলল, আমার কিন্তু মনে হয় পারবে না।

—কারণটা কি তাই বল না বাপু?

—বাবা এত ঘটা করে সকলকে এখানে কেন ডেকে এনেছেন জান? তোমার ও আমার বিয়ের কথাটা সকলের সামনে পাকাপাকি করে ফেলবেন বলে।

সুচেতা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না, বিশাল চেহারার এক ভদ্রলোককে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাছাকাছি এসে ওদের দুজনকে দেখে থতমত খেলেন ভদ্রলোক।

দ্রুত গলায় বললেন, দুঃখিত, আপনারা এখানে আছেন জানতাম না।

সৈকত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি কি মেথর আসার প্যাসেজ দিয়ে ভেতরে এলেন বটুকবাবু?

ঠিক ধরেছেন।

—সারা গায়ে চোর কাঁটা লাগিয়ে ওই ভাবে না এসে, মেন গেট দিয়ে ভেতরে এলেই তো পারেন।

চোর কাঁটা ছেয়ে যাওয়া নিজের কোটের দিকে তাকিয়ে, সলজ্জ হেসে বটুকবাবু বললেন, একটু সর্টকাট হয়, তাই ওপথ দিয়ে যাওয়া আসা করি। আপনারা কথাবার্তা বলুন, আমি চলি।

ভদ্রলোক দ্রুত প্রস্থান করলেন।

সুচেতা প্রশ্ন করল, কে উনি?

—বটুক চন্দ। এখানকার সানরাইজ হোটেলের মালিক। হোটেল খোলবার সময় বাবা ওঁকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন, তাই আমাদের প্রতি ওর সব সময় সবিনয় ভাব।

–চল, এবার এখান থেকে যাওয়া যাক। অন্ধকার হয়ে এল।

শীতকালে, এখানে সাড়ে পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে যায়।

ওরা মন্থর পায়ে বাড়িতে ফিরে এল। ড্রইং রুমে সকলে তখন সমবেত হয়েছেন। রণদাকান্তও ফিরে এসেছেন কাজকর্ম সেরে। মুখে চুরুট গুঁজে, কোচে গা এলিয়ে দিয়ে বারংবার দরজার দিকে তাকাচ্ছেন। বোধহয় সৈকতের অপেক্ষা করছেন।

উর্দীপরা বেয়ারা কফি পরিবেশন করে গেল অতিথিদের।

বিভিন্ন দরজা দিয়ে সৈকত আর সুচেতা ঘরে প্রবেশ করল। বসল দূরত্ব বজায় রেখে। অ্যাসট্রের উপর চুরুটের টুকরোটা রেখে, গলা ঝেড়ে নিয়ে রণদাকান্ত বললেন, তোমরা অনেকেই এর আগে কয়েকবার এখানে এসেছ। আমি শিকার পার্টির আয়োজন করেছি, কলকাতা থেকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছি কুড়ি পঁচিশ জনকে। এবার তোমরা সংখ্যায়ও কম, তাছাড়া আমার বন্ধুস্থানীয় কেউ নেই তোমাদের সঙ্গে। তোমরা সকলেই সৈকতের বন্ধু কিম্বা বিশিষ্ট পরিচিত। ওর ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার আনন্দে তোমাদের এখানে আহ্বান করেছি এটা ঠিক। তবে আরেকটা কারণ আছে। সে কারণটা কি তোমরা আন্দাজ করতে পারছ?

গৃহকর্তার এই ধরনের কথা শুনে সকলেই বিস্মিত হলেন। শুধু সুচেতা মুখ নিচু করে বসে রইল।

রণদাকান্ত আবার বললেন, আমিই কথাটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি। অরবিন্দ, বোনের বিয়ের কোন ব্যবস্থা করেছ নাকি?

সসঙ্কোচে অরবিন্দ দত্ত বললেন, ও বিষয় তো আমার কোন চিন্তা থাকার কথা নয়। আপনিই তো . ..

—আমি একটা ইশারা তোমাকে পূর্বেই দিয়ে রেখেছি সন্দেহ নেই। তবু তুমি হলে গিয়ে মেয়ের ভাই। তোমার তো উচিত কথাটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। থাক, তোমরা শুনলে খুশি হবে, অরবিন্দের বোন সুচেতাকে আমি পুত্রবধূ করব বলে স্থির করেছি।

এই সংবাদে সকলই আনন্দ প্রকাশ করলেন।

সুচেতা ও সৈকত বিব্রত হয়ে পড়ল।

এই প্রসঙ্গ নিয়ে মিনিট পনের আলোচনা চলবার পর রণদাকান্ত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন।

বললেন, সুবিখ্যাত রহস্যভেদী বাসবের সঙ্গে তোমাদের সকলেরই আলাপ হয়েছে। ও অল্পদিনের মধ্যে বহু দুরূহ কেসে সাফল্য অর্জন করে খ্যাতিমান হয়েছে। আমি অনুরোধ করব ও যদি নিজের অভিজ্ঞতার গল্প কিছু শোনায় তাহলে আমাদের এই সন্ধ্যা বেশ ভালই কাটে।

বটুক চন্দ্র ড্রইংরুমেই ছিলেন। তিনি বললেন, নাগচৌধুরী মশাই যথার্থই বলেছেন। গোয়েন্দা গল্প আমরা অনেক পড়েছি। কিন্তু সত্যিকারের গোয়েন্দা গল্প শোনার সুযোগ আমাদের কোথায়।

ঘরের অন্যান্যরাও এই প্রস্তাবে সমর্থন জানালেন। বাসব আপত্তি করল না। একটু চুপ করে থেকে, মনের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে ও আরম্ভ করল। সম্প্রতি যে কেস শেষ করেছে তারই গল্প বলে যেতে লাগল। সকলে একাগ্র মনে শুনছেন।

ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেল ক্রমে।

বাসবের গল্প বলার মাঝেই হঠাৎ প্রশান্ত রায় উঠে দাঁড়ালেন।

সকলেই অবাক হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে।

পরিষ্কার গলায় প্রশান্ত রায় বললেন, গল্পে এই ভাবে বাধার সৃষ্টি করায় আমি মর্মাহত। কাকাবাবু, আপনার একখানা গাড়ি কিছুক্ষণের জন্যে আমার প্রয়োজন হবে।

রণদাকান্ত দ্রুত গলায় বললেন. গাড়ি। এত রাত্রে কোথাও যাবে নাকি?

প্রশান্ত চশমাটা নিজের নাকের উপর ঠিক মত বসাতে বসাতে বললেন, এখুনি একবার পাটনা যেতে হবে।

– কাল সকালে যেও বরং। তাছাড়া ডিনার টাইম হয়ে এল।

আমার এখন না গেলেই নয়। বারটার মধ্যে ফিরতে পারব আশা করি।

মিসেস রায় এবার বলে উঠলেন, এখন তোমার যাওয়াটা কোন মতেই উচিত

হবে না। নতুন জায়গা, তাছাড়া

—না, না, তুমি বুঝছ না তন্দ্রা। এখন না গেলে আমায় বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে। পোর্টিকোতে যে গাড়িখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে—আমি নিতে পারি কাকাবাবু ?

—নিশ্চয় পার। তোমার এই সময় পাটনা যাওয়াটা অবশ্য আমি অনুমোদন করছি না। তবে তুমি বলছ জরুরী কাজ রয়েছে। ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে নাও ?

—আমি একাই যেতে পারব। পথ হারাবার ভয় নেই। পিচ ঢালা রাস্তাটাই তো সোজা পাটনা চলে গেছে।

কথাগুলি শেষ করেই প্রশান্ত রায় ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তন্দ্রাদেবীও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

ঠান্ডা যেন আজ বেশি পড়েছে মনে হচ্ছে।

দোতলায় নিজের ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাসব সিগারেট টানছিল। জানলায় অবশ্য কাচের শার্সি আঁটা রয়েছে। খাওয়া দাওয়া সমাধা হয়েছে ঘণ্টা দেড়েক আগেই।

এতক্ষণ সৈকতের সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলছিল বাসব। চমৎকার বিলিয়ার্ড টেবিলটা এদের। সৈকতের হাতও চমৎকার। অনেকক্ষণ ধরে দুজনে খেলেছে। তারপর বাসব ফিরে এসেছে নিজের ঘরে।

কোথায় সশব্দে এগারটা বাজল।

কোন ফিল্ডের কাছে যে টাওয়ার আছে, তার চারপাশে চারটে ঘড়ি। শব্দ বোধহয় সেখান থেকেই এল। সিগারেটের টুকরোটা শেষবার টান দিয়ে ফেলে দিল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বাসবের মনে পড়ল, মিঃ রায় এখনও পাটনা থেকে ফিরে আসেননি।

তাঁর কি এখন পাটনা না গেলে সত্যিই চলত না। জানলার কাছ থেকে সরে আসবার আগে আরেকবার বাগানের দিকে তাকাল বাসব। নিটোল কালো অন্ধকারের মধ্যেও আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে গাছ-পালাগুলো। ঠিক এই সময় বাগানের গেটের কাছটা তীব্র আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল।

বাসব কাচের শার্সির উপর ঝুঁকে পড়ল, ধীরে ধীরে একটা মোটরকার গেট পেরিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকেছে। মিঃ রায় পাটনা থেকে ফিরলেন। মোটর পোর্টিকোয় এসে থামল।

• এবার শুয়ে পড়লেই হয়। অনেক রাত হয়ে গেছে। বাসব বিছানার দিকে কয়েক পা এগিয়েছে মাত্র—রাতের নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে কোথায় যেন বন্দুক গর্জে উঠল। পরমুহূর্তে একটা কাতর চিৎকার।

সচকিত হয়ে উঠল বাসব।

বাগানের দিক থেকেই শব্দটা এল !

আলনার উপর থেকে গ্রেটকোটটা তুলে নিয়ে, গায়ে গলিয়ে নিতে নিতে বাসব

দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কয়েক পা গিয়েই সিঁড়ি। কয়েকটা করে সিঁড়ি একসঙ্গে অতিক্রম করে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পোর্টিকোয় এসে উপস্থিত হল।

ক্রাইসলারখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে নির্দিষ্ট জায়গায়। এই গাড়িতেই মিঃ রায় পাটনায় গিয়েছিলেন। বাসব সবিস্ময়ে দেখল, কে একজন গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে পড়ে কি যেন করছে।

ঠেলা দিতেই চমকে মুখ ফেরালেন ভদ্রলোক—ডাঃ দিবাকর গুপ্ত। তাঁর মুখের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তিনি অসংলগ্ন গলায় বললেন, দেখুন কি কাণ্ড—

বাসব ঝুঁকে গাড়ির মধ্যে তাকাতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। ড্যাস বোর্ডের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল, স্টিয়ারিং-এর উপর মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছেন প্রশান্ত রায়। কপালের একপাশ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। রক্তে তাঁর সাদা ট্রাউজারের খানিকটা লাল হয়ে উঠেছে। কি মর্মান্তিক দৃশ্য।

গুলির আওয়াজে বাড়ির সকলের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। সকলেই ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখবার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। বিপদের গুরুত্বে প্রত্যেকে নির্বাক, শুধু তন্দ্রাদেবী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন। বাসব প্রথমে কথা বলল, কাকাবাবু, পুলিসে খবর দেবার ব্যবস্থা করুন।

বাসবের কথায় রণদাকান্ত সম্বিত ফিরে পেলেন।

ভাঙ্গা গলায় তিনি বললেন, একি হল বাসব। আমি যে ভাবতেও পারছি না। আমারই বাড়িতে শেষ পর্যন্ত····

- আপনি এত উতলা হবেন না। সরোজবাবু, আপনি এখুনি রিং করুন একবার পুলিসকে।

রণদাকান্তের একান্ত সচিব সরোজ রুদ্র কাছেই দাঁড়িয়েছিল, বাসবের কথা শুনে টেলিফোন করার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। স্তম্ভিতবৎ দাঁড়িয়ে থাকা সকলের উপর বাসব দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। সকলেই উপস্থিত রয়েছেন, শুধু একজন—হ্যাঁ, অরবিন্দ দত্ত অনুপস্থিত।

কোথায় গেলেন তিনি? এতবড় ঘটনার পর তার ঘটনাস্থলে অনুপস্থিতি সত্যি বিস্ময়কর। এদিক ওদিক তাকাতেই বাসবের দৃষ্টি পড়ল বাগানের দিকে। দেখা গেল গেটের দিক থেকে এগিয়ে আসছেন অরবিন্দ দত্ত। তাঁর কেমন যেন ত্রস্ত ভাব।

সুচেতা দৌড়ে ভেতরে গিয়েছিল। এক জগ জল নিয়ে ফিরে এল। তন্দ্রাদেবীর মুখের উপর জলের ছিটে দিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তুলল। হাত ধরে তাঁকে তুলে নিয়ে গেল তাঁর ঘরে।

রত্নাদেবী আগেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন। এই রক্তাক্ত ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর মন বোধহয় চায়নি। অন্যান্যরাও একে একে স্থান ত্যাগ করলেন। ঘটনাস্থলে রইল শুধু বাসব ও সৈকত। পুলিসের অপেক্ষায় ওরা ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই থানা ইনচার্জ রাজেন শুক্লা দেখা দিলেন।

এই তরুণ পুলিস কর্মচারীটি কর্তব্যপরায়ণ হিসেবে এ অঞ্চলে সুখ্যাত।

সৈকতের মুখ থেকে ঘটনাটা তিনি শুনলেন।

– ভদ্রলোক তাহলে বেশ কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছেন। ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন।

—আমরা ওঁর দেহ পরীক্ষা করিনি। সৈকত বলল, গুলি খেয়ে উনি মারা গেছেন কি, আহত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় এখনও বেঁচে আছেন বলতে পারব না।

একজন কনেস্টবলকে পাঠিয়ে অবিলম্বে ডাঃ তারানাথকে ডেকে পাঠালেন শুক্লা। তারানাথ মাঝোলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। হন্তদন্ত হয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন তারানাথ। সতর্কতার সঙ্গে প্রশান্ত রায়ের দেহ পরীক্ষা করে বললেন, স্কাল একেবারে ভেঙ্গে গেছে। একটু তেরছা ভাবে কপালের ডান পাশে গুলি লাগে। খুলি ভেদ করে গুলি বেরিয়ে গেছে, বোধহয় আটকে আছে মোটরের শক্ত হুডে।

ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন, গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি বোধহয় মারা গেছেন।

—নিশ্চয়ই। খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছিল। কপাল ও রগের উপরকার গভীর পোড়া দাগটা লক্ষ্য করুন।

আরো দুচার কথা বলে ডাক্তার বিদায় নিলেন।

সৈকত এই সময় ইন্সপেক্টরের সঙ্গে বাসবের আলাপ করিয়ে দিলেন।

শুক্লা আনন্দিত হলেন। খবরের কাগজের দৌলতে বাসবের কীর্তিকলাপের কথা অজানা ছিল না তাঁর।

তিনি সাগ্রহে বললেন, আপনি উপস্থিত রয়েছেন, ভালই হল।

এই খুনের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করলে খুশি হব।

সহাস্যে বাসব বলল, আপত্তি নেই। আমার সাধ্যমত সাহায্য আপনাকে নিশ্চয়ই করব।

—এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?

—তলিয়ে কিছু ভাবিনি। তবে এখন এইটুকু বলতে পারি, মৃতদেহের পজিশন দেখেই অবশ্য বলা সম্ভব হচ্ছে, হত্যাকারী পোর্টিকোতেই দাঁড়িয়েছিল। মিঃ রায় গাড়ি নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুলি করে।

—হত্যাকারী যে দাঁড়িয়েছিল একথা আপনি জোর দিয়ে বলছেন কি ভাবে। এমনও তো হতে পারে, পোর্টিকোতে গাড়ি থামার পর হত্যাকারী কোথাও থেকে ছুটে এসে গুলি করেছিল ?

—আপনি যা বলছেন, প্রথমে এই সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু তা ঘটেনি। আমি বুঝিয়ে বলছি আপনাকে। হত্যাকারী যদি প্রশান্তবাবুর জন্যে এখানে অপেক্ষা না করত তাহলে তিনি গাড়ির মধ্যে বসেই মৃত্যু বরণ করতেন না। অন্ততঃ এক মিনিটও সময় পেতেন অর্থাৎ হত্যাকারী ছুটে আসতে আসতে তিনি গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন নিশ্চয়ই। তা তিনি পারেন নি, এর অর্থ এই নয়কি, হত্যাকারী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল এবং পোর্টিকোতে ঢোকবার সময় তিনি তাঁকে দেখতেও পেয়েছিলেন।

সৈকত বলল, দেখতে যদি পেয়ে থাকেন তবে প্রশান্তবাবু সতর্ক হলেন না কেন ?

—দুটো কারণে তাঁর পক্ষে সতর্ক হওয়া সম্ভব হয়নি। প্রথম, হত্যাকারী নিশ্চয়ই রিভলবার বাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল না। দ্বিতীয়, সে তাঁর এত পরিচিত ব্যক্তি ছিল যে তাকে কোন রকম সন্দেহ করার কারণ তিনি খুঁজে পাননি। আমার মতে, তাঁর অতি পরিচিত হত্যাকারীকে গভীর রাত্রে প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রশান্তবাবু বেশ অবাক হয়েছিলেন। গাড়ি থামিয়েই বিস্মিত ভাবে তার দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন, হয়তো প্রশ্নও করেছিলেন একটা। হত্যাকারী সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালায়। তিনি যে মুখ ফিরিয়েছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, গুলি কানের উপর বা রগে না লেগে কপালের একপাশে লেগেছে।

প্রশংসার দৃষ্টিতে বাসবের দিকে তাকিয়ে শুক্লা বললেন, আপনার বিশ্লেষণ ক্ষমতা অদ্ভুত। আমার সৌভাগ্য যে এই কেসে আপনাকে আমি কাছে পেয়েছি। খুন করার পর হত্যাকারী কোথায় গিয়ে আত্মগোপন করেছে বলে আপনার ধারণা ?

—যদি ডাঃ গুপ্ত প্রশান্তবাবুকে খুন না করে থাকেন তবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বর্তমানে একটু শক্ত।

—ডাঃ গুপ্ত! কি রকম ?

বাসব ইন্সপেক্টরকে বলল, ঘটনাস্থলে ছুটে আসার পর ডাঃ গুপ্তকে ও কি ভাবে দেখেছিল।

ইন্সপেক্টর বললেন, ওই সময় ডাঃ গুপ্তর উপস্থিতি আমি অত্যন্ত সন্দেহজনক বলে মনে করছি।

—সন্দেহজনক বইকি। এ সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

বাসব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে মৃতদেহ পরীক্ষা করল। ইন্সপেক্টর শুক্লা প্রশান্ত রায়ের পকেটগুলো তল্লাস করলেন। পকেটের মধ্যে থেকে পাওয়া গেল, পেন্সিল কাটা ছুরি, পার্স রুমাল ও কোয়ার্টার সাইজের ফটোগ্রাফ একখানা।

প্রশান্ত রায়ের পার্সটা পরীক্ষা করে দেখলেন ইন্সপেক্টর। দশটাকা, পাঁচটাকা ও একটাকার নোট মিলিয়ে টাকা সাতচল্লিশ রয়েছে তাতে।

বাসব তখন ইন্সপেক্টরের কাছে ছিল না। গাড়ির পিছন দকে গিয়ে পেট্রোল ট্যাঙ্কের মুখ খুলে, একটা কাঠি ডুবিয়ে পরীক্ষা করছিল কতখানি তেল আছে ট্যাঙ্কে। কাঠির ভেজা অংশ দেখে মনে হল আধ গ্যালনের বেশি তেল নেই।

হঠাৎ বাসবের দৃষ্টি পড়ল কেরিয়ারের তলাকার খাস জমিটার উপর। রিভলবার পড়ে রয়েছে একটা। রুমালে মুড়ে সন্তর্পণে অস্ত্রটা তুলে নিল। হাতের ছাপ থাকলে নষ্ট যাতে না হয়ে যায় তাই এই সতর্কতা। ইন্সপেক্টর বাসবে। হাত থেকে রুমালে মোড়া রিভলবারটা নিয়ে পকেটস্থ করলেন।

—এখানকার কাজ মোটামুটি এখন শেষ হয়েছে বলা চলে। এবার সকলকার এজাহার নেওয়া চলতে পারে। তবে তার আগে ডেডবডি পোস্টমর্টমে পাঠান

দরকার।

গৃহকর্তাকে জানিয়ে মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে পাঠালেন ইন্সপেক্টর। তারপর সকলের এজাহার নেবার জন্যে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

নাগচৌধুরীদের বিরাট বাড়িতে মৃত্যুর মতই স্তব্ধতা বিরাজ করছে। আচম্বিতে এই অঘটন ঘটে যাওয়ায় সমস্ত হাসি আনন্দের উপর কে যেন যবনিকা টেনে দিয়েছে। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছে না। নিজের নিজের ঘরে আশ্রয় নিয়ে চিন্তার অতল সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

পুলিসের পক্ষ থেকে সকলকে জেরা করা হয়েছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন সূত্রই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। খুন করে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হত্যাকারী হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন। জেরার উত্তরে ডাঃ গুপ্ত বলেছেন, পোর্টিকোর কাছেই তাঁর ঘর, শব্দ শুনে তিনি ওখানে গিয়ে পড়েছিলেন।

তবে একটা উল্লেখযোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ঘটনাস্থলে কুড়িয়ে পাওয়া রিভলবারটা প্রশান্ত রায়ের নিজেরই। তন্দ্রাদেবী একথা জানিয়েছেন পুলিসকে। নাগচৌধুরী হাউস থেকে বিদায় নেবার সময় ইন্সপেক্টর শুক্লা সকলকে জানিয়ে গেছেন, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন মাঝোল ত্যাগ না করেন।

বাসব নিজের ঘরের ডেকচেয়ারে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। সত্যি, তন্দ্রাদেবীর কথা ভাবলে দুঃখ হয়। পতিপ্রাণা শান্ত মহিলা—বিদেশে এসে কি শোচনীয় দুর্বিপাক। তাঁকে সান্ত্বনা জানাবার কোন ভাষা নেই। কলকাতায় তাঁর ভাই-এর কাছে খবর পাঠানো হয়েছে।

ডেকচেয়ারের পাশেই টিপয়। তার উপর পেন্সিল কাটা ছুরি, রুমাল, ফটোগ্রাফ ও পার্স রাখা রয়েছে প্রশান্ত রায়ের পকেট থেকে পাওয়া এই জিনিস-গুলো ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে চেয়ে নিয়ে এসেছে বাসব।

পরীক্ষা করে রিভলবারের উপর থেকে কোন হাতের ছাপ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বাসব অবশ্য এ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। হত্যাকারী ইচ্ছে করেই রিভলবারটা ওখানে ফেলে গেছে। হয়তো পুলিসকে বিপথগামী করাই তার উদ্দেশ্য। চেম্বারে পাঁচটা গুলি রয়েছে। ছ' নম্বর গুলি দিয়ে প্রশান্ত রায়কে খুন করা হয়েছে কি অন্য কোন রিভলবারের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।

সৈকত ঘরে এল। তাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, বাবা অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আমাদের বাড়িতে শেষ পর্যন্ত এই রকম ঘটনা ঘটবে কে জানত!

বাসব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, মিঃ রায়ের এই ভাবে খুন হওয়া সত্যি আশ্চর্যের বিষয়।

—পুলিস যা করছে করুক। তুমি ভাই একটু ইন্টারেস্ট নাও। যা হবার তা অবশ্য হয়ে গেছে, এখন এই হত্যাকাণ্ডের নিষ্পত্তি না হলে আমাদের সুনাম

নষ্ট হয়ে যাবে।

—আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না সৈকত। তুমি সকলকে জানিয়ে রাখবে তাঁরা যেন আমার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

—বেশ।

বাসব টিপয়ের উপর থেকে ছবিখানা তুলে নিয়ে বলল, এই ছবিটা কার বলতে পার?

সাত আট বছরের ছেলের ছবি। সেলার সুট পরা, মিষ্টি মুখের অধিকারী সে। ছবিটা এক নজর দেখে নিয়ে সৈকত বলল, না। কোথায় পেলে এই ছবি?

—প্রশান্তবাবুর পকেটে ছিল। আজ সন্ধ্যায় আমি সকলকে কিছু কিছু প্রশ্ন করব। এখন তোমাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করতে চাই।

—স্বচ্ছন্দে করতে পার।

সিগারেটে ঘন ঘন বার কয়েক টান দিয়ে বাসব বলল, প্রশান্তবাবুর সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ?

—বছর ছয়েকের। ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়।

—ভদ্রলোক কি কাজকর্ম করতেন?

—মাইকার ব্যবসা করতেন।

—প্রশান্তবাবু তাহলে ধনীলোক ছিলেন।

—বিয়ের পর তাঁর অবস্থা ফিরে যায়। আগের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। শ্বশুরের সহযোগিতায় ব্যবসায় নেমে টাকা করেন।

– কতদিন আগে বিয়ে করেছিলেন তিনি?

—আমার ইংল্যান্ড যাবার বছর দুয়েক আগে। তা ধর গিয়ে বছর পাঁচেক হল।

সুচেতাদেবীর সঙ্গে তোমার আলাপ হয় কোথায়?

—ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবেই। অরবিন্দদা ওখানকার সেক্রেটারি ছিলেন। সেই সূত্রে ও ওখানে যাওয়া আসা করত হঠাৎ একদিন আলাপ হয়ে গেল। তারপর....

বাসব মৃদু হেসে বলল, বুঝেছি। আপাততঃ তোমাকে আর কোন প্রশ্ন করব না।

বিকেলে বাসব একাই বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অজস্র চিন্তা ওকে বিমনা করে তুলছে। হঠাৎ বাসবের দৃষ্টি পড়ল, তারের বেড়ার উপরকার সুন্দর আইভি লতার ঝোপের উপর। ওখানে কি একটা আটকে রয়েছে। তাই তো, এগিয়ে গিয়ে দেখল বেড়ার একধারে লাল রংয়ের কাপড়ের একটা টুকরো আটকে রয়েছে। টুকরোটা হাত তিনেক হবে।

বেড়ার উপর থেকে কাপড়ের টুকরোটা তুলে নিয়ে নিজের পকেটে রাখল বাসব।

আরো কিছুক্ষণ বাগানে ঘুরে বেড়িয়ে বাড়িতে ফিরে এল ও। ড্রইংরুমে দেখা হল সৈকতের সঙ্গে। সৈকত চুপচাপ বসেছিল।

বাসব বলল, এবার আমি নিজের কাজ আরম্ভ করতে চাই। তুমি ডাঃ গুপ্তকে প্রথমে ডেকে দাও।

সৈকত ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দিবাকর গুপ্ত এলেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা তাঁর। মাথায় সুচিক্কণ টাক। মুখ অসম্ভব গম্ভীর।

—আপনাকে একটু বিরক্ত করব ডাঃ গুপ্ত।

—বিলক্ষণ। বলুন?

—আমার ধারণা আপনিই বোধহয় প্রথম প্রশান্তবাবুকে মৃত অবস্থায় দেখেন। এত দ্রুত আপনি কি ভাবে ওখানে পোঁছালেন?

—এ প্রশ্নের উত্তর পুলিসকে আমি আগেই দিয়েছি। শব্দ শুনে গিয়েছিলাম ওখানে।

—পুলিসকে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তা আমি পড়েছি, কিন্তু ওই উত্তরে আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না। আমার এই একটা প্রশ্নের মধ্যেই অনেকগুলো প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। যেমন ধরুন, কেন আপনি জেগেছিলেন, কি ধরনের শব্দ আপনি শুনতে পেয়েছিলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে আর কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন কিনা, ইত্যাদি।

দিবাকর গুপ্ত চুপ করে রইলেন।

বাসব আবার বলল, আপনাদের পূর্ণ সাহায্য না পেলে এই জটিল কেসের সমাধান কোন মতেই হবে না ডাঃ গুপ্ত।

ডাঃ গুপ্ত বললেন, এবার আমি আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সব সময় প্রস্তুত বাসববাবু। আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি যথাযথই দিচ্ছি। খাওয়া দাওয়ার পর নিজের ঘরে বসে রেডিওতে বি.বি সি. শুনছিলাম। হঠাৎ মনে হল, করিডরে কি যেন একটা পড়ল। উঠে গেলাম দেখবার জন্য, ঘর থেকে বাইরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ কানে এল। ছুটে বাইরের বারান্দায় আসতেই ওই দৃশ্য চোখে পড়ল। তখন কাউকে সেখানে দেখিনি।

—করিডরে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দটা কি ধরনের?

—শব্দটা .. হাল্কা লোহা জাতীয় কোন জিনিস পড়ে গেলে যে ধরনের শব্দ হয়, ঠিক সেই ধরনের।

প্রায় এক মিনিট জানলার দিকে তাকিয়ে কি ভাবল বাসব, তারপর প্রশ্ন করল, আপনি কোথায় প্র্যাকটিশ করেন?

—আমি রিসার্চ করি। মেনেনজাইটিসের একটা অব্যর্থ সিরাম বার করবার চেষ্টা করছি।

—ও। ইয়ে…মানে ..আপনার ·

ডাঃ গুপ্ত হাসলেন—কি ভাবে আমার সংসার চলে বলছেন?

—হ্যাঁ।

—বাবা মারা যাওয়ার সময় বেশ কিছু রেস্ত রেখে গেছেন, তাই দিয়েই চলে যায় হেসে খেলে।

বাসব প্রশ্নের মোড় ঘোরাল, প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?

—প্রশান্ত আমার ছোটবেলাকার বন্ধু। আমার সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল তার।

—আপনার বন্ধুকে কে এই ভাবে খুন করতে পারে, এ সম্বন্ধে কোন ধারণা আপনার আছে?

—না। আমি অনেক ভেবেও এ সম্বন্ধে কোন ধারণা খাড়া করতে পারিনি। বাসব পকেট থেকে সেই ফটোগ্রাফখানা বার করে বলল, এটা কার ছবি বলুন তো?

চিনতে পারছি না।

আপনাকে আর আটকে রাখব না। দয়া করে রত্নাদেবীকে গিয়ে পাঠিয়ে দিন।

দিবাকর গুপ্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রায় দশমিনিট পরে রত্নাদেবী এলেন। দীর্ঘাঙ্গী সুরূপা মহিলা। সুগায়িকা তিনি। বেতারে ও জলসায় গান গেয়ে থাকেন। এই অঘটনে কেমন মন মরা হয়ে পড়েছেন। দুচোখ লাল হয়ে রয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় প্রচুর কেঁদেছেন বোধহয়।

বাসব তাঁকে বসতে অনুরোধ করল। একটা কোচে বসতে বসতে রত্নাদেবী বললেন, আমায় ডেকেছেন?

—হ্যাঁ। শুনেছেন বোধহয় হত্যা তদন্তের ভার আমার উপর এসে পড়েছে। গোটা কয়েক প্রশ্ন আপনাকে করব।

—বেশ তো, করুন।

—দুর্ঘটনার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

—রজতবাবুর ঘরে। তাঁর আঁকা ছবি দেখছিলাম।

—গুলির শব্দ শুনে আপনারা দুজনেই বোধহয় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন?

—আমি একলাই বেরিয়ে এসেছিলাম।

—কেন?

—রজতবাবু সে সময় ঘরে ছিলেন না।

—রজতবাবুর অনুপস্থিতিতেই আপনি তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন ছবি দেখতে?

—হ্যাঁ।

—সেদিন রাত্রে খাওয়ার টেবিলে আপনাকে দেখতে পাইনি কেন বলুন তো?

—গা গুলোচ্ছিল বলে খেতে যাইনি।

—নাগচৌধুরীদের সঙ্গে আপনার আলাপ কি সূত্রে বলবেন কি?

রত্নাদেবী শান্ত গলায় বললেন, সুচেতা কিছুদিন আমার কাছে গান শিখেছিল, তখনই আলাপ হয়ে যায় সৈকতবাবুর সঙ্গে।

বাসব ফটোগ্রাফখানা এগিয়ে ধরল, বলল, কার ছবি এখানা বলতে পারেন?

—না।

—প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল?

—না।

—কিছু মনে করবেন না। আপনি কি বিবাহিতা—

—আপনার প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য না হয়ে পারছি না। আমার সিঁথিতে সিঁদুর না দেখেও কি বুঝতে পারছেন না।

-মেয়েরা অনেক সময় আজকাল সিঁথিতে সিঁদুর দেয় না। তাই ....

হাসলেন রত্নাদেবী। হাসিটা করুণ দেখাল।

—আমি কুমারী বাসববাবু। গান-বাজনা নিয়ে থাকি, বিয়ে করার অবকাশ আর পেলাম কোথায়।

বাসব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আর বিরক্ত করব না চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

পাশাপাশি দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে রত্নাদেবীর ঘর। ঘরে ঢুকে যাবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি বললেন, কবে নাগাদ ছাড়া পাব বলতে পারেন।

— সঠিক বলা দুষ্কর।

রত্নাদেবী ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলে, বাসব কয়েক পা পেছিয়ে এসে একটা দরজায় টোকা দিল।

—আসুন।

আহ্বান পেয়ে দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে গেল বাসব। মাঝারি সাইজের ছিমছাম ভাবে সাজানো ঘরখানা। বিরাট একটা ফ্লাওয়ার-ভাস রাখা টেবিলের সামনে, কার্পেট পাতা মেঝের উপর মুহ্যমানের মত বসে রয়েছে তন্দ্রা রায়। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। মিসেস রায় মুখ তুললেন। মনের সমস্ত বেদনা যেন চোখের কোলেই জমাট বেঁধে রয়েছে।

বাসব কার্পেটের উপর বসে পড়ে মৃদু স্বরে বলল, আপনাকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমার নেই মিসেস রায়। তবে আপনার স্বামীর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবার দায়িত্ব আমি নিয়েছি।

তন্দ্রাদেবী নীরব রইলেন।

—সেই দায়িত্বের খাতিরে আপনাকে একটু বিরক্ত করব। তন্দ্রাদেবীর চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি ফুটে উঠল।

—আপনি বলতে পারেন, সেদিন মিঃ রায় পাটনা গিয়েছিলেন কেন?

—না। তিনি আমায় কিছু বলেননি।

—আচ্ছা, আপনার স্বামী কি সব সময় নিজের কাছে রিভলবার রাখতেন?

—না। কালে-ভদ্রে সঙ্গে নিয়ে বেরুতেন।

—কোথায় ছিল অস্ত্রটা?

আঙুল নির্দেশ করে তন্দ্রাদেবী বললেন, ওই ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে। এখানে এসে উনি ওটা ওর মধ্যেই রেখেছিলেন।

—ও। আচ্ছা একটা কথা ভেবে বলুন তো। দুর্ঘটনার দিন কোন সময় কেউ আপনার ঘরে ঢুকেছিল কিনা জানেন?

একটু ভেবে নিয়ে তন্দ্রাদেবী বললেন, ডাঃ গুপ্ত বোধহয় একবার আমার

ঘরে ঢুকেছিলেন।

—কি রকম?

—আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। ফিরে আসবার সময় দেখলাম তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অবশ্য তাঁর মুখ আমি দেখতে পাইনি।

—তখন কটা?

—রাত সাড়ে নটা হবে বোধহয়।

—হুঁ। আচ্ছা মিসেস রায়, আপনার স্বামী খুব ল্যাভেন্ডার পছন্দ করতেন, তাই না?

—কই, না তো?

একটা রুমাল বার করে বাসব বলল, এটা মিঃ রায়ের পকেটে পাওয়া গেছে। এতে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ রয়েছে।

মিসেস রায় রুমালখানা ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, এটা তাঁর নয়। তিনি রঙ্গিন রুমাল ব্যবহার করতেন না।

রুমালের সঙ্গে পকেট থেকে সেই ছেলেটির ফটোগ্রাফখানাও বার করেছিল বাসব। —দেখুন তো একে চেনেন কিনা?

এক নজর দেখে নিয়ে তন্দ্রা রায় বললেন, চিনতে পারলাম না।

—ছবিখানা কিন্তু আপনার স্বামীর পকেটেই পাওয়া গেছে। ভাল করে দেখুন চিনতে পারেন কিনা।

—আমি ঠিকই বলছি। ছেলেটিকে চিনি না। আর কোন প্রশ্ন করল না বাসব। বিদায় নিল মিসেস রায়ের কাছ থেকে।

পরের দিন দুপুরে থানায় গেল বাসব। সৌভাগ্যক্রমে শুক্লা থানাতেই ছিলেন। সাদরে বসালেন ওকে। চা আনতে আদেশ দিলেন। সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, কতদূর এগুলো?

বাসব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, এগুচ্ছি গুটি গুটি পা পা করে।

—এদিকে আমি সদরে আপনার কথা বলে পাঠিয়েছিলাম কর্তাদের কাছে। তাঁরা এই তদন্তে আপনার সাহায্য নিতে প্রস্তুত আছেন।

—ধন্যবাদ। আপনি কতদূর?

—বেশি এগুতে পারিনি? তবে আজ নতুন একটা সংবাদ পেয়েছি।

—কি সংবাদ?

—একজন পাহারাদারের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, দুর্ঘটনার দিন রাত পৌনে এগারটার সময় সে একজনকে নাগচৌধুরী হাউসের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখেছে। সেই লোকটির মুখ পাহারাদার দেখতে পায়নি। তার গায়ে ওভার-কোট ছিল, মাথায় হ্যাট ছিল এইটুকুই শুধু বলতে পেরেছে।

—হুঁ। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে।

—ছবিটা সম্বন্ধে কিছু করতে পারলেন?

—কিছুই না। ছবিখানা কার জানা গেলে রহস্য কিছুটা পরিষ্কার হত

বোধহয়। কেউই নাকি চেনেনা ছেলেটাকে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওঁদের মধ্যে একজনও ওর পরিচয় জানেন অথচ অস্বীকার করে যাচ্ছেন! আরেকটা কথা, ল্যাভেণ্ডার মাখানো রুমাল মিঃ রায় ব্যবহার করতেন না, তবু তাঁর পকেটে ওই রুমালখানা গেল কিভাবে?

শুক্লা মাথা নেড়ে বললেন, এই দুটো প্রশ্নের সমাধান আগে দরকার। খুনী খুন করবার পর কিভাবে গা ঢাকা দিয়েছিল, সে বিষয় কিছু ভেবেছেন?

—হত্যাকারীকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই কাজ করতে হয়েছিল। যতদূর আন্দাজ করছি, গুলি করবার পর সে পালায়নি। বারান্দায় যে বড় বড় থাম আছে তারই কোন একটার পিছনে লুকিয়ে পড়েছিল। তারপর সকলে জড় হলে, ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে নেওয়ায় আমরা কিছু ধরতে পারিনি।

—একথা স্বীকার করতেই হবে হত্যাকারী অত্যন্ত রিস্ক নিয়েছিল। যাইহোক পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট এসেছে। রিপোর্ট দেখলে আপনি অবাক হবেন।

শুক্লা রিপোর্টখানা এগিয়ে দিলেন। বাসব তাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিস্মিত ভাবে মুখ তুলল। শুক্লা ঘাড় নাড়লেন।

থানা থেকে বেরিয়ে বাসব ঘুরতে ঘুরতে নাগচৌধুরী প্যালেসের পিছন দিকে এসে উপস্থিত হল। জায়গাটা খুব পরিচ্ছন্ন নয়। গরুর গাড়ি যাতায়াত করায় কোন রকমে একটা রাস্তার সৃষ্টি হয়েছে।

বাসব লক্ষ্য করল, নাগচৌধুরী প্যালেসের বাউণ্ডারি ওয়ালে ছোট দরজা রয়েছে একটা। ওই পথ দিয়ে মেথর যাওয়া আসা করে বোধহয়।

বাসব দরজার দিকে এগিয়ে যাবার সময় মাটি থেকে কুড়িয়ে পেল একটা মিজরাব। সেতার বাজাতে গেলে এই জিনিসটার বিশেষ প্রয়োজন হয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে মিজরাবটা পিছন থেকে কে বলে উঠল, এখানে কি করছেন মশাই?

চমকে মুখ ফিরিয়ে বাসব দেখল 'সানরাইজ' হোটেলের মালিক বটুকবাবু। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বাসবের। মৃদু হেসে ও বলল, ঘুরে ফিরে দেখছি এধারটা।

—দেখুন, দেখুন, যদি কোন সূত্র-টুত্র পেয়ে যান।

—সূত্রের সন্ধানে আমি এখানে এসেছি আপনাকে কে বলল?

নির্বিকার গলায় বটুকবাবু বললেন, কে আবার বলবে। এ সমস্ত তো আন্দাজে বুঝে নিতে হয় মশাই।

—আপনি এখনে কি মনে করে বটুকবাবু?

—রণদাবাবুর বাড়িতে যাবার এই তো আমার পথ। হোটেল থেকে শর্টকাট হয় আর কি? কোন সূত্র পেলেন নাকি?

—না। তেমন কিছু···

—আপনাকে বোধহয় আমি কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারব। ওই দেখুন, কি দেখছেন ওখানে?

বটুকবাবুর আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করা জায়গাটা দেখল বাসব মোটরের টায়ারের ছাপ রয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারল না কি বোঝাতে চাইছেন তিনি। মোটরের টায়ারের ছাপে অস্বাভাবিকত্ব কোথায়!

--আপনি স্থানীয় লোক নন তাই জানেন না– বটুকবাবু বললেন. এটা পথই নয়। জোর করে গরুর গাড়ি চালান হয় এখান দিয়ে। মোটর যাওয়া-আসা করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া দেখছেন, গাড়িটা খুব বেশি দূর এগোয়নি।

বাসব দেখল টায়ারের দাগ বাইণ্ডারি ওয়ালের পিছনে এসেই থেমে গেছে।

বটুকবাবু, মনে হচ্ছে আপনি যেন কিছু ইঙ্গিত করছেন?

ঠিকই ধরেছেন। আরেকটা কথা বললে আমার ইঙ্গিত আরেকটু পরিষ্কার হবে বোধহয়। সেদিন মিঃ রায় পাটনা যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরুলেও তখুনি পাটনা যাননি। এক ঘণ্টার উপর আমার হোটেলের একটা কেবিনে গিয়ে বসে-ছিলেন।

বাসবের মনের মধ্যে চিন্তা দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল।

-কিন্তু আপনি একথা জানলেন কিভাবে? মিঃ রায় যখন বেরিয়ে যান তখন তো আপনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

—তাতো ছিলামই। আমি যখন হোটেলে ফিরি তখন দেখি মিঃ রায় হোটেলে থেকে বেরিয়ে আসছেন। তিনি আমাকে দেখতে পাননি। আমি অবাক হয়ে ম্যানেজারের কাছে খোঁজ খবর নিতেই, ম্যানেজার বলল, ওই ভদ্রলোক ঘণ্টাখানেকের উপর এখানে ছিলেন।

—আর কিছু জানেন বটুকবাবু?

—না মশাই। আপনি বুদ্ধিমান লোক, এর মধ্যে থেকেই অনেক সূত্র পাবেন আশা করি। আসুন ভেতরে যাই। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। এই শীতে বৃষ্টিতে ভিজলে নিউমোনিয়া নির্ঘাৎ।

বাসব আকাশের দিকে তাকালো। কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। বৃষ্টি নামল বলে। বটুকবাবু মেথরের প্যাসেজের দিকে এগিয়ে গেলেন বাসব তাঁকে অনুসরণ করল।

বেলা দেড়টা হবে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আগে। বাসব চিন্তিত মুখে নিজের ঘরে পায়চারি করছে। বহুদিন পরে বেশ জটিল রহস্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে ওকে। দুটো জিনিসই ওর কাছে এখন সম্পূর্ণ অন্ধকারে। এক খুনের মোটিভ কি? দুই, খুনী কে?

খুনের মোটিভ সম্বন্ধে যদি কোন আঁচ পাওয়া যেত, তাহলে অবশ্য রহস্য অনেক সরল হয়ে যেত। মোটিভ সম্বন্ধে প্রচুর চিন্তা করে দেখেছে বাসব। প্রশান্ত রায়ের পূর্বের অবস্থা হীন হলেও বর্তমানে মোটামুটি ধনী ব্যক্তি ছিলেন। এখানে উপস্থিত প্রত্যেক অতিথির সঙ্গে তাঁর আলাপ থাকলেও, এমন কোন সম্ভাবনা দেখা

যাচ্ছে না, যাতে প্রমাণিত হয় তিনি মারা গেলে অমুক ব্যক্তি তাঁর অর্থের অধিকারী হবে।

তবে কি অর্থই অনর্থের মূল নয়।

বাসব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ভাবতে লাগল। মোটিভ নেই অথচ একটা খুন হয়ে গেল তা কখনই হতে পারে না। মোটিভ একটা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেটা কি? তারপর ওই বাচ্চা ছেলের ফটোগ্রাফখানা, ওখানাই বা প্রশান্ত রায়ের পকেটে ছিল কেন? তাছাড়া ওই ছবিখানা যে কার সে কথাও কেউ বলতে পারছে না। বিচিত্র রহস্য।

বাসব সিগারেটে ঘন ঘন বার কয়েক টান দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চিন্তাকে এখন আর প্রশ্রয় দেবে না। বরং এই সময় যে কাজগুলো হয়নি, সেগুলো সেরে নেওয়া ভাল অর্থাৎ এখনও যাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা হয়নি তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেওয়া।

বাসব রজত ভৌমিকের ঘরের দরজায় গিয়ে করাঘাত করল।

ভৌমিক তখন একটা পেন্সিল স্কেচ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

মুখ তুলে বললেন, কে?

—ভেতরে আসতে পারি?

কণ্ঠস্বরেই মানুষটিকে চিনতে পেরেছিলেন ভৌমিক। উঠে গিয়ে দরজার অর্গল মুক্ত করে দিয়ে বললেন, আসুন বাসববাবু—

বাসব ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, ছবি আঁকছিলেন?

—কি আর করি বলুন। এখানে যখন আটকে পড়া গেছে তখন এই বিরাট অবসরে ছবির সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ। বসুন

বাসব একটা গদী মোড়া চেয়ারে বসে পড়ে অর্ধ-সমাপ্ত ছবির দিকে তাকিয়ে বললে, মনে হচ্ছে যেন, নাগচৌধুরী হাউসের সামনের বাগানে যে স্ট্যাচুটা রয়েছে—

ঠিকই ধরেছেন—। সেই স্ট্যাচুরই স্কেচ করছি। তারপর কেসটার সম্বন্ধে কতদূর কি হল মশাই?

—এখনও আমি এবং পুলিস পক্ষ অন্ধকার হাতড়েই বেড়াচ্ছি। ওই খুন সম্পর্কেই আপনার কাছে এলাম। গোটা কয়েক প্রশ্ন করব। অবশ্য আপনার সময় কিছু নষ্ট হবে।

—সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না মিঃ ব্যানার্জী। হোক সময় নষ্ট। আপনি আমায় কি বলতে চান বলুন।

বাসব নড়ে চড়ে বসে নিজের প্রশ্ন আরম্ভ করল, যখন প্রশান্ত রায় খুন হন অর্থাৎ রাত্রি এগারটা আন্দাজ আপনি কোথায় ছিলেন?

দ্রুত গলায় রজত ভৌমিক বললেন, কেন নিজের ঘরে।

—কি করছিলেন?

—ছবি আঁকছিলাম।

—ও। সেই ছবিটা একবার দেখাবেন।

নিশ্চয়ই। এই দেখুন না।

টেবিলের উপর থেকে ছবিখানা তুলে বাসবের দিকে এগিয়ে ধরলেন ভৌমিক। ১৪ × ৮ সাইজের কাগজের উপর আঁকা ছবিখানা। মেয়ের মুখ। এখনও অর্ধ-সমাপ্ত। মুখের ছায়াময় কংকাল বলে মনে হয়।

ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বাসব বলল, রত্নাদেবীর সঙ্গে তো আপনার আলাপ আছে, না?

—আছে। এখানে আসবার সময় ট্রেনে আলাপ হয়।

প্রশান্তবাবুকে আপনি ঘনিষ্টভাবে চিনতেন?

—ঘনিষ্ঠ বলতে যা বোঝায় সে রকম আলাপ অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমার ছিল না। তবে মুখ চেনাচেনি ছিল। কোথাও দেখা সাক্ষাত হলে আমরা কুশল প্রশ্ন বিনিময় করতাম।

-এই মুখ চেনা-চিনি আপনাদের কিভাবে হয়?

একটু থেমে উত্তরটা মনের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে ভৌমিক বললেন, অরবিন্দ দত্তের মাধ্যমেই আমাদের আলাপ হয়েছিল। আপনি জানেন কিনা জানি না, অরবিন্দবাবু কলকাতার একটা রাইফেল ক্লাবের পাণ্ডা বিশেষ। ওই ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন প্রশান্তবাবুর শ্বশুরমশাই। একজন নিয়মিত ডোনারও। আমি ওরই ছবি আঁকতে যেতাম ওখানে। অরবিন্দবাবু একদিন মিঃ রায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

অরবিন্দবাবুর সঙ্গে প্রশান্ত রায়ের বুঝি খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল?

--ছিল, তবে

—থামলেন কেন?

রুমাল দিয়ে নিজের মুখ ভাল করে মুছে নিয়ে রজত ভৌমিক বললেন, বললাম না মিঃ রায়ের শ্বশুরমশাই রাইফেল ক্লাবের একজন বড় ডোনার ছিলেন। তিনি একদিন শ্বশুরের এই বদান্যতা বন্ধ করে দিলেন। এ ব্যাপারেই তাঁর সঙ্গে অরবিন্দবাবুর মনান্তর হয়েছিল।

প্রায় পাঁচ মিনিট বাসব কোন কথা বলল না। বসে রইল চুপচাপ। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়ালো। খোলা জানলার পাশে মাঝারি সাইজের একটা টেবিল ছিল। তার উপরকার জিনিসপত্রগুলো নাড়াচাড়া করল—ফিরে এসে বসল আবার নিজের চেয়ারে।

—আচ্ছা মিঃ ভৌমিক, প্রশান্তবাবুর খুন হওয়া সম্পর্কে আপনি কাউকে সন্দেহ করেন?

—কাকে করব বলুন?

—আপনি ল্যাভেণ্ডার ব্যবহার করেন কি?

এই অদ্ভুত প্রশ্নে ভেবাচেকা খেলেন রজত ভৌমিক। তিনি বললেন, ল্যাভেণ্ডার কই না তো!

—একটু ভেবে বলুন।

—যা আমি মোটেই ব্যবহার করি না, সে সম্বন্ধে ভেবে আর কি বলব।

বাসব আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানলার পাশের টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেল। টেবিলের উপর অনেক কিছুর সঙ্গে প্রসাধন সামগ্রীও ছিল। তার মধ্যে থেকে একটা সুদৃশ্য শিশি তুলে নিয়ে বলল, এটা যেন ল্যাভেণ্ডারের শিশি বলেই মনে হচ্ছে? দেখুন তো?

বিস্মিত ভঙ্গিতে রজত ভৌমিক বাসবের হাত থেকে ল্যাভেণ্ডারের শিশিটা নিলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, তাই তো! ল্যাভেণ্ডারের শিশিই। কিন্তু আমার ঘরে কিভাবে এল?

—সত্যকে মিথ্যে দিয়ে কেন ঢাকছেন?

বিশ্বাস করুন, এই শিশিটার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। ল্যাভেণ্ডার দূরের কথা জীবনে সেণ্টই ব্যবহার করলাম না।

- আপনার কথা বিশ্বাস করে নিলেও এই শিশিটা পায়ে হেঁটে আপনার ঘরে এসেছে তাও নিশ্চয় বিশ্বাসযোগ্য নয়।

—আমিও আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি কেউ নিশ্চয়ই রেখে গেছে শিশিটা। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই ল্যাভেণ্ডারের শিশির কোন যোগ আছে নাকি?

—শিশিটার আছে কিনা বলতে পাচ্ছি না। তবে ল্যাভেণ্ডারের হয়তো কোন যোগাযোগ আছে।

বাসব শিশিটা পকেটস্থ করে বলল, চললাম। শিশিটা নিয়ে যাচ্ছি।

রজত ভৌমিককে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দায় পা দিয়েই আবার পাশের ঘরে নক্‌ করল।

—ভেতরে আসুন।

বাসব ঘরে প্রবেশ করল।

সামনেই দাঁড়িয়ে সুচেতা।

—আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম বাসববাবু।

—আমার!

—হ্যাঁ।

—কেন বলুন তো?

—আপনি সকলকেই খুন সম্বন্ধে জিগ্যাসাবাদ করছেন, আমাকে আর দাদাকে কি আর বাদ দেবেন?

বাসব মৃদু হেসে বলল, আপনি খুবই বুদ্ধিমতী।

—বলুন, কি জানতে চান আমার কাছ থেকে?

—গোটা কয়েক সাধারণ প্রশ্নের উত্তর পেলেই আমি খুশি হব। আপনি প্রশান্ত রায়ের সঙ্গে নিশ্চয় পরিচিত ছিলেন?

ছিলাম। কলকাতার এক রাইফেল ক্লাবে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। উনি নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে যেতেন।

—আপনি রাইফেল ক্লাবে যেতেন কেন?

—আমার দাদা ওখানকার সেক্রেটারি ছিলেন। যেতাম মাঝে মাঝে।

—মিস দত্ত ?

—বলুন ?

– আপনি যখন রাইফেল ক্লাবে ঘোরাঘুরি করেছেন তখন আশা করা যায় গান হ্যান্ডেল করতে পারেন ?

হেসে উঠল সুচেতা।—আমাকেই সন্দেহ করলেন শেষ পর্যন্ত।

বাসব দৃঢ় গলায় বলল, আমার প্রশ্নের উত্তর এ নয়।

—হ্যাঁ পারি।

—আপনি এ-বাড়ির বৌ হতে চলেছেন। আপনার সঙ্গে সৈকতের কিভাবে আলাপ পরিচয় হয় তা আমি জানি। প্রশ্নের মোড় ওধারে ঘোরাব না। এখন অনুগ্রহ করে বলুন, দুর্ঘটনার সময় আপনি কোথায় ছিলেন ?

—কেন, এই ঘরে।

বাসব পূর্ণ দৃষ্টিতে সুচেতার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি যদি বলি ·সেই সময় আপনি এ ঘরে ছিলেন না।

সুচেতা উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, প্রকারান্তরে নয়, আপনি পরিষ্কার ভাবেই আমাকে মিথ্যাবাদী বললেন।

—আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন মিস দত্ত। আমি যা জানি তাই আপনাকে বললাম।

—আপনি ভুল জানেন। আমি সে সময় ঘরে ছিলাম। এই সময় ঘরে প্রবেশ করলেন অরবিন্দ দত্ত।

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দীর্ঘ পেশল দেহ তাঁর। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মধ্যে।

তিনি ভ্রূ কুঁচকে বাসবের দিকে তাকালেন। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

বিরক্তি সহকারে অরবিন্দ দত্ত বললেন, আপনারা একি কান্ড করে তুলেছেন মশাই ?

নির্লিপ্ত গলায় বাসব প্রশ্ন করল, কোন কাণ্ডর কথা বলছেন ?

—পুলিসের কাণ্ডকারখানার কথা বলছি। আমরা আর কতদিন এইভাবে নজরবন্দী হয়ে থাকব ?

—আমি যত দূর শুনেছি, আপনারা সকলেই দিন দশেক হাতে নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছেন। কাজেই এত তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হবার তো কোন কারণ নেই। ভেবে নিন না, পুলিসের নজরবন্দীতে আপনারা নেই। খেয়ে দেয়ে বেড়িয়ে দশ দিন কাটিয়ে এখান থেকে চলে যাবেন।

—ভেবে নিতে চাইলেই কি সব কিছু ভেবে নেওয়া যায়। তাছাড়া সকলকে আটকে রেখে তো লাভ নেই। যারা সন্দেহের বাইরে তাদের ছেড়ে দিলেই হয়।

বাসব অল্প একটু হেসে বলল, কিন্তু সন্দেহের বাইরে যে কেউ নেই। এমন কি আপনিও—

—আমি ! আকাশ থেকে পড়লেন অরবিন্দ দত্ত ।—আমি কি করলাম। আপনারা আমাকে কেন সন্দেহ করছেন ?

—আপনাকে সন্দেহ করার বিশেষ কারণ রয়েছে মিঃ দত্ত।

—কোন কারণ নেই।

—আছে।

—আমার সম্পর্কে কোন কথা জোর করে বললেই যে আমি মেনে নেব, তা ভেবে নিয়ে থাকলে ভুল করেছেন। এখন বলবেন কি আমাকে সন্দেহ করার কারণ ?

—বলব বইকি। প্রশান্তবাবু খুন হওয়ার পর, আমরা যখন গাড়ি বারান্দায় উপস্থিত রয়েছি, তখন বাগানের গেটের দিক থেকে আপনাকে আসতে দেখা গিয়েছিল। আপনার আচরণে ত্রস্তভাব ফুটে উঠেছিল। এর কারণ কি মিঃ দত্ত ?

বাসবের কথা শুনে অরবিন্দ দত্ত একটু থতমত খেলেন।

—যে সময়ে মানুষের লেপ গায়ে ঘুমাবার কথা, সেই সময় অন্ধকার বাগানের মধ্যে আপনি কি করছিলেন ?

—বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বেড়ান আমার অনেক দিনের অভ্যাস।

—এই প্রচণ্ড শীতে রাত এগরাটার সময় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। কথাটা অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমাকে সত্যি কথাটা বললেই ভাল করবেন।

—আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলছি।

—যাক, এবার আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে আসি কি বলেন ? বাসব বলল, প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল সংবাদ পেয়েছি। তিনি .

—ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল না। মোটামুটি পরিচয় ছিল বলতে পারেন।

—ওই হল। তারপর আপনাদের মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হয়। বিশদ কারণটা যদি আমাকে জানান তাহলে বিশেষ ভাল হয় মিঃ দত্ত।

—খুনের তদন্তর সঙ্গে এই সমস্ত কথার যে কি সম্পর্ক আমি বুঝতে পারছি না।—ওহো, প্রশান্ত রায়ের সঙ্গে রাইফেল ক্লাবে একবার বচসা হয়েছিল, তাই কি আমাকেই খুনী ঠাওরালেন ?

—দেখুন অরবিন্দবাবু আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছাধীন। তবে সঠিক ভাবে যদি সমস্ত কথা বলেন তবে আমার তদন্তের সুবিধা হবে।

অরবিন্দ দত্ত প্রায় দু মিনিট চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আমাদের রাইফেল ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন রামেশ্বর বসু। প্রশান্ত রায় তাঁর জামাই। ওখানেই মিসেস রায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় এবং পরিশেষে বিয়ে। ক্লাবের সেক্রেটারি হিসেবে মিঃ রায়কে মোটামুটি চিনতাম। তাঁকে ভালই লাগত। হঠাৎ একদিন তিনি একটা কাণ্ড করে বসলেন। প্রতি বছরেই রামেশ্বরবাবু মোটা টাকা ডোনেসান দিতেন ক্লাবকে। সেবার মিঃ রায় শ্বশুরের এই বদান্যতা বন্ধ করে দিলেন। এই নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তারপর থেকে আমরা দুজনে দুজনের সঙ্গে কথা বলতাম না।

বাসব পকেট থেকে ফটোগ্রাফখানা বার করল। মেলে ধরল দুজনের সামনে।

—দেখুন তো—বলতে পারেন এই ছবিখানা কার?

—না।

অরবিন্দ অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সুচেতাও।

বাসব আর কোন প্রশ্ন করল না। ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল

সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন ইন্সপেক্টর শুক্লা। কলকাতা যাওয়ার কোন অসুবিধাই হল না বাসবের। যাওয়ার আগে সৈকতকে বলে গেল দিন পাঁচেকের মধ্যেই ফিরবে। ও যেন অতিথিদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

বাসব কলকাতায় পৌঁছাল বেলা সাড়ে এগারটার সময়। বাড়ি গিয়ে খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে প্রায় দুটো বেজে গেল। তারপর ও বেরুল লালবাজারের উদ্দেশে। অফিসেই ছিলেন মিঃ সামন্ত। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের দুঁদে অফিসার তিনি। বাসবকে দেখে সাড়ম্বর অভ্যর্থনা জানালেন।

সহাস্যে বলল, বিনা প্রয়োজনে নিশ্চয়ই আসেননি?

বাসবও সহাস্যে বলল, বলাবাহুল্য।

মিঃ সামন্ত সিগারেটের কেসটা এগিয়ে ধরে বললেন, প্রয়োজনটা শুনি। দেখি মুশকিল আসান করতে পারি কি না।

বাসব একটা সিগারেট তুলে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করল। তারপর পকেট থেকে প্রশান্ত রায়ের পকেটে পাওয়া রুমালটা বার করে বলল, এই রুমাল যে ধোপা কেচে ছিল তার সন্ধান চাই।

রুমালটা নেড়ে চেড়ে দেখে সামন্ত বললেন, মার্কাটা বেশ পরিষ্কার উঠেছে। কিন্তু এই বিরাট শহরে কোন ধোপা এই মার্কা ব্যবহার করে তা খুঁজে বার করা এক আধ ঘণ্টার কর্ম নয়। অন্ততঃ দুদিন সময় দিতে হবে।

– বেশ, দুদিনই সময় নিন। সাদা কথা রজক প্রবরের সন্ধান চাই।

—তা না হয় করে দেওয়া গেল। এবার বলুন তদন্তটা কি।

বাসব আদ্যপান্ত সমস্ত ঘটনাটা বলল। এই ভাবে ঘণ্টা দুয়েক ওখানে কাটিয়ে বিদায় নিল।

লালবাজার থেকে ফিরে এসে দুপুরের বাকী সময় ঘুমিয়ে কাটাল বাসব। সারাটা রাত ট্রেনে এসেছে। ট্রেনে জেগে বসেছিল তা নয়। তবু আরেকটু ঘুমিয়ে নিলে শরীর চাঙ্গা হবে। বিকেল উতরে যাবার পর বাসব বাড়ি থেকে বেরুল। প্রশান্ত রায়ের পকেটে পাওয়া বাচ্চা ছেলের ছবিখানা নিজের পকেটে ভরে নিয়ে ও বেরিয়েছে।

বাসব খুঁটিয়ে দেখেছে, ফটোগ্রাফখানা গ্লসি পেপারে প্রিন্ট করা। উল্টো-দিকের সাদা অংশ রবার স্ট্যাম্প দিয়ে যে দোকানে ছবি তোলা হয়েছে সেই দোকানের ঠিকানা লেখা রয়েছে। বাসব এখন যাবে সেই ফটোগ্রাফারের কাছে। যদি কোন সূত্র ওখানে পাওয়া যায়।

খুব বড় দোকান নয়। মাঝারি গোছের। সুদৃশ্য কাচের শো কেস আছে। বাসব গিয়ে দোকানে ঢুকল, কাউণ্টারের লোকটি অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছিল তার সঙ্গে কথা শেষ করে বাসবের সামনে এসে বলল, বলুন—?

আমি দোকানের ওনারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

আমিই ওনার। বলুন?

বাসব নিচু গলায় বলল, একটা খুনের তদন্তে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।

তারপর নিজের পরিচয় দিল। দোকানদার বাসবের নাম শুনেছিলেন। শুনেছিলেন বলা ঠিক হবে না। পড়েছিলেন। খবরের কাগজেই পড়েছিলেন ওর নাম। তিনি বেশ ভীত ভাবে বললেন, আমার দোকানে খুনের তদন্ত করতে এসেছে.. আমি কিন্তু...

আপনি ভয় পাবেন না। এই তদন্তের সঙ্গে আপনার কোন যোগ নেই। কিছুদিন আগে একটি বাচ্চা ছেলের ছবি এখানে তোলা হয়। আমি সেই ছবির সম্পর্কেই গোটা কয়েক কথা আপনার কাছ থেকে জেনে নেব।

দোকানদার মুখ ফিরিয়ে বললেন, প্রভাত, কাউণ্টারে এসে দাঁড়া। আমি একটু অফিস ঘরে যাচ্ছি আসুন

তিনি বাসবকে নিয়ে খুপরি মত একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। দুজনে দুটো চেয়ার অধিকার করে বসবার পর বাসব ছবিখানা এগিয়ে ধরে বলল এই ছবিখানা আপনার স্টুডিওতে তোলা হয়েছিল। এই ছেলেটির বিষয় কিছু বলতে পারেন?

দোকানদার ছবিখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, রবার স্ট্যাম্প রয়েছে যখন তখন ছবিখানা আমাদেরই তোলা। কিন্তু প্রত্যহ এত ছবি তোলা হয় যে কোন কিছু বলা মুস্কিল। দাঁড়ান, দেখছি চেষ্টা করে যদি কিছু বলা যায়। প্রভাত—

—আজ্ঞে—

প্রভাত খুপরিতে প্রবেশ করল।

—আমাদের তোলা ছোটদের ছবির যে অ্যালবাম আছে, তাতে দেখ তো এই ছবিখানা আছে কিনা। থাকলে লেজারটা নিয়ে এস।

প্রভাত ছবি নিয়ে চলে গেলে তিনি আবার বললেন, আমাদের স্টুডিওতে যে ছবিই তোলা হোক না কেন, এক কপি করে রেকর্ড হিসাবে নম্বর দিয়ে রেখে দেওয়া হয়।

মিনিট দশেক পরে প্রভাত একটা বিরাট লেজার নিয়ে উপস্থিত হল। বলল, এ ছবির ডুপ্লিকেট অ্যালবামে আছে স্যার। দু'হাজার বাহাত্তর নম্বর।

লেজার খুলে দু'হাজার বাহাত্তর নম্বর ছবির পরিচয় পাওয়া গেল, তোলা হয়েছে প্রায় এক বছর আগে। ঠিকানা, দীপক। C/o. প্রশান্ত রায়.. নং কালী চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৩৪।

ঠিকানা দেখে বাসব বিস্মিত হল। কারণ প্রশান্ত রায়ের বাড়ি লেক প্লেসে। দীপককে তাঁর শ্বশুরবাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন সেখানে।

আমরা

যাইহোক, খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। বাসব দোকানদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওখান থেকে বিদায় নিল। তখন প্রায় সাড়ে ছটা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ড্রাইভারকে টালিগঞ্জের দিকে যাবার নির্দেশ দিয়ে চিন্তার সমুদ্রে ডুব দিল বাসব। দীপক নামে ছেলেটি কে? প্রশান্ত রায়ের সঙ্গে কি সম্পর্ক? কালী চৌধুরী লেনে গিয়ে পড়তে পারলেই কি অনেক রহস্য আর রহস্য থাকবে না।

টালিগঞ্জে পেঁছাবার পর, কালী চৌধুরী লেন খুঁজে বার করা খুব সহজ হল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। নামে লেন হলেও খুব সংকীর্ণ নয় পথটা। নির্দিষ্ট নম্বরের বাড়িতে গিয়ে দেখল, তালা ঝুলছে। তালার এবং দরজার অবস্থা দেখে মনে হয় বেশ কয়েকদিন থেকে বন্ধ রয়েছে।

বাসব পাশের বাড়ির দরজায় গিয়ে নক করল। এক ভদ্রলোক বেরিয়ে আসতেই প্রশ্ন করল, ও বাড়ির ওরা কোথায় গেলেন বলতে পারেন?

--তাতো বলতে পারব না।

—প্রশান্ত রায় তো থাকেন ওখানে?

ভদ্রলোক বললেন, ও বাড়িতে প্রশান্ত রায় বলে কেউ থাকে না। একজন মহিলা থাকেন। আমি মশাই এ পাড়ায় নতুন এসেছি। সঠিক কিছু বলতে পারব না। তবে এসে অবধি মাঝে মাঝে একটা বাচ্চা ছেলে ছাড়া আর কোন পুরুষ মানুষ দেখিনি।

ও। দেখুন, বিশেষ কারণে ওদের খোঁজ খবর নিতে এসেছি। আচ্ছা বলতে পারেন, যে মহিলা ওই বাড়িতে থাকেন তাঁর সঙ্গে এ পাড়ার কারুর সঙ্গে হৃদ্যতা আছে কিনা?

ভদ্রলোক একটু চিন্তা করে বললেন ওই দূরে হলদে রং-এর বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন। ওখানে কনক সেন থাকেন। তাঁর সঙ্গে পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলার ভাবসাব আছে দেখেছি।

বাসব ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে হলদে রং-এর বাড়ির দিকে এগুলো। হলদে রং-এর বাড়ির দরজায় গিয়ে দেখল নেমপ্লেট লাগান, ডাঃ মিস কনক সেন। কলিং বেলও রয়েছে। বাসব বেল পুস করল। বার দুয়েক বেল পুস করতেই দরজা খুলে গেল। মধ্য বয়স্কা একজন মহিলা দরজার ও প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন।

--আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে।

—আসুন।

বাসব ঘরের মধ্যে গেল।

কথায় বলে পুলিসের অসাধ্য কিছু নেই। যাকে প্রয়োজন ঠিক সেই ধোপাকেই খুঁজে বার করেছে পুলিস। মিঃ সামন্ত বাসবকে ফোন করলেন। হেসে বললেন, আপনার রজকপ্রবর লালবাজারে উপস্থিত। চলে আসুন তাড়াতাড়ি।

— বলেন কি ! এখনও কিন্তু দুদিন পার হয়নি ।

— তাহলে বুঝে দেখুন, আমাদের কর্মতৎপরতা ।

বাসব জোরে হেসে উঠল । তারপর বলল, এখুনি আসছি ।

ধোপার নাম লোটান । কালো, বেঁটে, সিঁটকে চেহারা লোটানের । বারান্দার একধারে বসে ঠক ঠক করে কাঁপছিল সে ।

তাকে বোঝান হয়েছে ভয়ের কিছু নেই, গোটা কয়েক প্রশ্ন করেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তবু লোটানের কাঁপুনি গেল না ।

বাসব তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, রুমালে যে মার্কা আছে তা তোমারই ?

— আজ্ঞে বাবু ।

—তোমার ভয় পাবার কিছু নেই । আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যাও তাহলেই হবে । যে বাবুর ওই রুমালখানা তাঁর নাম কি ?

—নাম বলতে পারব না । বাবুর বাড়ি থেকে কাপড় নিয়ে আসি, ধুয়ে দিয়ে আসি আবার । নাম কি করে জানব বাবু ?

—রুমালে একরকম গন্ধ আছে লোটান, তুমি শুঁকেছ ?

— ওই বাবুর সমস্ত রুমালেই ওই আতরের গন্ধ থাকে বাবু ।

— নাম তো বলতে পারলে না, বাড়িটা দেখিয়ে দিতে পারবে নিশ্চয়ই ?

—তা পারব বাবু ।

—তাহলে তাই দেখিয়ে দেবে চল । মিঃ সামন্ত, লোটানকে সঙ্গে নিয়ে চললাম । কলকাতা ছাড়ার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব ।

— বেশ তো ।

বাসব লোটানকে সঙ্গে নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে পড়ল ।

তারপর যখন নিজের হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরল বাসব, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে । সমস্ত কাজ শেষ করেই ফিরতে পেরেছে । ওর মুখে সাফল্যের হাসি । কিন্তু ওর আর বেশিক্ষণ কলকাতায় থাকবার উপায় নেই । মাত্র দু ঘণ্টা পরে আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস ছাড়ছে শেয়ালদা থেকে । ওই ট্রেনটাই অ্যাভেল করবে বাসব ।

ইন্সপেক্টর শুক্লা থানাতেই ছিলেন । বাসবকে দেখে সহর্ষে বললেন, কখন ফিরলেন কলকাতা থেকে ।

— এই তো মিনিট কুড়ি হল । বেশ সন্তোষজনক কাজকর্মই কলকাতায় হয়েছে ।

—তাই নাকি ?

বাসব বলল, শুধু তাই নয় । আজ সন্ধ্যাবেলাতেই এই হত্যা নাটকের উপর আমি যবনিকা ফেলতে পারব ।

—বলেন কি ? আপনি জানতে পেরেছেন, কে খুনী ?

—পেরেছি মিঃ শুক্লা । সন্ধ্যার সময় সকলের সামনে তার নাম প্রকাশ করে দেব । আপনি নাগচৌধুরী হাউসের সকলকে ছটার পর ড্রইংরুমে উপস্থিত থাকতে

বলবেন।

—বেশ।

সন্ধ্যা হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। তন্দ্রা রায়ের ঘরে সমবেত হয়েছেন সকলে। তাঁর মনের অবস্থা বিবেচনা করে তাঁকে টানা হেঁচড়া না করে, ড্রইংরুমের পরিবর্তে তাঁর ঘরেই শেষ পর্যন্ত সকলকে আহ্বান করেছে বাসব।

ঘরে উপস্থিত রয়েছেন, রণদাকান্ত নাগচৌধুরী, সৈকত, তন্দ্রা রায়, সুচেতা, বস্ত্রাদেবী, রজত ভৌমিক, অরবিন্দ দত্ত ও ডাঃ দিবাকর গুপ্ত। ইন্সপেক্টর শুক্লাও আছেন। কারুর মুখে কথা নেই। সকলের মুখে থমথমে ভাব।

বাসব বলল, আপনারা সকলেই উপস্থিত রয়েছেন। এবার আমি আপনাদের কাছে সেই রক্তাক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, প্রকৃত পক্ষে যা ঘটা উচিত ছিল না।

রণদাকান্ত বললেন, তুমি বুঝতে পেরেছ বাসব, কে হত্যাকারী?

আজ্ঞে হ্যাঁ হত্যাকারীকে বোধহয় আমি বহু আগেই ধরতে পারতাম, যদি প্রত্যেকে আমার কাছে সত্যি কথা বলতেন।

ডাঃ দিবাকর গুপ্ত বললেন, আপনি বলতে চান আমরা সকলে আপনার কাছে মিথ্যে স্টেটমেন্ট দিয়েছি।

নির্ভেজাল মিথ্যে কথা বলেছেন এ কথা বলছি না। তবে কিছু সত্যের অপলাপ যে করেছেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যেমন আপনার কথাই ধরা যেতে পারে।

—আমার কথা।

চমকে উঠবেন না ডাঃ গুপ্ত। আমার কথা আগে শুনুন। আপনি নিজের স্টেটমেন্টে বলেছেন, হাল্কা লোহা জাতীয় জিনিস পড়ে যাবার শব্দ শুনে আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পান রিভলবারের শব্দ।

- একজ্যাক্টলি।

—যদি তাই হবে, তবে এরকম একটা ঘটনার পর অন্য কিছু না করে গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে পড়ে কি করছিলেন?

না, মানে ··

-আমি যদি বলি, আপনি মৃত মিঃ রায়ের পকেট থেকে সে সময় কিছু বার করে নেবার চেষ্টা করছিলেন।

ডাঃ গুপ্ত ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, আপনি বোধহয় আমাকে অনর্থক অপমানিত করতে পারেন না।

বাসব বলল, নিশ্চয়ই পারি না। প্রমাণ না পেয়ে কোন কথা বলছি না। আমি আরো প্রমাণ পেয়েছি আপনি একজন ল্যাভেন্ডারের প্রথম শ্রেণীর ভক্ত। অথচ সে কথাটাও আমার কাছে অস্বীকার করেছিলেন।

—কথাটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় যা আপনাকে না বলায় খুব ক্ষতি হয়েছে।

—তাই যদি হবে তবে আপনি নিজের ল্যাভেন্ডারের শিশি রজতবাবুর ঘরে

রেখে এসেছিলেন কেন ? এর নিশ্চয়ই কোন সঙ্গত কারণ আছে ডাঃ গুপ্ত।

দিবাকর গুপ্ত দমে গেলেন। ধরা গলায় বললেন এতে প্রমাণ হচ্ছে কি আমি প্রশান্তকে খুন করেছি ?

বাসব সে কথায় কান না দিয়ে বলল, এই রুমালটা চিনতে পারেন ? ল্যাভেণ্ডার মাখানো এই রুমাল আপনারই। প্রশান্ত রায় খুন হবার পর, এই রুমালখানাই আপনি মোটরের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে তাঁর পকেট থেকে তুলে নেবার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় আমি গিয়ে পড়ি।

—ও রুমালখানা আমার নয়।

— অস্বীকার করবার মিথ্যে চেষ্টা করছেন। রুমালে যে ধোপার মার্কা আছে, কলকাতায় সে সম্বন্ধে পুলিসের সাহায্যে খোঁজ নিয়েছিলাম। আপনার লোটানের সন্ধান পাওয়া গেছে। সে আপনার বাড়ি আমাকে দেখিয়ে দেয় এবং স্বীকার করে ল্যাভেণ্ডার দেওয়া রুমাল আপনি নিয়মিত ব্যবহার করে থাকেন।

এবার দিবাকর গুপ্ত ভেঙ্গে পড়লেন, বিশ্বাস করুন বাসববাবু, আমি খুন সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

—আপনি অস্থির হবেন না ডাঃ গুপ্ত। আমাকে আর সকলের সঙ্গে কথা শেষ করে নিতে দিন।—বাসব রজত ভৌমিকের দিকে তাকিয়ে বলল, সেদিন আমায় বলেছিলেন, খুন হওয়ার আগের মুহূর্ত অবধি আপনি নিজের ঘরে ছবি আঁকছিলেন –

—হ্যাঁ। ছবিটা আপনি দেখেছেন ?

—দেখেছি বইকি। কিন্তু আপনি তো সে সময় বাড়ি ছিলেন না।

—ছিলাম না ?

না। রত্নাদেবী আপনাকে ঘরে গিয়ে দেখতে পাননি। আপনি ওই সময় বাগানের মধ্যে গিয়ে কি করছিলেন ?

রজত ভৌমিকের মুখে দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠল। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, আমার বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণ নেই যাতে আপনি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন। তাছাড়া ব্যক্তিগত আলোচনা আমি পছন্দ করি না।

—বিশেষ তা যখন প্রত্যাখ্যানের ইতিহাস।

—মিঃ ব্যানার্জী—

—রাগ করছেন ? আমি সব জানি মশাই।

কি বলতে গিয়েও বললেন না ভৌমিক। তাঁর মুখে ভাবান্তর পরিলক্ষিত হল। বিন্দু বিন্দু ঘাম দিল কপালে।

অরবিন্দ দত্ত বলে উঠলেন, আমার এসব ভাল লাগছে না। আমি স্পষ্ট ভাবে জানতে চাই হত্যাকারী কে ?

বাসব নির্লিপ্ত গলায় বলল, আপনিও হতে পারেন।

—আমি। আমার স্বার্থ ?

—মিঃ রায়ের শ্বশুর আপনাদের রাইফেল ক্লাবের বড় ডোনার ছিলেন বলতে গেলে তাঁর অর্থের আনুকূল্যেই আপনাদের ক্লাবের যা কিছু সমৃদ্ধি। মিঃ রায়

শ্বশুরের এই বদান্যতা বন্ধ করে দেন। আপনি ওখানকার একজন কর্তাব্যক্তি। মিঃ রায়ের উপর আক্রোশ হওয়াটা আপনার অস্বাভাবিক নয়।

-- চমৎকার! আপনার বাহাদুরী আছে বলতেই হবে।

—বিদ্রূপ করে কোন বিষয়ে আমাকে টলিয়ে দেওয়া একটু কষ্টকর। শুনুন মিঃ দত্ত, সেদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বাগানে বেড়াতে যাওয়ার কৈফিয়ত আমি বিশ্বাস করিনি, আপনি জানেন। এখন জেনে নিন, প্রকৃত কারণটাও আমার অজানা নেই। আপনি আড়ি পেতে দুজনার কথা শুনছিলেন।

- আড়ি পেতে! আমি?

অবুঝ হওয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনি সুচেতাদেবী আর....

বাসবের কথা শেষ হবার আগেই তীব্র গলায় সুচেতা বলল, আমি মোটেই সেদিন রাত্রে বাগানে যাইনি।

—এই কাপড়ের টুকরোটা চিনতে পারেন?

বাসব লাল রং-এর এক টুকরো কাপড় দেখিয়ে বলল, আপনারই শাড়ির ছেঁড়া অংশ। আমি বাগানের তারের বেড়া থেকে খুলে এনেছি! না--না অস্বীকার করবেন না। শীতের ঐ অন্ধকার রাত্রে আপনি যার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন, তাঁকে আমি চিনি। আর আপনার দাদা সেই সময় আড়াল থেকে আপনাদের কথা শুনছিলেন।

- প্লিজ বাসববাবু, আর কিছু বলবেন না সুচেতার গলা কাঁপছে।

- কিন্তু ...ওকি রত্নাদেবী আপনি চলে যাচ্ছেন যে?

সকলে একসঙ্গে দৃষ্টি ফেরালেন দরজার দিকে। ত্রস্ত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়েছেন সুগায়িকা রত্নাদেবী।

- আপনি চলে যাচ্ছেন? আবার বলল বাসব।

—অসুস্থতা বোধ করছি, বসে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর।

কিন্তু চলে যাওয়া যে আপনার এখন হবে না।

-- কেন?

আপনার উপস্থিত বিশেষ প্রয়োজন। আপনি ঘটনাটাকে বেশি গোলমেলে করে তুলেছেন। সমস্ত কথা যদি পরিষ্কার ভাবে বলতেন, তাহলে গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরতাম না।

রত্নাদেবী কিছু বললেন না।

- আপনি আমায় বলেছিলেন দুর্ঘটনার সময় রজতবাবুর ঘরে ছিলেন। তা আপনি ছিলেন না। একবার ওই ঘরে ঢুঁ মেরেই বাড়ির পিছন দিকের বাগানে চলে গিয়েছিলেন।

বাসব সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, আপনারা শুনলে অবাক হবেন, প্রশান্ত রায় সেদিন পাটনা যাননি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ বটুক সোমের রেস্টু-রেন্টে গিয়ে বসেছিলেন তারপর গিয়েছিলেন বাড়ির পিছন দিকের বাগানে। উদ্দেশ্য রত্নাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। ঘরের মধ্যে চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠল। তন্দ্রা রায় বিস্মিত

দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। রত্নাদেবী দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন নত মুখে।

— আপনি ফটোগ্রাফের মধ্যেকার বাচ্চা ছেলেটির বিষয় অজ্ঞতা প্রকাশ করে ছিলেন। আপনি তাকে নাকি চেনেন না। কিন্তু মা হয়ে নিজের ছেলের পরিচয় এই ভাবে অস্বীকার করা কি আপনার উচিত হয়েছে।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

সৈকত প্রশ্ন করল, রত্নাদেবী বিবাহিতা ?

— বিবাহিতা তো বটেই। তাঁর স্বামীর নাম শুনলেও কম আশ্চর্য হবেন না· আপনারা।

এবার ভেঙ্গে পড়লেন রত্নাদেবী।— না— না আমায় আর দগ্ধে মারবেন না মিঃ ব্যানার্জী। আমার অনুরোধ....

বাসব শান্ত গলায় বলল, আমি মর্মাহত রত্নাদেবী। এখন আর আমি চুপ করে থাকতে পারব না। আমাকে বলতেই হবে আপনি প্রশান্ত রায়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছিলেন।

ঘরের মধ্যে বোধহয় বাজ পড়ল। রত্নাদেবী নিজের হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কান্নার বেগ সামলাবার চেষ্টা করলেন। তন্দ্রা রায় উত্তেজিত গলায় বললেন, আপনি কি বলছেন বাসববাবু। উনি রত্নাদেবীকে বিয়ে করেছিলেন ?

ওদের দুজনের একটি ছেলেও আছে। তার ছবি আপনি দেখেছেন। আমি আপনার মানসিক অশান্তি ঘটানোর জন্য দুঃখ বোধ করছি। কিন্তু আমার উপর যে গুরু দায়িত্ব রয়েছে, তার দরুণ সমস্ত সেন্টিমেণ্টকে ঊর্দ্ধে রেখে আমাকে প্রকৃত তথ্য সকলের সামনে তুলে ধরতেই হবে।

বাসব মুখ ফিরিয়ে বলল, ওয়েল ইন্সপেক্টর, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন হত্যাকারী কে ? ঘরের মধ্যে পরিপূর্ণ নীরবতা নেমে এল কিছুক্ষণের জন্যে। রণদাকান্ত শুধু উসখুস করছেন।

হত্যাকারী যে যথেষ্ট চতুর তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রথমেই যে প্রশ্ন সকলের মনে জেগেছে— বাসব বলতে লাগল, তা হল প্রশান্ত রায় খুন হলেন কেন ? তাঁর মৃত্যুতে কেউ লাভবান হয়নি। আমাকেও প্রথমে এই প্রশ্ন বিভ্রান্ত করেছিল। ক্রমে সমস্ত সরল হয়ে এল আমার কাছে। তাঁকে খুন করা হয়েছে হিংসার বশবর্তী হয়ে। দিনের পর দিন কারুর মনে হিংসার ইন্ধন জুগিয়েছিলেন প্রশান্ত রায়, তাই এক বিশেষ মুহূর্তে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হতে হল। হত্যাকারী একজন প্রথম শ্রেণীর লক্ষ্যবিদ। রিভলবার চালনায় তার হাত খুবই পাকা। হয়তো কোন প্রতিষ্ঠানে সে এবিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিল।

করুণ কণ্ঠে অরবিন্দ দত্ত বললেন, আপনি কি আমায় মিন করছেন। বিলিভ মি

— শান্ত হয়ে বসুন। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।

রণদাকান্ত বললেন, আমি তো মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

তন্দ্রা রায় বললেন, আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, উনি আমার আগে আর

কাউকে বিয়ে করেছিলেন ?

বাসব বলল, অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। প্রমাণ এখানেই বর্তমান। তাছাড়া এসমস্ত আপনার অজানা ছিল না মিসেস রায়।

— আমার অজানা ছিল না !

— না। আপনি সমস্ত কিছু জানতেন।

আহত গলায় তন্দ্রা রায় বললেন, আপনি আমায় মিথ্যেবাদী বলতে চান ?

— অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে।

আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাই না। আজ উনি নেই, তাই আমায় এভাবে অপমানিত হতে হল।

দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

—দাঁড়ান। ঘর থেকে আপনার যাওয়া হবে না। আপনার মনের অবস্থা অনুমান করে নিতে কষ্ট হচ্ছে না। এ অভিনয় ছাড়া আর কোন পথ আপনার সামনে খোলা নেই। ইন্সপেক্টর, আপনি হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিন। শ্রীমতী তন্দ্রা রায় সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিকেই নিজের স্বামী প্রশান্ত রায়কে খুন করেছেন।

তীব্র গলায় প্রতিবাদ করে উঠলেন তন্দ্রা, আমি আমি—আমার স্বামীকে খুন করেছি ! কেন—কেন—

—আগেই বলেছি—প্রতিহিংসা। আপনি একদিন জানতে পারলেন আপনার স্বামী বহু পূর্বেই বিবাহিত. আপনাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য হল আপনার বাবার বিপুল অর্থের প্রতি মিঃ রায়ের লোভ। মনের মধ্যে আগুন জ্বলতে লাগল আপনার। চরম হল যখন একই স্থানে আমন্ত্রিত হলেন তিনজনে। স্বামীর হাবভাবে আপনি ক্রমেই উত্তেজিত হতে লাগলেন। এতদিন অবচেতন মনে যে ইচ্ছে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, এখন বিশেষ আকারে তা শেকড় গেড়ে বসল। সেদিন প্রশান্তবাবুর পাটনা যাওয়ার নামে কোথায় যাচ্ছেন তা আপনার কাছে অজানা ছিল না। আপনি মনস্থির করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পোর্টিকোতে গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে—

তন্দ্রা রায়ের সুন্দর মুখের উপর ক্রমেই কুৎসিত ভাব ফুটে উঠছে। তিনি অকারণেই হাঁপাতে আরম্ভ করলেন। প্রায় চিৎকার করে বললেন, আমি আমার স্বামীকে খুন করেছি তা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না।

—সে জন্যে আপনার বিরুদ্ধে মোক্ষম একটা প্রমাণের সন্ধান বোধহয় আমি পুলিসকে দিতে পারব।

বাসব পকেট থেকে রিভলবার বার করে তুলে ধরল --

এই সেই রিভলবার সেদিন যা গাড়ির তলায় পাওয়া গিয়েছিল। পুলিসকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এই অস্ত্র আপনি ঘটনাস্থলে ফেলে এসেছিলেন। কাজে লাগিয়ে ছিলেন অন্য একটা রিভলভার। আপনার আগে বোঝা উচিত ছিল এই কারচুপি আমরা সহজেই ধরে ফেলব; অগত্যা অন্য রিভলবারটার সন্ধান আমায়

করতে হয়েছে। আপনার অলক্ষ্যে এঘরে আজ আমি এসেছিলাম। ফ্লাওয়ার ভাসটার মধ্যে অভিষ্ট বস্তুর সন্ধান পেয়েছি।

বাসব কোণের টেবিলের উপর রাখা ফ্লাওয়ার ভাসের দিকে এগিয়ে গেল। তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলবার বার করে আনল। বলল, এই সেই রিভলবার যা দিয়ে খুন করা হয়েছে। প্রশান্তবাবুর শরীরে যে গুলি পাওয়া গেছে এরসঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। রিভলবারের উপর আপনার হাতের ছাপ আছে এবং আমার ধারণা এর লাইসেন্স বোধহয় আপনারই নামে।

তন্দ্রা রায় আর কিছু বললেন না। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন। তারপর হেসে উঠলেন। তীক্ষ্ণ, উচ্চ-গ্রামে হেসে চললেন অবিরত।

বৃষ্টি হচ্ছে। শীতের বেগ যেন আরো বেড়ে গেছে। ড্রইংরুমে সকলে একত্রিত হয়েছেন। মিসেস রায় আর ইন্সপেক্টর ছাড়া আর সকলেই আছেন। তখন সন্ধ্যা। রণদাকান্ত বললেন, শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল মেয়েটা।

ডাঃ গুপ্ত বললেন, খুন করার পর শোচনীয় মনের অবস্থা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন মিসেস রায়, ধরা পড়ে যাবার পর আর মেন্টাল ব্যালেন্স রাখতে পারেননি, এসব ক্ষেত্রে এই রকমই হয়।

সৈকত বলল, ভাবতেও পারা যায় না। আচ্ছা, বাসব, তুমি কি ভাবে বুঝতে পারলে মিসেস রায়ই হত্যাকারী?

—কিছু অনুমান আর কিছু প্রমাণের উপর নির্ভর করে।

রণদাকান্ত বললেন, ওভাবে নয়। তুমি সমস্ত ঘটনা আমাদের খুলে বল।

বাসব মৃদু হেসে আরম্ভ করল। সকলের স্টেটমেন্ট নেবার পর আমার মনে হল, অনেকেই আমার কাছে অনেক কথা চেপে গেছেন। ডাঃ গুপ্ত বলেছিলেন, তিনি করিডরের কাছে হাল্কা লোহার কোন জিনিস পড়ার শব্দ পেয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া যায়, হত্যাকারী যখন মিঃ রায়ের জন্যে করিডরে অপেক্ষা করছিল, সেই সময় তার হাত থেকে রিভলবার মাটিতে পড়ে যায়। শব্দ তারই। কিন্তু ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা রিভলবারের কোথাও চটা ওঠার দাগ দেখতে পেলাম না। আরো কয়েকটা জিনিস আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। যেমন, একটা বাচ্চার ফটোগ্রাফ আর ল্যাভেন্ডার মাখানো রুমাল। ও রুমালখানা মিঃ রায়ের ছিল না। এদিকে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে তারের বেড়ায় লাল শাড়ির ছেঁড়া টুকরো আটকে থাকতে দেখলাম। আমার মনে পড়ল এই ধরনের শাড়ি আমি সুচেতাদেবীকে দুর্ঘটনার দিন পরতে দেখেছি। তিনি ঐ রাত্রে বাগানে কি করছিলেন? তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, মিঃ রায় পাটনা যাননি। বাড়ির পিছন দিকের বাগানের ওপাশের পোড়ো জমিতে টায়ারের দাগ দেখতে পেলাম। ওধারে নাকি কখনই মোটর যায় না। তাছাড়া বটুক সোম বললেন, প্রশান্তবাবু তাঁর হোটেলে গিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। সহজেই বুঝতে পারা যায় হোটেল থেকে বেরিয়ে তিনি মোটর নিয়ে ঐ পোড়ো জমিতে

গিয়েছিলেন।

আমি তিনজনকে বিশেষ ভাবে সন্দেহ করলাম। এক, ডাঃ গুপ্ত। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে কি করছিলেন? দুই, অরবিন্দ দত্ত। দুর্ঘটনার পর তাঁকে বাগানের দিক থেকে কেন আসতে দেখা গিয়েছিল। তিন, রত্নাদেবী। তাঁর কথাবার্তা এত অসংলগ্ন কেন? মিসেস রায়ের উপর সন্দেহের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে তাঁর একটা কথা আমার মনে খটকা লাগাল। আমার প্রশ্নের উত্তরে এক জায়গায় তিনি বললেন, তিনি নাকি সাড়ে নটার সময় বাথরুম থেকে ফেরার পথে ডাঃ গুপ্তকে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেদিন পৌনে দশটা অবধি আমরা ডাইনিং হলে ছিলাম। খেতে গিয়েছিলাম নটার সময়। কাজেই মিসেস রায় তাঁর ঘর থেকে ওই সময় ডাঃ গুপ্তকে বেরিয়ে যেতে দেখতে পারেন না। যে ক্ষেত্রে দুজনেই তখন ডাইনিং হলে।

কলকাতায় গিয়ে অনেক বিষয় আমাকে খোঁজ খবর নিতে হল। ধোপার মারফত জানতে পারলাম রুমালটা ডাঃ গুপ্তর। রত্নাদেবার পরিচিতা কনক সেন জানালেন, রত্নাদেবী প্রশান্ত রায়ের স্ত্রী। ছেলেও আছে। ছেলেটি কার্শিয়াংএ পড়াশুনা করে। এদিকে জানা গেল মিসেস রায় একজন ভাল সুটার এবং লাইসেন্স যুক্ত রিভলবার আছে। সন্দেহ আমার মনে দানা বাঁধল। নিদারুণ হিংসাতেই তিনি যে একাজ করেছেন সহজেই বুঝতে পারলাম। তখন বাকি রইল শুধু প্রমাণ। প্রমাণও পাওয়া গেল। মিসেস রায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর ঘর সার্চ করলাম। আমি জানতাম নিজের রিভলবার তিনি বাক্সের মধ্যে রাখবেন না। কারণ সার্চ হলে যাতে পাওয়া না যায়। তাই কমন প্লেসেই তিনি অস্ত্রটা রেখেছিলেন। অতি সহজেই ফ্লাওয়ার ভাসের মধ্যে আমি তাকে আবিষ্কার করলাম। তাতে টোল খাওয়া এবং চটা ওটার দাগ ছিল।

বাসব একটু দম নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল, এবার শুনুন ঘটনাটা কি ভাবে ঘটেছিল। অবশ্য এর মধ্যে অনেকখানিই আমার অনুমান। প্রশান্ত রায় যখন রত্নাদেবীকে বিয়ে করেন তখন তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না। ছেলে হওয়ার পর তাঁর আর্থিক অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠল। স্বামী স্ত্রীতে মিলে আপ্রাণ ভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে। কিন্তু অভাবের জন্যে পদে পদে বাধা পড়তে লাগল। এই সময় কোন সূত্রে তন্দ্রাদেবীর সঙ্গে প্রশান্তবাবুর আলাপ হয়। তিনি রত্নাদেবীর সঙ্গে পরামর্শ করে আলাপের সূত্রটা গাঢ় করে ফেলেন এবং দুজনের বিয়েও হয়ে যায় শেষে। এইভাবে বিরাট অভাবের হাত থেকে তাঁরা পরিত্রান পান। কিন্তু খুব বেশিদিন ব্যাপারটা চাপা রইল না মিসেস রায়ের কাছে। মনের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল তাঁর এবং । যাইহোক দুর্ঘটনার রাত্রে তন্দ্রা রায় নিজের পরিকল্পনা মত করিডরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মোটর পোর্টিকোতে আসার আগেই তিনি সেখানে গিয়ে দাঁড়ান। এত রাত্রে ওখানে স্ত্রীকে দেখে প্রশান্তবাবু নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন – এই বিস্ময়ের মধ্যেই মিসেস রায় গুলি চালান। এবং পায়ের শব্দ পেয়ে অর্থাৎ ডাঃ গুপ্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছবার

আগেই থামের আড়ালে চলে যান। বাসব নিজের বক্তব্য শেষ করল। সকলে প্রশংসার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন।

সৈকত বলল, দুটো প্রশ্ন কিন্তু ভাই এখনও আমার মনকে নাড়া দিচ্ছে।

—কোন দুটো প্রশ্ন ?

অরবিন্দবাবু সেই রাত্রে বাগানে কি করছিলেন এবং কেন, আর ডাঃ গুপ্তর রুমাল প্রশান্ত রায়ের পকেটে গেল কি ভাবে ?

- অরবিন্দবাবু বাগানে গিয়েছিলেন নিজের বোনের উপর নজর রাখতে। তিনি জানতে পেরেছিলেন ওই সময় বাগানে সুচেতাদেবীর সঙ্গে রজতবাবুর কথা হবে। রজতবাবু সুচেতাদেবীর সম্পর্কে একটু ইন্টারেস্টেড। তিনি ভেবেছিলেন অরবিন্দ-বাবুই বোনের বিয়ে এখানে দিতে চান, তিনি জানতেন না সুচেতাদেবী সৈকতের বিশেষ পরিচিতা। অগত্যা রজতবাবুকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলতে হয় সুচেতাদেবীকে।

রজত ভৌমিক মাথা নত করলেন।

—ডাঃ গুপ্তর রুমাল কিভাবে প্রশান্ত রায়ের পকেটে গিয়েছিল বলতে পারব না। উনি নিজেই আমাদের বলতে পারেন।

ডাঃ গুপ্ত বললেন, সন্ধ্যাবেলায় প্রশান্ত আমার কাছ থেকে রুমালটা নেয় চশমার লেন্স পরিষ্কার করবার জন্যে। তারপর ভুল ক্রমে আর ফিরিয়ে দেয় না। দুর্ঘটনার পর আমিই প্রথমে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হই। আমার কেমন ভয় হয়। প্রশান্তর পকেটে আমার রুমাল দেখে পুলিস যদি আমাকে সন্দেহ করে ? আমি তাড়াতাড়ি রুমালটা ওর পকেট থেকে বার করে নিতে যাই, এমন সময় বাসব সেখানে গিয়ে পড়েন।

এই সময় ঢং ঢং করে নটা বাজল দেওয়াল ঘড়িতে। রণদাকান্ত নাগচৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। ডিনারের সময় হয়েছে। একে একে সকলেই উঠে পড়লেন।

কিন্তু....

ঘর থেকে কেউই বেরিয়ে যেতে পারলেন না। একটা করুণ দৃশ্য সকলকে অনড় করে দিল।

ফুলে ফুলে কাঁদছেন রত্নাদেবী।

ছিন্নমূল লতার মত তাঁর দেহ কোচের উপর পড়ে রয়েছে। তিনি কাঁদছেন. ফুলে ফুলে কেঁদে চলেছেন। তাঁকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা কারুর নেই। সকলে মমতাময় দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন শুধু।

নীলরক্তের ধারা

হিসার নগরের ওপর সন্ধ্যা জমাট বেঁধেছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। আজ ঠাণ্ডা যেন একটু বেশি অনুভব করা যায়। হিসারনগরে একেই প্রাণচাঞ্চল্য কম, তার ওপর এই ঠাণ্ডায় মৃত্যুর স্তব্ধতা ছেয়ে গেছে অঞ্চলটায়। কলকারখানা এখানে নেই, নেই কোন সাধারণ ব্যবসা। এমন কি দৈনিক প্রয়োজনে যে মুদির দোকান অপরিহার্য, তাও অনুপস্থিত।

তবু হিসারনগরে পঁচিশটি পরিবার বাস করে মাটির দেওয়াল আর খাপড়ায় ছাওয়া ঘরে। চতুর্দিকে পাহাড় আর পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে আছে কিছু উর্বর জমি। এই জমি চাষ করেই তাদের জীবন কাটে। নিত্য প্রয়োজনীয় কেনাকাটাটা তারা সেরে নেয় পরেশনাথে গিয়ে। হিসারনগর থেকে পরেশনাথের দূরত্ব মাইল দশেকের বেশি নয়।

এই প্রায় প্যাণ্ডববর্জিত জায়গার নাম এত গালভরা কেন, এ নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। বছর পঁচিশেক আগে জনশূন্য এই জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় হিসার বাবা নামে এক সাধু আড্ডা গেড়েছিলেন। কয়েকদিন সাধন-ভজন বেশ সোরগোল তুলেই চলল। তারপর ঘটল সেই দুর্ঘটনা। চেলাচামুণ্ডাদের মধ্যে থেকেই বাঘে নিয়ে গেল সাধুবাবাকে। অনেক মাংসল চেলাকে উপেক্ষা করে বাঘ চিমড়ে গরুটিকে কেন পছন্দ করেছিল, তা এখন অবান্তর কৌতূহল। বহু বছর পরে এখানে এসেও মণীন্দ্রনাথ পরেশনাথের এক মহাজনের মুখে শুনেছিলেন এই ঘটনা!

'বোল্ডার অ্যাণ্ড রুফ' এর অন্যতম কর্ণধার মণীন্দ্রনাথ কোম্পানীর পক্ষ থেকেই পরেশনাথে এসেছিলেন চার হাজার ওয়াগান শ্লেট সংগ্রহের উপায় দেখতে। হাজারিবাগ পর্যন্ত খোঁজ-খবর করবেন—এই রকম প্ল্যান নিয়েই কলকাতা থেকে বেরিয়েছিলেন। বেশি ঘোরাঘুরি করতে হল না। এই অঞ্চলটি পছন্দ হয়ে যাওয়ার পরই, মণীন্দ্রনাথ বিহার সরকারের কাছ থেকে পঞ্চান্ন বছরের জন্য ইজারা নিয়ে নিলেন।

তারপরের ইতিহাস কিন্তু অন্যরকম রূপ নিল। সাধুবাবার নামানুসারে জায়গাটির নামকরণ হিসারনগর করেই ক্ষান্ত হলেন না 'বোল্ডার অ্যাণ্ড রুফের' ডিরেক্টারত্রয়। শ্লেট-কাটা শেষ হয়ে যাবার পর ওখানে চমৎকার একটা বাংলো তৈরি করানো হয়েছে। কিছু আদিবাসীকে এখানে আনিয়ে চাষবাসের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। প্রতি বছর অবসর বিনোদনের জন্য শীতকালে এখানে আসছেন সকলে। কয়েকদিন হাল্কা মেজাজে এখানে বাস করতে ভালই লাগে।

আবার ফিরে আসা যাক সেই শীতার্ত সন্ধ্যায়।

'বোল্ডার ভিলা' আলোয় ঝলমল করছে আজ। ডায়নামোর সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা এ বছরই প্রথম হয়েছে। ডায়নামোর একটানা উৎকট জান্তব

শব্দ কানে বড় বেশি ঘা মারতে থাকে। আজ বোল্ডার ভিলায় গানের আসর বসেছে। ঘণ্টাদুয়েক আসরের আয়ু। তারপর ডিরেক্টার তিনজন ব্যবসাগত আলোচনায় বসবেন। প্রতি বছরই এই সময় এই রকম ভাবেই সন্ধ্যা কাটে।

ড্রইং রুমের কোচ সোফা সমস্ত সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কার্পেটের ওপর একপাশে চোখ বন্ধ করে গান শুনছেন মণীন্দ্রনাথ। মুখে সিগার গুঁজে ঘন ঘন পীতাভ ধোঁয়া ছেড়ে চলেছেন কিরণশঙ্কর, মন দিয়ে তিনি গান শুনছেন কিনা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। ত্রিলোকনাথের উসখুস ভাব দেখে বুঝতে পারা যায় তাঁর গানের প্রতি তেমন মনোযোগ নেই।

ওস্তাদ চন্দ্রশেখর খাঁ তখন রাগপ্রধান গানটিতে বেশ জমিয়ে এনেছেন। দুই বাজিয়ে চমৎকার ভাবে তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। গত তিন বছর ধরে একদিনের জন্য খাঁ সাহেবকে বেশ মোটা টাকা দিয়ে ধানবাদ থেকে আনানো হচ্ছে। কোম্পানীর তিন মালিকই গান ভালবাসেন। তবে ভাব দেখে মনে হয়, এবার শোনার মেজাজ প্রত্যেকের তেমন নেই। কেমন যেন তাল কেটে গেছে।

ও'রা তিনজনই যে হিসারনগরে এসেছেন, তা নয়। এসেছেন আরো কয়েকজন। সকলের মোটামুটি পরিচয়টা দিয়ে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মণীন্দ্রনাথ বিগতদার। ছেলে বিলেতে আছে, সুতরাং তিনি এসেছেন সেক্রেটারি ললিত ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে। কিরণশঙ্কর স্ত্রী রীণা ও শ্যালিকা নীনাকে নিয়ে এসেছেন। অবশ্য সঙ্গে সেক্রেটারি সোমপ্রকাশ আছে। ত্রিলোকনাথের বয়স চল্লিশ ছুঁলেও এখনো বিয়ে করেননি। তিনিও যথা নিয়মে নিজের সেক্রেটারি কুমার সেনকে সঙ্গে করে এসেছেন।

প্রত্যেকে নিজের নিজের একান্ত সচিবকে সঙ্গে আনার উদ্দেশ্য হল ব্যবসাগত কথাবার্তা হবে, কখন কি প্রয়োজন পড়ে বলা তো যায় না, তাই—। এবার আবার আলোচনা একটু গুরুগম্ভীর আকারে হবার কথা আছে।

ড্রইংরুম থেকে এবার উত্তরের ছোট বারান্দাটায় চলে আসা যায়। আলোটা জ্বালানো নেই। আবছা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে নীনা। চাঁদ বাগানকে যেন রুপোর আস্তরণে মুড়ে দিয়েছে। কনকনে হাওয়া হাড় পর্যন্ত স্পর্শ করে যায়, তবু নীনা একটু অন্যমনস্কভাবেই বাগানের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নীনা এই বছরই প্রথম এখানে এল। আগে কয়েকবার দিদি-জামাইবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করেছে। এবার আর করা গেল না। কয়েক মাস আগে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে যোগ না দেওয়ায় একরকম অলসভাবেই দিন কাটাচ্ছিল। কাজেই এবার এখানে না আসার অজুহাত টিঁকিয়ে রাখা গেল না।

সন্তর্পণ পায়ে একটি ছায়ামূর্তি তার পেছনে এসে দাঁড়াল। নীনার খেয়াল নেই। সে বাগানের দিকে তাকিয়ে নেই শুধু, মনের মধ্যে কোন একটা বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করছে বোধহয়।

নীনা—

চমকে মুখ ফেরাল নীনা।

ওমা, তুমি!

প্রায় পাঁচ মিনিট হল এসেছি। কি ভাবছিলে?

যদি বলি তোমার কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, ট্রাইপ্রাইটার ছেড়ে তুমি কি একবার আসবে –

অল্প শব্দ তুলে হাসল সোমপ্রকাশ।

ওই ট্রাইপ্রাইটারই আমাদের দুজনের মধ্যেকার ব্যবধানকে একই ভাবে চিরকাল রেখে দেবে দেখে নিও।

কেন?

কেন নয়? তোমার জামাইবাবুর সেক্রেটারির পক্ষে তাঁর ভায়রাভাই হতে চাওয়া, বামন হয়ে চাঁদ-ধরার মত নয় কি?

তোমাকে কেউ এদিকে আসতে দেখেনি তো?

না।

নীনা খুব কাছে সরে এল সোমপ্রকাশের।

তুমি মিথ্যে একটা মনগড়া আশঙ্কায় নিজেকে এত গুটিয়ে রাখ কেন বুঝি না। দিদি-জামাইবাবু আমার গার্জেন নন। তাছাড়া তাঁদের আপত্তি করার কোন কারণও থাকতে পারে না।

তোমার মা-বাবা?

তাঁরা হয়তো আপত্তি করতে পারেন। ছোট-জামাই বিলিতি ডিগ্রীধারী হোক, এ বাসনা থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তবে কি জান—আচ্ছা, আমার একটা কথার উত্তর দাও তো?

বল?

সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্বেও আমি এম এ. পড়লাম না কেন বল তো?

পড়লে না বোধহয় ··মানে···

জানি, বলতে পারবে না। তুমি গ্র্যাজুয়েট বলে আমি এম. এ. পাশ করতে চাইনি।

সেকি! কেন?

দ্রুত গলায় নীনা বলল, আরো বলতে হবে তোমায়! বেশি শিক্ষিতা স্ত্রী ঘরে থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীরা মনোবিকারের শিকার হয়ে পড়েন, তা কার অজানা?

নীনার কাঁধে একটা হাত রেখে মোলায়েম গলায় সোমপ্রকাশ বলল, তুমি আমায় কত ভালবাস জানি না ভেবেছ? জানি। সমস্ত রকম স্বার্থত্যাগ করতে পশ্চাৎপদ হবে না, তাও জানি। এরপরও কথা আছে, আমাদের খারাপ দিকটা আগে ভেবে দেখা উচিত। হয়তো এই চাকরি থাকবে না, আমরা তখন অথৈ জলে পড়ব। বিশেষে তুমি প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ···

আমার জন্যে ভেব না। অসুবিধে পড়ি বা না পড়ি, তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের দুজনের মোটামুটি ভাল চাকরি আমি প্রায় জোগাড় করে রেখেছি।

তুমি জোগাড় করেছ ?

হাসিতে মুখ ভাসিয়ে নীনা বলল, কি ভাব তুমি আমায় ? আমার এমন সমস্ত তালেবর বান্ধবীরা আছে, যারা তাদের শিল্পপতি বাবা বা দাদাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করিয়ে নিতে পারে। বুঝলে মশাই, হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে নেই।

এবার সোমপ্রকাশের হাসবার পালা।

এত করেও আমায় বিয়ে করতে হবে ?

হবেই তো। আমার হাতে না পড়লে তুমি যে মানুষ হবে না।

কথাবার্তা শুনে এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না, প্রেমের প্রাথমিক স্টেজ এরা অনেকদিন আগেই অতিক্রম করে এসেছে। এখন যত চিন্তা ভবিষ্যৎকে নিয়ে! সোমের আন্তরিকতায় যদিও কোন খুঁত নেই, তবুও বারবার সোমপ্রকাশ ভেবেছে দুজনের মধ্যেকার অসাম্যের কথা।

বছর দুয়েক আগে কিরণশঙ্করের বাড়িতেই দেখা হয় দুজনের। প্রথম দর্শনেই নীনার ভাল লেগে যায় ওকে। বড়লোকের খামখেয়ালী মেয়ে। বলতে গেলে তার চেষ্টাতেই দুজনের ঘনিষ্ঠতা দানা বাঁধতে থাকে। অবশ্য সমস্ত কিছুই ঘটতে থাকে সকলের অজান্তে। সোম অবশ্য জানেন, জানতে পারলেও কিরণশঙ্কর আপত্তি তুলবেন না। তিনি অত্যন্ত দিলখোলা মেজাজের লোক। কারুর আপত্তির কথা বাদ দিলেও, আসল অন্তরায় হল সাধ্য। নিজের সীমিত ক্ষমতায় নীনার মত মেয়েকে ও কি ভাবে সুখী করবে? নীনা ওর এই দ্বিধাকে অবশ্য গ্রাহ্যের মধ্যে আনছে না।

নীনার কথায় সোম সচকিত হল।

এই শুনছ।

বল ?

তোমার সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ আছে। শুধু পরামর্শ নয়, একটা বিষয়ে সাহায্য চাই।

বেশ তো, বল না।

একটু চুপ করে থেকে নীনা বলল, দিদি খুব বিপদে পড়েছে, যে কোন উপায়ে ওকে বাঁচাতে হবে।

সোমপ্রকাশ আশ্চর্য হয়ে বলল, তোমার দিদি বিপদে পড়েছেন। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমার মাথায় প্রথমে কি কিছু ঢুকছিল। তক্কে তক্কে থেকে বুঝতে পেরেছি সমস্ত কিছু। দিদি নিজের দোষেই জড়িয়ে পড়েছে এই ব্যাপারে। জামাইবাবু তো নয়ই, আমি ছাড়া আর কেউ জানে না এ সমস্ত।

তুমি তো শুধু ভূমিকাই করে যাচ্ছ। বলবে কি ব্যাপারটা ?

একটা লোক কিছুদিন থেকে দিদিকে অস্থির করে তুলেছে। তুমি তো জান,

দুস্থ মেয়েদের সুবিধার জন্য দিদি লোয়ার সার্কুলার রোডে একটা ছোটখাটো নার্সিং হোম প্রতিষ্ঠা করেছে। ওখানে একটা বাচ্চা জন্মাবার পর অসাবধানতায় মারা যায়। তারপরই ওই লোকটা ওখানে পেঁছে দিদিকে ভয় দেখাতে থাকে, তার কথা না শুনলে সে পুলিসকে গিয়ে জানাবে এই সেবাসদন বাচ্চা মারার একটা আখড়া হয়ে উঠেছে। এমন কি মরা বাচ্চার মা'ও লোকটাকে সমর্থন জানাতে থাকে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দিদিকে চুপ করে যেতে হয়েছে।

স্ট্রেঞ্জ। কি ফেবার তাঁর কাছ থেকে সে চেয়েছে ?

রহস্য তো এখানেই। সে কিছুই বলেনি এখনও পর্যন্ত। শুধু দিদির পিছু লেগে রয়েছে ?

সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে। আচ্ছা, তুমি এত কথা জানলে কিভাবে ? মিসেস চৌধুরী তোমায় বলেছেন ?

নিজে থেকে কেউ একথা বলতে চায় ? একদিন এলগিন রোডের মোড়ে দিদিকে লোকটার সঙ্গে দেখে ফেললাম। তারপর চেপে ধরতেই দিদি বলল সমস্ত কথা।

এখন আমায় কি করতে বল ?

লোকটাকে দিদির পেছন থেকে কোন রকমে সরাবার চেষ্টা করবে। এখন তোমাকে আরেকটা লোকের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে হবে।

বিস্মিত গলায় সোমপ্রকাশ বলল, আরেকটা লোক ?

এই লোকটা বোধহয় আদিবাসী। ট্রাউজার পরে। সকাল থেকে দেখছি, সে বাড়ির আশেপাশে ঘুর ঘুর করছে।

অমনি তোমার মনে হল

আমায় কথাটা শেষ করতে দাও। আদিবাসী লোকটার চোখ দিদির ঘরের ওপরই বেশি। কি করে সে জেনে ফেলেছে, দিদি দক্ষিণ দিকের কোণের ঘরটায় থাকে।

সোমপ্রকাশ হেসে বলল, তোমার চোখও কিছু কম নয় দেখা যাচ্ছে। পুলিসে ঢুকে পড়লে পারতে। আজকাল মেয়েদেরও তো ওই বিভাগে প্রবেশের অধিকার হয়েছে।

নীনা ঝাঁজিয়ে উঠল, পরিস্থিতিটা হেসে উড়িয়ে দেবার মত মোটেই নয়। যা বলছিলাম শোন —

কথা শেষ হবার আগেই একজনকে এই দিকে আসতে দেখা গেল। সোমপ্রকাশ ঝটিতে থামের আড়ালে চলে গেল। নীনা বুঝল আর এখানে অপেক্ষা করা সমীচীন নয়। সে নিজের ঘরের দিকে পা চালাল। আরো একটু কাছে এগিয়ে আসতে আড়াল থেকেই সোমপ্রকাশ দেখল, আগন্তুক মণীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি ললিত ঘোষ।

ওদিকে গানের আসর তখনও জমজমাট।

বেশ কিছুক্ষণ উসখুস করে এইমাত্র ত্রিলোকনাথ ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। গান তিনি অতিমাত্রায় ভালবাসেন। কলকাতায় বিভিন্ন জলসায় তিনি নিয়মিত

উপস্থিত থাকতে অভ্যস্ত। তবে আজ ভাল লাগছে না। নানা কারণে মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত।

নিজের ঘরে না গিয়ে পার্লারের দিকে এগোলেন ত্রিলোকনাথ। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ঘনঘন টান দিতে দিতে চলেছেন। নিজের পরিকল্পনা কিভাবে কার্যকারি করবেন, তাই এখন তাঁর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। পার্লারে পৌঁছবার পরই সেক্রেটারি কুমার সেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সেন, রিপোর্ট রেডি ?

একটু বাকি আছে স্যার।

কাজটা আপনাকে ফেলে রাখতে বলিনি। শেষ করুন গিয়ে।

কুমার সেন দ্রুত অদৃশ্য হলেন।

সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেতে নির্মমভাবে গুঁজে দিয়ে বেতের চেয়ারে বসতে যাবেন—গেটের কাছে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। চাঁদের আলো থাকায় গেটের কাছটা পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাচ্ছিল। এই লোকটাকেই বাংলোর আশেপাশে বারকয়েক ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন ত্রিলোকনাথ।

তিনি গলা চড়িয়ে বললেন, কে ওখানে ?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল ঃ স্যার, আমি জোসেফ হেমব্রাম।

এদিকে এস—

হেমব্রাম এসে সেলাম ঠুকল। তাকিয়ে থাকবার মত চেহারা ও সাজ তার। ধানসিদ্ধ করা হাঁড়ির উল্টোদিকের মত কুচকুচে গায়ের রঙ। দুটি চোখই অসম্ভব লাল। বৈশিষ্ট্যহীন মুখে কেমন নির্লিপ্ত ভাব। পরনের আঁটসাঁট লাল রঙের ট্রাউজার পায়ের পাতার এক বিঘত ওপরে এসেই থেমে গেছে। নানা আকারের তালি দেওয়া কোট গায়ে। টাইয়ের পরিবর্তে গলায় একটা রঙিন নেকড়ার ফালি ঝোলান হয়েছে।

মূর্তিটিকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করে ত্রিলোকনাথ অবাক।

কে তুমি ?

ওই যে বললাম স্যার, আমি জোসেফ হেমব্রাম।

ভাঙা ভাঙা বাঙলায় বিনীতভাবে সে বলল।

সকাল থেকে এখানে ঘুরঘুর করছ কেন ?

আপনাদের চাকর মংরু পাশি স্যার আমার বন্ধু। সকাল থেকে তাকেই খুঁজছি।

তুমি এখানেই থাক নাকি ?

হ্যাঁ স্যার, আপনাদের জমি চাষ করে আমার ভাগে। তারই ঘরে থাকি।

মংরু নিজের ঘরে আছে বোধহয়। গিয়ে দেখ—

নড করার ভঙ্গিতে একবার ঝুঁকে হেমব্রাম ওখান থেকে সরে এল।

তারপর গেল বাড়ির পিছন দিকে মংরুর সন্ধানে। ত্রিলোকনাথের চোখের আড়াল হবার পরই তার হাবভাবের পরিবর্তন দেখা গেল। বিনীতভাবের মুখোশ

ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এবার স্মার্ট হয়ে উঠল। তীক্ষ্ম দৃষ্টি এধার ওধার বুলিয়ে নিয়ে মংরুর ঘর পেছনে ফেলে সে এগিয়ে গেল।

কাচের জানলা ভেদ করে চৌকো আলো এসে পড়েছিল ঘাসের ওপর। হেমব্রাম বারকয়েক টোকা দিল কাচের ওপর। রীণা চৌধুরী উপন্যাসে মন বসাবার চেষ্টা করছিলেন; শব্দ অনুসরণ করে উনি জানলার সামনে দাঁড়ালেন। শার্সির মধ্যে দিয়ে আগন্তুককে দেখে নেবার পর পাল্লা খুললেন।

চাপা গলায় হেমব্রাম বলল, চিঠি আছে মেমসাব।

রীণা কিছু বললেন না, শুধু হাত বাড়িয়ে দিলেন। চিঠিটা নিয়ে জানলা বন্ধ করে দিয়ে আবার এসে বসলেন চেয়ারে। খাম ছিঁড়তেই এক চিলতে কাগজ বেরিয়ে পড়ল। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা চিঠিখানা তিনি পড়লেন। আবার পড়লেন। তারপর ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন চিঠিখানা।

রীণা চৌধুরীকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

নিশ্চেষ্ট ভাবেই বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর দেওয়ালে টাঙানো বড় আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। অনেক সময় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখে নেওয়ার মধ্যে একটা সান্ত্বনা থাকে। রীণা চৌধুরীর বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশের কম হবে না। তবে দেখলে পঁচিশের বেশি মনে হয় না। সুঠাম দেহ ও ধারাল সুশ্রী তাঁকে মনোলোভা করে রেখেছে।

আয়নার কাছ থেকে সরে এসে উনি রিস্টওয়াচের দিকে চোখ ফেরালেন। ন'টা কুড়ি। ডায়নামোর একটানা শব্দই জায়গাটাকে জাগিয়ে রেখেছে, নয়তো মনে হত অর্ধেক রাত্রি অতিক্রম করেছে বুঝি। কি ভেবে উনি আলমারি খুললেন। ব্লাউজের মধ্যে থেকে চিঠিটা বার করে শাড়ির থাকের তলায় রাখলেন। আলমারি বন্ধ করে আবার এসে বসলেন চেয়ারে।

ড্রইংরুমে তখন গান শেষ হয়ে গেছে। চন্দ্রশেখর খাঁ একাই আড়াই ঘণ্টা ধরে আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। এখন দুই সঙ্গীকে নিয়ে পাশের ঘরে বিশ্রাম নিতে গেছেন। আজ রাতটা তাঁদের এখানেই কাটাতে হবে। সকালে গাড়ি করে এঁরাই পৌঁছে দেবেন পরেশনাথ। ওখান থেকে গন্তব্যস্থলের জন্য ট্রেন ধরতে হবে।

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় সকলে ডিনারে বসলেন।

এক সময় মণীন্দ্রনাথ বললেন, খেয়ে উঠেই আমরা আলোচনায় বসব, কি বলেন?

কিরণশঙ্কর বললেন, আমার তো তাই ইচ্ছে—

এত তাড়াহুড়ো করবার কি আছে? ত্রিলোকনাথ বললেন, আমরা তো কালও আলোচনায় বসতে পারি।

আপনি বুঝতে পারছেন না মিস্টার মিত্র, কাল বলে ফেলে রাখবার ব্যাপার এটা নয়। এখানে আসার পোগ্রাম ফিক্সড না হয়ে গেলে কলকাতাতেই আলোচনা করে নেওয়া যেত। বিশেষে অডিট হবার আগেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার।

কিরণশঙ্করের কথা শুনে ত্রিলোকনাথ বললেন, হিসাবের মারপ্যাঁচে বেশ মোটা টাকা ক্যাশ বেরিয়ে গেছে—এ সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিত?

আপনার সামনেই তো একাউন্টেন্ট সেকথা বলেছে। কাগজপত্র খুঁটিয়ে

দেখলেই বুঝতে পারা যাবে কাজটা কার। কোন অসৎ কর্মচারিকে প্রতিষ্ঠানে রাখা তো ঠিক নয়—

তাছাড়া,—মণীন্দ্রনাথ বললেন, আমাদের কোটেশন ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। কি ভয়ংকর কথা ভেবে দেখুন। শুধু এই কারণেই রাউরকেল্লার এত বড় কাজটা নিতে পারলাম না। এইভাবে চলতে থাকলে তো কোম্পানি লাটে উঠে যাবে!

বেশ, আমার আপত্তি নেই। বারোটার পর তাহলে বসা যাবে। তার আগে.... মানে ·

ত্রিলোকনাথ থেমে গেলেন।

সকলেই জানেন ডিনারের পর প্রত্যহ লাল জল নিয়ে কিছুক্ষণ ব্যস্ত না থাকলে ত্রিলোকনাথের মন মেজাজ ভাল থাকে না। কেউ আর ও প্রসঙ্গের জের টানলেন না। মণীন্দ্রনাথ অন্য কথা পাড়লেন।

মিসেস চৌধুরী, আপনি তো গান শুনতে এলেন না?

মুখ নিচু করে রীণা খেয়ে যাচ্ছিলেন। মুখ না তুলেই বললেন, ডায়নামোর আওয়াজের মধ্যে আপনারা যে কিভাবে গান শুনছিলেন ভেবে পাই না।

স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কিরণশংকর বললেন, আসল কথা কি জানেন মিস্টার রায়, ও একেবারেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পছন্দ করে না।

হাল্কা কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই ডিনার শেষ হল। মিনিট পনের পরে ডায়নামোও বন্ধ হল! রাতভোর অনর্থক যন্টা চালু রাখবার কোন মানে হয় না। মংরু কেরোসিন তেলের ল্যাম্প প্রত্যেক ঘরেই দিয়ে এল। মণীন্দ্রনাথ ও কিরণশংকর একজোড়া তাস নিয়ে ড্রইংরুমে গিয়ে বসলেন। এখন কিছুক্ষণ সময় তাঁদের কাটাতে হবে ত্রিলোকনাথের অপেক্ষায়। অবশ্য সেক্রেটারি তিনজনকেই সতর্ক করে রাখা হয়েছে, প্রয়োজন হলেই তারা যেন উঠে আসে।

রীণা নিজের ঘরেই চলে গিয়েছিলেন। তিনি জানেন কাজপাগল স্বামী আলাপ-আলোচনা শেষ না করে, অর্থাৎ রাত তিনটের আগে কখনোই ঘরে আসবেন না। কাজেই তিনি এখন নিশ্চিন্তে নিজের কাজে এগোতে পারেন।

লংকোটটা পরে নিয়ে বোতামগুলো সমস্ত এঁটে দিলেন। ছোট শালটা মাথায় ঘোমটার আকারে দিয়ে নিলেন গলায়। ঘরের দরজায় ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর মেথর ঢোকার দরজা দিয়ে বাগানে চলে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ঠাণ্ডা শরীরকে ঝনঝনিয়ে দিল। গায়ে এতগুলো গরম কাপড় আছে, তাতেও কাজ হচ্ছে না।

রীণা দু-হাত পকেটের মধ্যে দিয়ে মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাণ্ডাটা শরীরে সইয়ে নিতে চাইলেন মনে হয়। সামনের গেটের দিকে তিনি গেলেন না। পেছন দিকে ছোট একটা গেট আছে। সেটা দিয়েই রীণা কম্পাউণ্ড পেরিয়ে বাইরে এলেন। গোটা কয়েক ঝাঁকড়া গাছ জায়গাটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। সাহস সংগ্রহ করেই ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন রীণা—এখন দারুণ ভয় করতে আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ এক ঝলক আলো ঝলসে উঠল।

টর্চ হাতে এগিয়ে এল হেমব্রাম।

ভয় পাবেন না মেমসাব—আমি। আসুন, সাহেব ওধারে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য।

বুকের মধ্যে ভয়ের ভারি রোলার চলতে থাকলেও রীণা কিছু বললেন না। নীরবে অনুসরণ করলেন হেমব্রামকে। বেশি দূর যেতে হল না, গাছগুলোর ছায়া যেখানে কেটে গেছে—ফেল্টের হ্যাট আর গ্রেটকোট শোভিত একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লোকটি বলল, জোসেফ, এবার তুমি যেতে পার।

আপনি….

আমি আজ রাত্রে নাও ফিরতে পারি।

আর কিছু না বলে হেমব্রাম গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রীণা বললেন, আমি কি অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছি, তা তুমি বুঝতে পারছ না—

সে হাল্কা সুরে বলল, চিঠি লিখে তোমাকে এখানে ডাকান অন্যায় হয়েছে, এই বলতে চাইছ তো? কি করব, উপায় ছিল না যে।

কলকাতা থেকে কবে এসেছ?

আজই সকালে।

আমার কিন্তু খুব ভয় করছে। বাঘ-টাঘ আসবে না তো?

লোকটি পকেট থেকে রিভলবার বার করল।

আত্মরক্ষার পক্ষে এটা মন্দ নয়, কি বল? তোমার শুধু ভয় করছে না, শীতও করছে। কাছেই একটা ঝোপড়ি আছে, আগুনও পাওয়া যাবে। এস—

আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকব না।

বেশ তো।

দুজনে চলতে আরম্ভ করল।

কয়েক পা এগিয়ে রীণা বললেন, আমি নার্সিংহোম বন্ধ করে দিচ্ছি।

হঠাৎ?

নার্সিংহোম বন্ধ না হলে আমি কোন মতেই তোমাকে এড়িয়ে যেতে পারব না। অন্যায়ের চূড়ান্তে পেঁছিছি, তা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না। এখনও…

একদিনে তুমি অনেক কথাই ভেবেছ দেখছি। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে একথা আমরা প্রথম থেকেই জানতাম। যাক, এসে পড়া গেছে। এস, ঘরে বসেই কথা হবে।

দুজনে গোলপাতা আর বাঁকারি দিয়ে ছাওয়া ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

মণীন্দ্রনাথ এক মনে পেসেন্স খেলছেন। সিগারের ধোঁয়া ছাড়ায় ব্যস্ত আছেন কিরণশংকর। একপাশে বড় সাইজের সুটকেশ রাখা রয়েছে। ওতেই আছে অফিসের দরকারী সমস্ত কাগজপত্র। ডিরেক্টারত্রয় বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, একাধিকবার তাঁদের কোটেশন ফাঁস হয়ে যাওয়ায়। ভেতরের লোক ছাড়া কারুর পক্ষে একাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে করছে, তাকে এখনও চিনে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এই রকম পরিস্থিতিতেই একাউন্টেন্ট আরো গুরুতর কথা জানিয়েছেন।

বুলডোজার ইত্যাদি কয়েকটি যন্ত্র কেনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে মোটা টাকা আগাম দেওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল সাপ্লাই না করায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে ওই কোম্পানির কোন অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ প্ল্যান করে কেউ দেড় লক্ষ টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে এঁদের।

'বোল্ডার অ্যান্ড রুফে'র মত খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠান এইভাবে চিড় খেয়েছে। এই চিড়ই ক্রমে ক্রমে বিরাট ফাটলের আকার নেবে। তখন আর কোম্পানিকে টিকিয়ে রাখা যাবে না। ওই দুই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই এখন ডিরেক্টাররা আলোচনা করতে চলেছেন। বারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না। ত্রিলোকনাথ ড্রইংরুমে এলেন এগারটা পঁয়ত্রিশেই। লিকারের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের পরিচয়। কাজেই হাবেভাবে বুঝতে পারা যায় না যে তিনি নেশা করেছেন।

সুটকেশটা কাছে টেনে নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে বসলেন তিনজন।

ত্রিলোকনাথ কোন ভূমিকা না করেই বললেন, আমার সন্দেহ মিস্টার দে'কে। তিনি কোম্পানির ম্যানেজার। দুই ক্ষেত্রেই ফাউল প্লে করার সুবিধা তাঁর পক্ষেই সবচেয়ে বেশি নয় কি?

আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না মিস্টার চক্রবর্তী। কিরণশঙ্কর বললেন, কোটেশন ফাঁস করাটা ম্যানেজারের কাজ বলে, কিছুক্ষণের জন্যে মেনে নিতে পারি। কিন্তু ভুয়ো কোম্পানিকে টাকা অ্যাডভান্স করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

মণীন্দ্রনাথ বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। আমাদের অনুমতি ছাড়া তার পক্ষে ক্যাসিয়ারের কাছ থেকে এত টাকা ড্র করা সম্ভব নয়।

আপনি বলতে চাইছেন – দ্রুত গলায় ত্রিলোকনাথ বললেন, আমাদের তিনজনের মধ্যেই কেউ একাজ করেছে?

আমি জোর দিয়ে কিছু বলতে চাইছি না। তবে সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিলে তাই বোঝায় বটে।

কি বিশ্রী ব্যাপার। এইভাবে যৌথ ব্যবসা চলতে পারে না। আপনাদের কাছে একটা প্রস্তাব আছে। এই লিমিটেড কনসার্ণকে ভেঙে দেওয়া হোক।

মণীন্দ্রনাথ ও কিরণশঙ্কর দুজনেই অবাক।

প্রায় এক সঙ্গে বললেন, ভেঙে দিতে হবে?

হ্যাঁ। শঠতার বীজ যদি সত্যি আমাদের মধ্যে ঢুকে থাকে, তাহলে এ প্রতিষ্ঠান ভাঙতে আরম্ভ করেছে। এক কাজ করুন, আপনারা নিজেদের শেয়ার আমায় বিক্রি করে দিন। আমি একাই 'বোল্ডার অ্যান্ড রুফ'কে হাতে রাখতে চাই। তখন পার্টনার চিটেড হবার প্রশ্ন আর উঠবে না।

কিরণশঙ্কর বললেন, এ সমস্ত কি বলছেন! মনে হয় আজ আপনি নেশার মাত্রা ঠিক রাখতে পারেননি। শেয়ার বিক্রির প্রশ্নই উঠতে পারে না। ও সমস্ত কথা এখন থাক। তার চেয়ে যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনায় বসেছি, সে সম্পর্কে কথা আরম্ভ করাই ভাল।

কাগজপত্র সঙ্গেই রয়েছে। আমি প্রস্তাব করি, গত তিন মাসে সাসপেন্স একাউন্টে আমরা কে কত টাকা ড্র করেছি, তার হিসাবটা দেখলেই রহস্য বোধহয়

কিছুটা পরিষ্কার হবে।

কথাটা শেষ করেই মণীন্দ্রনাথ অন্য দুজনের মুখের দিকে তাকালেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে জানিয়ে রাখা ভাল, এক সঙ্গে তিনটির বেশি বড় কাজ 'বোল্ডার অ্যাণ্ড রুফ' হাতে নেয় না। তিন পরিচালক আলাদা আলাদা ভাবে এগুলি দেখাশুনা করেন। স্বাভাবিকভাবে কাজের প্রয়োজনে মাঝে মাঝেই সাসপেন্স ভাউচারে সাহায্যের টাকা ড্র করতে হয়। এই টাকার হিসাব ছ' মাস অন্তর দেওয়াই হল নিয়ম। এমনও বহুবার হয়েছে, কোন ওয়ার্ক সাইটে হয়তো প্রয়োজন পড়ল কোন বিশেষ যন্ত্রপাতির। যাঁর দায়িত্বে কাজ হচ্ছে, তিনি এই ভাবে টাকা তুলে প্রয়োজন মিটিয়েছেন এবং পরে হিসাব দিয়েছেন অফিসকে।

এবার ওই সুযোগের অপব্যবহার তিনজনের মধ্যে কেউ করেছেন কিনা এই হল বিবেচ্য। অর্থাৎ বুলডোজার কেনার প্রয়োজনে তোলা টাকাটা কে আত্মসাৎ করেছেন, তা এইভাবে জানা যাবে। হিসাবের খাতা এবং ভাউচারের শ্লিপ নিজেদের কাছে থাকায় নিয়ম মত একাউণ্টস এখন কিছু খতিয়ে দেখেনি। দেখবে, ছ' মাস অন্তর। তখন অবশ্য কার কারচুপি সহজেই বোঝা যাবে। তবে প্রকৃত রহস্য, সকলের চোখে ধরা দেবার আগেই ডিরেক্টররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা সভা বসিয়ে এক্ষেত্রে উপযুক্ত পথই বেছে নিয়েছেন বলা চলে।

কিরণশঙ্কর সুটকেশটি কাছে টেনে নিয়ে খুলতে খুলতে বললেন, তাহলে আমরা এই ইসুকেই প্রথম অ্যাজেণ্ডা হিসাবে ধরে নিলাম। এর নিষ্পত্তি হয়ে যাবার পর কোটেশন ফাঁস হয়ে যাবার বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

ঠিক এই সময় এমন এক ঘটনার অবতারণা হল, যার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। ঘটনার অবতারণা না বলে চরম নাটকীয় পরিস্থিতির সূচনা বলাটাই বোধহয় ঠিক। গাইয়ে চন্দ্রশেখর খাঁর দুই বাজিয়ে সঙ্গী ঘরে প্রবেশ করল। তাদের চাল-চলনে বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠেছে।

কাউকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে একজন বলল, সুটকেশটা খুলবেন না। কাগজপত্র সমেত ওটা আমাদের চাই।

তিনজনই স্তম্ভিত। লোকটা বলে কি!

ততক্ষণে আরেকজন এগিয়ে গিয়ে ঝটকা মেরে কিরণশঙ্করের হাত থেকে সুটকেশটা কেড়ে নিল। দুঃসাহসের এরকম আত্মপ্রকাশ চোখের ওপর ঘটতে তাঁরা আগে কেউই দেখেননি।

মণীন্দ্রনাথ রুখে উঠলেন : আপনাদের সাহস তো কম নয়! মংরু—মংরু—

কেউ আসবে না। সকলের মোটামুটি ব্যবস্থা করেই আমরা এখানে এসেছি। বাব্বু, দেখছিস কি ·

তার কথা শেষ হবার আগেই কিরণশঙ্কর ত্রিলোকনাথ ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করলেন—কিন্তু দুজনেই পিছিয়ে গেছে ততক্ষণে। একটা লোক পকেট থেকে বার করেছে রিভলবার।

তবলায় শুধু চাঁটি মারি না, গুলি চালাতেও জানি। গোলমাল না করে আপনারা তিনজন এবার আগে চলুন।

আমরা!

হ্যাঁ। আপনাদের কিছু শিক্ষা দেব ভাবছি।

ঘটনার আকস্মিকতায় তিনজনেই বেশ দিশেহারা হয়ে উঠেছিলেন। তবে উদ্যত রিভলবারের সামনে বেশি কিছু করতে গেলে যে গুলি সঙ্গে সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করবে, তা বুঝে নিতে তাঁদের কষ্ট হল না! সুবোধ বালকের মত তাঁরা দুজনের আগে আগে চললেন। দেখাই যাক না, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

বাগান পেরিয়ে গেটের বাইরে তিনজনকে নিয়ে এল ওরা। একটা ল্যান্ডরোভার সেখানে দাঁড়িয়েছিল। রিভলবার উঁচিয়েই ওঁদের তোলা হল গাড়িতে। একজন স্টার্ট দিল। চাঁদ হেলে পড়ায়, এখন আর তেমন চারধার স্বচ্ছ নেই- ছায়া ছায়া ভাব।

ল্যান্ডরোভার এগিয়ে চলেছে।

আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, জানতে পারি?

রিভলবার বাগিয়ে দ্বিতীয়জন বসেছিল ওঁদের মুখোমুখি। কিরণশঙ্করের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, মাইল ছয়েক দূরে গিয়ে আপনাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। এই ঠান্ডায় ফেরার সময় হাঁটার আনন্দ কি রকম বুঝতে পারবেন।

কিন্তু এতে আপনাদের লাভ কি?

লোকসানও নেই। আপনারা আমাদের অনেক জ্বালিয়েছেন। সে তুলনায় শাস্তি অনেক কম হচ্ছে।

ত্রিলোকনাথ বললেন, আপনাদের কোনো অপকার তো আমরা করিনি!

করেছেন। চুপ করে বসে থাকুন, কথা বলবেন না।

পাকা রাস্তা ছেড়ে ল্যান্ডরোভার এবার কাঁচা রাস্তায় নামল। দুপাশে ঘন গাছের সারি। এই প্রাকৃতিক এভিনিউয়ের মধ্যে আলোর চিহ্নমাত্র নেই। সামনের দিকে গাড়ির হেডলাইট অন্ধকারকে অবিরাম চিরে চলেছে। কৌতূহল আর আশঙ্কা নিয়ে 'বোল্ডার অ্যান্ড রুফ'এর তিন ডাইরেক্টর ঠাসাঠেসি করে বসে রইলেন।

'বোল্ডার ভিলা' থেকে যাত্রা করার পর মিনিট পনের বোধহয় অতিক্রম করেনি, ল্যান্ডরোভার থেমে গেল। হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল সামনেই গোটা কয়েক কুঁড়েঘর। তাতে লোক আছে কি নেই বুঝতে পারা গেল না। তিনজনকে ওখানে নামান হল। জানান হল, ওঁদের কিছুক্ষণ এখানে থাকতে হবে। তারপর প্রত্যেকের দু'হাত বাঁধা হল কাপড়ের শক্ত দড়ি দিয়ে।

পরিস্থিতি ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠছে। প্রকৃতপক্ষে এরা চায়টা কি? তবু কেউ কিছু বললেন না। বলেই বা কি হবে? হাত বাঁধা হয়ে যাবার পর আলাদাভাবে তিনজনকে তিনটে কুঁড়ে ঘরের দিকে নিয়ে যাওয়া হল।

আচমকা সোমপ্রকাশের ঘুম ভেঙে গেল।

তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় আলোটা নিভে গেছে। বুদ্ধি করে টর্চটা পাশেই রেখেছিল। বোতাম টিপে রিস্টওয়াচের ওপর বোলাল - বারটা পঁয়ত্রিশ। মনে মনে ভীষণ লজ্জিত হল সোমপ্রকাশ। ঘুমিয়ে পড়া ওর কখনই উচিত হয়নি। মিটিংয়ে বসেছিলেন ওঁরা। যে কোন মুহূর্তে মিঃ চৌধুরীর ওকে দরকার হতে পারত-- দরকার হয়েছিল কিনা তাই বা কে জানে! সেক্রেটারি পুঙ্গবকে নিদ্রিত

দেখে হয়তো তিনি আর ওঠাতে চাননি।

সোমপ্রকাশ ঘুমোতে চায়নি? বালিশ ঠেসান দিয়ে আড় হয়ে বসে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে নীনার কথা ভাবতে ভাবতে কর্তার ডাকের অপেক্ষায় ছিল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও জানে না। এবার একবার দেখা দরকার ওঁরা এখন ড্রইংরুমে আছেন কিনা।

সোমপ্রকাশ বিছানা থেকে নামল। টর্চ হাতে নিয়ে কয়েক পা সবে এগিয়েছে, মংরুর নাম ধরে জোরে কাকে ডাকতে শুনল। দরজা ধাক্কা দেওয়ার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। গলাটা যেন ললিতবাবুর। ওঁর আবার কি হল? সোমপ্রকাশ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। দরজাটা খোলাই ছিল, এখন বাইরে থেকে কে ছিটকিনি আটকে দিয়েছে।

এ কি ধরনের রসিকতা! দু-পাশের ঘর থেকে ললিত ঘোষ আর কুমার সেনের হাঁকাহাঁকিতে বুঝতে পারল ওর সঙ্গে কেউ রসিকতা করেনি। ওদের তিনজনের দরজাই বাইরে থেকে বন্ধ। বন্ধ করল কে? কর্তারা কি - না, তাঁরাই বা এ কাজ করবেন কেন?

সোমপ্রকাশ বারান্দার দিকের জানলাটা খুলল। মংরু গেল কোথায়? এত ডাকাডাকি কি তার কানে যাচ্ছে না? এই সময় ছোট একটা ল্যাম্প হাতে নীনাকে আসতে দেখা গেল। সে সোমপ্রকাশকে দেখতে পায়নি। ললিত ঘোষের দরজাটা গিয়ে খুলল।

আপনাকে বন্ধ করে রেখেছিল কে?

কাঁপা গলায় ললিত বলল কি করে বলব! একি পাশের ঘর দুটোর দরজাও যে বন্ধ।

এরপর সোমপ্রকাশ ও কুমার সেনকে উদ্ধার করা হল।

সোমপ্রকাশ বলল, এত চেঁচামেচিতে কর্তাদের ঘুম ভাঙল না কেন? মংরুই বা গেল কোথায়? কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়? খোঁজাখুঁজি করে দেখা গেল, মণীন্দ্রনাথ বা ত্রিলোকনাথ নিজের নিজের ঘরে নেই। বৈঠক শেষ করে তাঁরা বিছানায় আশ্রয় নেননি বুঝতে পারা যাচ্ছে। তবে চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় গাইয়ে খাঁ সাহেবকে পাওয়া গেল। মুখ দলা পাকানো রুমাল দিয়ে বন্ধ করা।

এই ঠাণ্ডাতেও এক গেলাস জল খেয়ে ধাতস্ত হয়ে তিনি যা বললেন, তার সারমর্ম হল: তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। এমন সময় তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে জোর করে বিছানা থেকে তুলে মুখে রুমাল ঠুসে দেয়। তারপর বেঁধে রেখে যায় চেয়ারের সঙ্গে।

ঘটনার শোচনীয় অগ্রগতি লক্ষ্য করে নীনা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সে প্রায় ছুটে গিয়ে দিদির ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল?

রীণা বেরিয়ে এলেন। এখনও তাঁর গায়ে লং কোট। ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় শালটা কাঁধের ওপর ফেলা!

কি হয়েছে?

জামাইবাবু আছেন ঘরে?

না তো। কেন, কি হয়েছে?

ওঁদের কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িতে অদ্ভুত সমস্ত ব্যাপার ঘটেছে।

বলিস কি !

নীনা যতটুকু যা জেনেছে, বলল দিদিকে।

সমস্ত শোনার পর রীণাকে বিশেষ বিচলিত হতে দেখা গেল। একবার মনে হল, গাড়ি নিয়ে তিনজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও যাননি তো ? তাই যদি যাবেন, তবে সেক্রেটারিদের ঘর বন্ধ করে রেখে যাবেন কেন ? তাছাড়া ওই বাজিয়ে দুজনের ভূমিকাই বা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

দুই বোন দ্রুত পা চালিয়ে ড্রইংরুমে এলেন। ততক্ষণে মংরুকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে। সে নিজের ঘরে বন্ধ ছিল। এখন কর্তব্য নির্ধারণের জন্য সকলে রীণার দিকে তাকাল।

রীণা বললেন, আপনারা কেউ দেখুন তো বাইরে গাড়িটা আছে কিনা—

কুমার বলল, গাড়ি আছে।

তাই তো ...সকলে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। আপনারাই বলুন কি করা যায় এখন ?

সোমপ্রকাশ বলল, গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। এখন পুলিসে খবর দেওয়াই ভাল।

ললিত ঘোষ বলল, এখানে তো কোন থানা নেই। খবর দিতে গেলে সেই পরেশনাথ যেতে হয়—

গাড়ি রয়েছে, কোন অসুবিধা হবে না।

রীণা বললেন, সোমপ্রকাশ ঠিকই বলছেন। ওঁরা নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছেন। আপনারা কেউ একজন গাড়ি নিয়ে চলে যান পরেশনাথ ; পুলিসকে ব্যাপারটা গিয়ে বলুন।

পরেশনাথ কিন্তু যাওয়া সম্ভব হল না। এখানে সকলে ট্রেনেই এসেছিলেন, এক ত্রিলোকনাথ বাদ। তিনি নিজের ডজ ড্রাইভ করে নিয়ে আসেন। গাড়িখানা পোর্টিকোতেই দাঁড় করান ছিল। স্থির হল কুমারই যাবে। কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারা গেল গাড়ির চাকা চারটের হাওয়া বার করে দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং এখানকার মত পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হল। সকাল হবার আগে ছাড়া পরেশনাথ যাবার জন্য কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। আরো আধ ঘণ্টাটাক এলো-মেলো আলোচনা ও দিশেহারা মন নিয়ে সকলে ড্রইংরুমে অপেক্ষা করল। তারপর রীণার কথায় আশ্রয় নিল যে যার ঘরে। ঘুম আসবে না আজ, এখন করণীয়ই বা কি আছে ?

ঘরে ফেরার পথে নীনা বলল, আমার বেশ ভয় করছে দিদি ?

আমার ভয় ও আশঙ্কা দুই হচ্ছে। পাঁচ-পাঁচটা লোক উধাও হয়ে গেল !

এমনও হতে পারে, বিশেষ কোন কারণে জামাইবাবুরা ইচ্ছে করে এরকম একটা সিনক্রিয়েট করেছেন—

আমার তা মনে হয় না। ওঁরা দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কাউকে বেঁধে রেখে কাউকে ঘরে বন্ধ করে উধাও হয়ে যাবেন—এ কখনও বিশ্বাস করা যায় ! গুরুতর একটা কারণ নিশ্চয় আছে, আমরা বুঝতে পারছি না।

নীনা এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল, আমি এখন একলা থাকতে পারব

না। চারধার কেমন ছমছম করছে দেখছ?

বেশ তো, তুই আমার ঘরে এসে না হয় থাক। দুজনে একসঙ্গে থাকলে ভয় করবে না।

দুজনে রীণার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে সোমপ্রকাশ সিগারেট ধরিয়েছে।

আকাশ পাতাল চিন্তা কুরে কুরে খেয়ে চলেছে ওকে। বর্তমান পরিস্থিতিকে একমাত্র লোমহর্ষক গোয়েন্দা কাহিনীর সঙ্গেই তুলনা করা চলে। স্বাভাবিক মেজাজেই তিনজন আলোচনায় বসবার জন্য তৈরি হয়েছিলেন। তারপর—তারপর কি এমন ঘটল? তাছাড়া ওই বাজিয়ে দুজনের কার্যকলাপও নিদারুণ সন্দেহজনক প্রমাণিত হচ্ছে কেন?

ঘর অন্ধকার। ল্যাম্পে তেল থাকলে বাতিটা জ্বালত। টর্চ জেবলে রিস্ট-ওয়াচটা দেখে নিল, একটা বেজে পনের মিনিট। মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছে। ঘুমিয়ে পড়ার কথা ভাবা যায় না। সোমপ্রকাশ স্থির করল, ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলে চেপে চলে যাবে পরেশনাথ। কিসকু মাঝির একটা ভাঙাচোরা সাইকেল আছে ওটা চেয়ে অগত্যা কাজে লাগাতে হবে।

এই জটিল পরিস্থিতির পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিসকে এখানে আনা দরকার। সোমপ্রকাশ কিভাবে জানবে আর মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে জটিলতা অসম্ভব বেড়ে যাবে। বিভ্রান্তির শেষ সীমায় পেঁছিতে হবে সকলকে। স্থানীয় পুলিসকে স্বীকার করে নিতে হবে, এরকম ঘনীভূত রহস্যের মুখোমুখি তাদের কখনও দাঁড়াতে হয়নি।

সিগারেটের ছোট হয়ে যাওয়া টুকরোটা সোমপ্রকাশ দূরে ফেলে দিল। অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা কথা উদয় হল ওর মনে। গভীর রাত্রে মিসেস চৌধুরীর সাজপোশাক অত টিপটপ থাকা উচিত ছিল না। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি বিছানা থেকে উঠে আসেননি - যেন কোথাও থেকে বেড়িয়ে ফিরলেন।

অবশ্য ওর ধারণা ঠিক নাও হতে পারে। হয়তো ঠাণ্ডা বরদাস্ত করতে না পেরে লংকোট আর শাল সমেতই শুয়েছিলেন। তাছাড়া স্বভাবটাও ওঁর কেমন কেমন। আড়াই বছর থেকে দেখছে, তবু মহিলাটিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। সেদিক থেকে নীনা অনেক সহজ।

ঠিক এই সময় সোমপ্রকাশের চিন্তাস্রোত প্রচণ্ডভাবে বাধা পেল।

রাতের নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে দিয়ে গুলি ছুঁড়ল কে। পরমুহূর্তে আর্ত-চিৎকার। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে দরজা লক্ষ্য করে ছুটল সোমপ্রকাশ। ইতিমধ্যে আরো দুবার গুলির আওয়াজ এবং মেয়েলি গলার আর্তনাদ পাওয়া গেল।

দুর্ঘটনার কেন্দ্র যে রীণা চৌধুরীর ঘর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সোমপ্রকাশ যখন ওখানে গিয়ে পেঁছিল, তখন বাড়ির আর সকলেই চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে সেখানে উপস্থিত। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ধাক্কাধাক্কি চলেছে কিন্তু কারুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

মিসেস চৌধুরী, দরজা খুলুন।

কোন সাড়া নেই।

দ্রুত গলায় সোমপ্রকাশ বলল, মংরু, ছুটে গিয়ে মিস্ত্রীকে বল ডায়নামোটা চালিয়ে দিতে।

আরো কয়েক মিনিট ধরে দরজা ধাক্কাধাক্কি ও ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। দুই বোনের মধ্যে একজনও এসে দরজা খুলে দিতে পারছেন না কেন? কুমার, ললিত ঘোষ ও সোমপ্রকাশ দ্রুত নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করে নিল, বর্তমান ক্ষেত্রে দরজা ভেঙে ফেলাই একমাত্র পন্থা।

ভারি সেগুন কাঠের দরজা ভাঙতেও বেশ সময় লাগল। ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার। সোমপ্রকাশের কাছে টর্চ ছিল। বোতাম টিপতেই এক ঝলক আলো গিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর। আলো সরতে সরতে এসে থামল খাটে।

যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে তিনজনই শিউরে উঠল। শরীরকে দুমড়ে পাশ ফিরে পড়ে আছেন রীণা চৌধুরী। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিছানা। কিন্তু নীনা কই? সোমপ্রকাশের বুকের মধ্যে দ্রুত স্পন্দন চলেছে। কোথায় গেল সে? ডায়নামো চালু হল এই সময়। সুইচ অন করাই ছিল। ঘরের আলো জ্বলে উঠল।

ললিত ঘোষ সবচেয়ে আগে খাটের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। রক্তাক্ত রীণা চৌধুরীকে ভাল ভাবে দেখে নিয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমার মনে হচ্ছে, উনি মারা গেছেন।

মারা গেছেন! কুমার প্রায় কেঁদে ফেলল, কি হবে?

মংরু ফিরে এসেছিল। সে ব্যাপার-স্যাপার দেখে কান্নার সুরে বিলাপ আরম্ভ করে দিল। ললিত ঘোষ তাকে ধমকে উঠল।

কি হচ্ছে কি। কেঁদে আর ঝামেলা বাড়িও না।

সোমপ্রকাশের কানে কারুর কথা ঢুকছিল না। ও ভাবছিল নীনার কথা। বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে কোথায় উধাও হয়ে গেল সে? অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কি-সমস্ত ঘটে চলেছে এ-বাড়িতে। ওর এখন কি করা উচিত, তা স্থির করতে পারছে না।

কুমার প্রায় ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, সোমবাবু, বেশ গোলমালের মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়লাম। এখন কি করা যায় বলুন তো?

এখন! মানে···আমাদের আরেকজনকে খুঁজে বার করতে হবে। এই ঘরে মিসেস চৌধুরীর বোনও ছিলেন।

উনি এই ঘরে ছিলেন, আপনি কিভাবে জানলেন?

আমি দুজনকে একসঙ্গে এঘরে ঢুকতে দেখেছি।

বাথরুম ইত্যাদি খুঁজে দেখা হল। মংরুই প্রথমে দেখতে পেল নীনাকে। খাটের তলায় পড়ে রয়েছে। চাদর ঝুলে থাকার দরুণ এতক্ষণ তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি। তার দেহ কোন রকমে টেনে বার করে আনা হল। বাঁ হাতের কনুইয়ের একটু উপর থেকে এখনও চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে। তবে আশার কথা, তার শরীরে জীবনের স্পন্দন রয়েছে।

সোমপ্রকাশ যে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। অসহায় চোখে দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল।

পরিস্থিতি ধাপে ধাপে চরমে উঠলেও, ললিত ঘোষ নিজের মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলেন। বললেন, এখন আমাদের দরকার একজন ডাক্তারের। ওই সঙ্গে পুলিসকেও খবর দিতে হবে।

তার মানে সেই পরেশনাথ·

এই পরিস্থিতিতে এখুনি না গিয়ে উপায় নেই। মংরু কিসকুর সাইকেলটা নিয়ে আসুক। আপনি চলে যান।

সোমপ্রকাশ প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল, আমায় বাদ দিন। বাড়িতে যা ওষুধপত্র আছে তাই দিয়ে রক্ত বন্ধ করে আমি বরং এঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনি। কুমারবাবু, আপনি যান না।

কুমার প্রায় ককিয়ে উঠল, আমাকে আবার কেন? আমি ভীতু মানুষ, এই অন্ধকারে যেতে গিয়ে মাঝপথেই অজ্ঞান হয়ে যাব।

আমি যাচ্ছি না হয়। আপনারা এদিকটা সামলান।

কথা ক'টা বলেই ঘর থেকে ললিত ঘোষ বেরিয়ে গেল।

'বোল্ডার ভিলা'য় পুলিস ও ডাক্তার এনে পেঁছিল বেলা সাড়ে আটটার সময়। কিসকু মাঝির সাইকেলের মত ঝরঝরে সাইকেলে ললিত ঘোষ আগে কখনও চড়েনি। বার পাঁচেক আছাড় খেয়ে সে যখন পরেশনাথ পেঁছয়, তখন বেলা সাতটা। তারপর কোতয়ালিতে গিয়ে সব কিছু বলার পর, অফিসার-ইনচার্জ সরকারী ডাক্তার ও নিজের দলবল নিজে ছুটে এসেছেন।

অবশ্য তার ঘণ্টা দুয়েক আগেই ডিরেক্টার-ত্রয় ফিরেছেন বাড়ি। তাঁদের মাইল আটেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে আসা হয়েছিল। হিংস্র জন্তুর ভয়ে আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে তারা এতটা পথ হেঁটে এসেছেন কোন রকমে। শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দুঃসংবাদ শোনান হয়েছে। রীণার মৃতদেহ দেখে তিনজনেই হতভম্ব। ঘোর কাটার পর, কিরণশঙ্কর কি যে করবেন ভেবে পান না। স্ত্রীর মর্মন্তুদ মৃত্যুতে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন।

ডেটল দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে নীনার হাত ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে সোমপ্রকাশ। রক্ত অবশ্য বন্ধ হয়নি, লাল হয়ে উঠেছে। অবশ্য ক্ষতস্থান দেখেও বুঝতে পারা যায়নি, গুলি শরীরের ভেতরে আছে না বেরিয়ে গেছে। ঘণ্টা খানেক পরে নীনার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। প্রচুর রক্ত-ক্ষরণে সে অসম্ভব দুর্বল। চোখ প্রায় খুলতে পারেনি। ব্রাণ্ডি খাইয়ে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

ও সি শ্রীনিবাস আম্বাণ্ট খুঁটিয়ে মৃতদেহ দেখলেন। দুটো গুলির মধ্যে একটা চোয়ালে আর একটা গলার নিচে লেগেছে। সারা দেহে এখন রাইগার মর্টিসের স্থূল পরিস্ফুটন। পোস্টমর্টেমের আগে মৃতদেহ সম্পর্কে চিকিৎসকের অভিমত এখন আর প্রয়োজন ছিল না।

ডাক্তার হোরা নীনাকে পরীক্ষা করলেন। কনুইয়ের ওপরকার মাংসের ওপর দিয়ে গুলি পিছলে চলে গেছে। আঘাত তেমন গুরুতর নয়, রক্তপাতই নীনাকে নির্জীব করে রেখেছে। তাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য বলকারক ওষুধ খাওয়ালেন

তিনি।

আম্বাণ্টের ঘর পরীক্ষাও তখন শেষ হয়েছিল। কাজে লাগে এমন কিছু তিনি পাননি। শুধু একটা বিষয়ে খটকা লেগেছে। খাটের ডান পাশের জানলাটা খোলা। এই শীতে কারুর তো জানলা খুলে শোবার কথা নয়! হত্যাকারীর সুবিধার জন্যই কি জানলা খুলে রাখা হয়েছিল? তাই বা কিভাবে সম্ভব!

ললিত ঘোষের কাছ থেকে সব কথাই শুনেছিলেন আম্বাণ্ট। এবার তিন ডিরেক্টারকে নিয়ে পড়লেন। তাঁদের কাছ থেকে জানা গেল, কি অবস্থার মধ্যে তাঁদের বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ বন্দী করে রাখা হয়েছিল তিনটে কুঁড়েঘরের মধ্যে। তারপর বেশ কয়েক মাইল দূরের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়েছিল। তিনজনের মধ্যে কেউই বুঝতে পারছেন না, কোম্পানির জরুরি কাগজগুলিই যদি তাদের দরকার থেকে থাকে, তাহলে তারা স্বচ্ছন্দে রিভলবার দেখিয়ে তা নিয়ে যেতে পারত—এত কাণ্ড করতে গেল কেন?

হত্যার সঙ্গে কাগজপত্র চুরি ও ডিরেক্টারদের হ্যারাস করার ব্যাপারটা জড়িত কিনা আম্বাণ্ট চিন্তা করে দেখতে লাগলেন। যোগসূত্র খুঁজে না পেলেও তাঁর মনে হতে লাগল যোগাযোগ থাকাটা বিচিত্র নয়। যাই হোক, যোগাযোগ থাক বা না থাক, এই লোক দুটিকে হাতে পাওয়া দরকার।

ওস্তাদ চন্দ্রশেখর খাঁকে ডাকা হল। ভয়ে তিনি আধমরা হয়ে রয়েছেন। পুলিসকে দেখে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। সুকুমার কলা নিয়ে কারবার করেন, পুলিসী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে ভয় পাবার কথা।

আম্বাণ্ট বললেন, ভয় পাবার কিছু নেই। আমার প্রশ্নগুলি ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দিন।

ভেঙে পড়া গলায় খাঁসাহেব বললেন, আমি কিছুই জানি না। আমাকে দয়া করে আপনারা ছেড়ে দিন।

আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আমার প্রশ্নের উত্তর আগে ঠিক ঠিক ভাবে দিন। ওই বাজিয়ে দুজন কি ধানবাদেরই লোক? ওদের ঠিকানা কি?

ওদের আমি চিনি না।

সেকি! ওরা আপনার সঙ্গত করে, অথচ ওদের চেনেন না?

আমার সঙ্গে সঙ্গত করে কান্তাপ্রসাদ ও বাচ্চান মিঞা। তারা ধানবাদে আমাদের পাড়াতেই থাকে।

তাহলে আপনি নিজের পুরনো সাকরেদ দুজনকে না এনে, এই অপরিচিত দুজনকে সঙ্গে করে এখানে এসেছিলেন কেন?

এবার খাঁসাহেব ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথাই বললেন। তার সারমর্ম হল কান্তা ওঁকে এসে জানিয়েছিল, ও আর বাচ্চান বিশেষ কাজে কলকাতা যাচ্ছে, তাই হিসারনগর যাওয়া সম্ভব হবে না। তবে খাঁসাহেবের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তাই দুজন ভাল বাজিয়েকে সঙ্গে দিয়ে দেবে। এরপর ওদের সঙ্গে কান্তা তাঁর আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। কণ্ট্রাক্ট ফেল হয়ে যাবার ভয়েই দুজন উটকো লোককে নিয়ে তিনি এখানে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ওদের নাম কি ?

নাম ঠিক মনে নেই। তবে ওরা বাঙালী।

খাঁসাহেবকে ছেড়ে ইন্সপেক্টর আম্বাণ্ট এবার নীনার ঘরে গেলেন। সে এখন অনেকটা সুস্থ। তবে গায়ে হাতে পায়ে বেশ ব্যথা হয়েছে। দিদি নেই, একথা শোনার পর থেকে মনের মধ্যে যে কি হচ্ছে, তা একমাত্র সেই জানে।

আম্বাণ্টকে দেখে উঠে বসতে যাচ্ছিল, উনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না, শুয়েই থাকুন। আমি গোটা কয়েক কথা জেনে নিয়েই চলে যাচ্ছি।

বলুন ?

আপনার মনের বা শরীরের অবস্থা ভাল নেই জানি। কিন্তু কি করব, কর্তব্যের খাতিরে বিরক্ত করতে হচ্ছে। আচ্ছা বলুন তো, ব্যাপারটা কি হয়েছিল ?

চোখ বন্ধ করে নীনা একবার ফেলে আসা ঘটনাগুলিকে দেখে নিল বোধহয়। তারপর বলল, জামাইবাবুর উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা তো আপনি জানেন। কোন রকম কূল-কিনারা করতে না পেরে আমি ও দিদি মনে নানা রকম আশঙ্কা নিয়ে ঘরে ফিরে গেলাম।

আপনারা দুজন একই ঘরে শুতেন ?

না। আমার কেমন ভয় করছিল। দিদিই আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর ?

ঘুম আসবার কথা নয়। নানা রকম দুঃশ্চিন্তায় আমরা বিছানায় এপাশ ওপাশ করছিলাম। এমন সময় খাটের ডান পাশের জানলাটা খুলে গেল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগতেই আমি উঠতে যাচ্ছিলাম প্রচণ্ড শব্দের পর হাতে তীব্র ব্যথা অনুভব করলাম ঠিক তখুনি। টাল সামলাতে না পেরে খাট থেকে পড়ে গেলাম। তারপর বাঁচার তাগিদেই বোধহয় গড়িয়ে গিয়েছিলাম খাটের তলায়।

আপনার দিদি তারপর ··

আর আমি কিছুই জানি না। খাটের তলায় গড়িয়ে যাবার পর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

আরো দু-চার কথার পর আম্বাণ্ট নীনার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি নিজের দীর্ঘ কর্মজীবনের এমন জটিল কেস আর হাতে পাননি। ইতিমধ্যে অবশ্য ফটোগ্রাফার ঘর এবং মৃতদেহের কয়েকটি ছবি তুলে নিয়েছে। ঘরখানাকে অবশ্য পরে ডাস্ট করাতে হবে।

এবার বাড়ির অন্যান্যদের এজাহার নিলেন ইন্সপেক্টর। কিন্তু কারুর কথা থেকে আশাপ্রদ কিছু জানতে পারলেন না। অবশ্য একটা সূত্র তাঁর হাতে আগেই এসেছে। কান্তাপ্রসাদ ও বাচ্চান মিঞাকে নেড়ে দেখলে নিশ্চিতভাবে আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে। মৃতদেহ মর্গের উদ্দেশ্যে রওনা করে দেওয়া হল। ইন্সপেক্টর আম্বাণ্ট খাঁসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে বিদায় নেবার পূর্বে জানিয়ে গেলেন, পুলিসের অনুমতি ছাড়া কেউ যেন কলকাতা বা অন্য কোথাও যাবার চেষ্টা না করেন।

দিন দুয়েক কেটে গেছে। নীনা এখন বেশ কিছুটা সুস্থ। তাকে ভাল

ভাবে চিকিৎসা করাবার জন্য ধানবাদ থেকে একজন ভাল ডাক্তারকে এখানে এনে রাখা হয়েছিল। তিনি আজ সকালেই ফিরে গেলেন। পুলিস অন্তত পাঁচবার আরো এসেছে এ বাড়িতে। নানান প্রশ্ন করে করে সকলকে অস্থির করে তুলেছে। রহস্য অবশ্য যেখানে জমাট বেঁধে ছিল ঠিক সেখানেই আছে।

ইন্সপেক্টর আম্বাণ্ট অবশ্য স্বয়ং ধানবাদে গিয়ে কান্তাপ্রসাদ ও বাচ্চান মিঞার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। তারা বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। জেরার মুখে যা বলেছে তা হল, তাদের কোন খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। হঠাৎ বাড়তি লাভের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় তারা হিসারনগর যায়নি। ওখানে যাবার দু-দিন আগে দুজন লোক তাদের সঙ্গে দেখা করে বলে, খাঁসাহেবের মত বিখ্যাত গাইয়ের সঙ্গে ওদের বাজাবার অনেক দিনের ইচ্ছে, সুযোগ করে দিলে ওরা খুশি হবে। তাছাড়া হিসারনগরের বাবুদের সঙ্গেও ওদের চেনা-জানা আছে ইত্যাদি। তারপর বিনিময়ে ওরা দুজনকে পাঁচশো টাকা করে দিতে চাইল। কান্তাপ্রসাদ ও বাচ্চান মিঞা টাকার লোভ সামলাতে না পেরে ওদের ওখানে পাঠিয়েছিল।

তোমরা কি ভাবে বুঝেছিলে, ওরা সত্যিকারের বাজিয়ে?

কান্তা বলল, আমরা ওদের পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। দুজনেরই চমৎকার হাত।

ওদের সম্পর্কে আর কিছু বলতে পার?

ওরা বাঙালী। কলকাতা থেকে এসেছিল।

ওদিকে 'বোল্ডার ভিলায়' তখন অন্যরকম পরিস্থিতি।

ত্রিলোকনাথ মনে মনে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছেন। যা হবার তা তো হয়ে গেল - এখন কতদিন এখানে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন। ব্যবসাপত্র আছে, এখানে আটকে থাকলে তো লোকসানের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলবে।

কিন্তু কিরণশঙ্করের মনের অবস্থার কথা ভেবে কিছু বলতে পারছেন না। স্ত্রীর শোচনীয় মৃত্যু কারুর পক্ষেই এত তাড়াতাড়ি পরিপাক করা সম্ভব নয়। তাছাড়া বলেই বা কি হবে? পুলিস তো এখুনি তাঁদের ছাড়তে চাইবে না।

বেলা তখন দুটো। গম্ভীর মুখে ড্রইংরুমে বসে আছেন মণীন্দ্রনাথ ও ত্রিলোকনাথ। অনেকক্ষণ ধরে দুজনের মধ্যে কোন কথাবার্তা হচ্ছে না। এই সময় থমথমে মুখে কিরণশঙ্কর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনিও মুখ বুজে বসলেন গিয়ে সোফায়।

একসময় ত্রিলোকনাথ বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, ওদের যদি কোম্পানির জরুরি কাগজগুলোই নেবার ইচ্ছে ছিল, মিসেস চৌধুরীকে খুন করতে গেল কেন?

কিরণশঙ্কর বললেন, আমিও তাই ভেবে চলেছি।

মাথা ঘামিয়েও আমরা কোন সমাধানে আসতে পারব না। মণীন্দ্রনাথ বললেন, দেখুন আমি পরিষ্কার কথায় আসতে চাই। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আমরা এখানে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বসে থেকে নিজেদের আখের নষ্ট করতে পারি না। কাজেই কেসের আশু সমাধানের জন্য আমি প্রাইভেট এনকোয়ারির পক্ষপাতি। আপনাদের কি অভিমত?

এই প্রস্তাবকে সঙ্গে সঙ্গে আর দুজন সমর্থন করলেন। তাঁরা যে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেননি, তা নয়। প্রাইভেট এনকোয়ারি করালেই সে হত্যাকারী ধরা পড়বে বা সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে, একথা জোর দিয়ে বলা না গেলেও চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই। দ্রুত আরো খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হল তিনজনের মধ্যে। তারপর তাঁরা আম্বাণ্টের সঙ্গে সাক্ষাত করবার জন্য পরেশনাথ রওনা হলেন। উদ্দেশ্য হল, অনুমতি নেওয়া ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে হিসারনগর এসে পৌঁছল সন্ধ্যার মুখে। অ্যাডভান্সের টাকা সঙ্গে নিয়ে সোমপ্রকাশকে ওর কাছে পাঠান হয়েছিল। সোমের মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ শোনার পর সাগ্রহে কেসটা টেকআপ করেছে ও। বেশি জট পাকানো কেস হাতে নিতেই বাসবের ভাল লাগে।

ওদের পথ দেখিয়ে এনেছে সোমপ্রকাশই। ট্রেন থেকে পরেশনাথে নেমে সোজা হিসারনগরে না এসে বাসব প্রথমে থানায় গেল। আলাপ-পরিচয় হল আম্বাণ্টের সঙ্গে। তিনি কি মনে ভাব নিয়ে বাসবকে গ্রহণ করলেন, বুঝতে পারা গেল না। যাই হোক, বাসব তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা করল এবং পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট ও সকলের এজাহারের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তারপর হিসারনগরের দিকে পা বাড়াল।

ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম করবার পর বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ড্রইংরুমে এল। ডিরেক্টর তিনজন তখন সেখানেই ছিলেন। প্রাথমিক কথাবার্তায় এইটুকুই বিশেষভাবে প্রকট হল, তিনজনই চান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুষ্কৃতিকারী ধরা পড়ুক এবং কলকাতায় ফিরে যেতে পারেন।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা পেলে আমি নিশ্চিতভাবে সাফল্য লাভ করব। এবার কাজের কথায় আসা যাক। আপনাদের এখান থেকে ধরে নিয়ে যাবার পর তারা একই ঘরে তিনজনকে বন্ধ করে রেখেছিল কি?

কিরণশংকর বললেন, না; তিনটে আলাদা কুঁড়েঘরে।

কতক্ষণ ওখানে বন্দী ছিলেন?

ঘড়ি অবশ্য দেখিনি। তবে এক ঘণ্টার কিছু বেশি হবে।

বাকি দুজন তাঁর কথায় সমর্থন জানালেন।

তারপর?

তারপর আবার আমাদের গাড়িতে চাপিয়ে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। তখন ওদের একজন বলেছিল, এই ঠাণ্ডায় এবার মজা করে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরুন।

আচ্ছা, আপনারা যখন বন্ধ ছিলেন, তখন বাইরে থেকে ওদের কোন কথাবার্তা কানে এসেছিল? বা আর কোন সন্দেহজনক বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল?

তিনজনই চিন্তা করতে লাগলেন।

শেষে ত্রিলোকনাথ বললেন, ঘরে বন্দী থাকার সময় ওদের কোন কথা আমি শুনিনি। তবে মোটরের শব্দ পেয়েছিলাম।

মোটর কোথাও গেল, এই তো? আবার ফিরে আসার শব্দ শুনেছিলেন বোধহয়?

হ্যাঁ।

এ কি দুজনও মোটরের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনেননি জানালেন।

পাইপ নিভে গিয়েছিল; বাসব আবার পাইপ ধরিয়ে নিল।

ওই দুজন লোককে আগে আপনারা কখনও দেখেছেন?

তিনজনেই মাথা নাড়লেন।

ওদের সম্পর্কে বিশেষ কোন কথা বলতে পারেন কিনা দেখুন।

তিনজন আবার চিন্তা করতে লাগলেন।

মণীন্দ্রনাথ এক সময়ে বললেন, আপনার কাজে লাগবে কিনা জানি না, একজন আরেকজনকে একবার বাব্বু বলে ডেকেছিল।

কেন, ওদের নাম আগে আপনারা শোনেননি?

খাঁসাহেবকে বাব্বু বলে ডাকতে শুনিনি। ওদের নাম স্বপন ও কেদার বলেই জানতাম।

বাসব ভ্রু কুঁচকে একটু ভেবে নিয়ে বলল, আপনারা সেদিন কি বিষয় নিয়ে মিটিং করেছিলেন? আর এক স্যুটকেশ দরকারী কাগজপত্রই বা এখানে কেন এনেছিলেন —আমাকে বিস্তারিত ভাবে সব বলুন তো।

কোন কিছু না লুকিয়ে তিনজনে পালা করে সমস্ত কথা বললেন।

আপনাদের কি মনে হয়, প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছেন না এমন কোন কোম্পানি এই কাজ করিয়েছে?

কিরণশঙ্কর বললেন, জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না।

মিনিট পাঁচেক নীরবতা বিরাজ করতে লাগল ড্রইংরুমে। শৈবাল জানে বাসব এখন মনের মধ্যে কোন একটি বিষয়কে গভীর ভাবে খেলিয়ে নিচ্ছে।

ত্রিলোকনাথ প্রশ্ন করলেন, আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া আর খুনের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আপনি দেখতে পাচ্ছেন?

এখনও পর্যন্ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তবে এই দুই ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক থাকলে আশ্চর্য হব না। ভাল কথা, মিস্টার চৌধুরী, আপনার স্ত্রীর অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন

কিরণশঙ্কর বললেন, আমার স্ত্রী অত্যন্ত দয়াশীলা মহিলা ছিল। দুঃস্থ মেয়েদের চিকিৎসা করাবার জন্য একটা নার্সিংহোম প্রতিষ্ঠা করেছিল। ওই নার্সিংহোম নিয়ে নিজেকে সব সময় ব্যস্ত রাখত।

তাঁর পরিচিতদের আপনি নিশ্চয়ই সকলকে চেনেন?

সকলকে চিনি একথা কিভাবে বলব বলুন? আমি ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, ও নিজের সেবার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ওর নার্সিংহোমে আমি কালেভদ্রে গেছি। যখনই গেছি, দেখেছি কোন অসুস্থ মেয়ের পাশে বসে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। আসল কথা কি জানেন, বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়াবার স্বভাব ওর ছিল না।

হুঁ, কাউকে সন্দেহ করেন?

সন্দেহ করার মত একজন লোককে তো আমি মনে মনে খুঁজছি।

বাসব শৈবালের দিকে তাকিয়ে বলল, ডাক্তার, এঁদের সেক্রেটারিরা নিজের নিজের ঘরেই আছেন বোধহয়। ডেকে নিয়ে এস তো—

শৈবাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মণীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন, আপনি আশার আলো কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

এত তাড়াতাড়ি কিছু আশা করাটা ঠিক হবে না। সকলের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করার পর সমস্ত কিছু তলিয়ে চিন্তা করতে হবে। তখনই আলো দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা।

এই সময় শৈবালের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করল সোমপ্রকাশ কুমার ও ললিত ঘোষ। তাদের সঙ্গে কথা বলে বাসব কিন্তু নতুন কিছু জানতে পারল না। পুলিসকে যা বলেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি করে গেল তারা! শুধু ললিত ঘোষের একটা কথা কাজে লাগাবার মত মনে হল।

ললিত বলল, এই ঘরে তখন গান-বাজনা হচ্ছিল। সে নিজের ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পায়, মংরুর ঘরের পাশ দিয়ে একজন লোক বাড়ির পেছন দিকে চলে যাচ্ছে। অদ্ভুত তার সাজপোশাক – দেখে আদিবাসী বলে মনে হয়।

ললিতের কথা শুনে ত্রিলোকনাথ বললেন, আমিও তাকে দেখেছি। সে তো মংরুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল—

বাসব বলল, আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল নাকি?

আমি তো ডেকে তার সঙ্গে কথা বললাম। কি যেন নাম বলেছিল ··জোসেফ মনে পড়েছে, জোসেফ হেমব্রাম।

বলেন কি! জোসেফ হেমব্রাম।—কিরণশঙ্কর বললেন, এই নামের একজন তো আমার স্ত্রীর নার্সিংহোমে চাকরি করে।

মণীন্দ্রনাথ বললেন, এই সময় তা হলে এখানে কি করছিল?

ত্রিলোকনাথ বললেন, এখানেই থাকে তো বলল আমায়। তার ভাগে নাকি আমাদের জমি চাষ করে—

মংরুকে ডাকা হয়। সে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিল জোসেফ হেমব্রাম নামে কাউকে চেনে না বা সেদিন সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে কেউ দেখা করেনি।

এরপর বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এল।

শৈবাল বলল, এবার কি করবে?

নীনাদেবীর সঙ্গে কথা বলে নিই চল।

সিলিংয়ের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুয়েছিল। ওদের দেখে নীনা উঠে বসবার চেষ্টা করল।

আপনি ব্যস্ত হবেন না, শুয়ে শুয়েই আমাদের সঙ্গে কথা বলুন।

বাসবের কথায় নীনা বালিশে মাথা রাখল।

কথাবার্তা চলতে লাগল। নীনার অধিকাংশ কথাই পুলিসের কাছে দেওয়া স্টেটমেন্ট থেকে আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল। বাড়তি কথার মধ্যে জানা গেল, সে রীণা সম্পর্কে সোমপ্রকাশকে যা বলেছিল, সেই কথাগুলি। অবশ্য সোমপ্রকাশের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা মোটেই প্রকাশ করল না।

আপনি সেই লোকটিকে দিদির সঙ্গে কোথায় দেখেছিলেন ?

এলগিন রোডের কাছে।

ঘটনাটা আমায় খুলে বলুন তো—

খুলে বলার মত কিছু নেই। একদিন আমি বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি দিদি একটা লোকের সঙ্গে যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে দিদিকে যেতে দেখে বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি ওর কাছে এগিয়ে যেতেই লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল। তখন আমায় দিদি বলল সব কথা।

হুঁ, আপনি ও র নার্সিংহোমে নিয়মিত যাতায়াত করতেন ?

না, বার তিনেক গেছি বোধহয়।

আপনাকে আর বিরক্ত করব না। আমরা চলি।

ওরা বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজেদের ঘরে আসতে পৌনে এগারটা বেজে গেল। বাসব পাইপ ধরিয়ে চেয়ারে বসে পা নাচাতে লাগল। শৈবাল বার কয়েক ওর মুখের দিকে তাকাল। বাসব একমনে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে। প্রশ্ন না করলে কিছু বলবে না জানা কথা।

কি রকম বুঝছ ?

অপরাধ-বিজ্ঞান কি বলে জান ? যে হত হয়েছে, তার সম্পর্কে গভীর ভাবে অনুসন্ধান চালালে নাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে ধরা সম্ভব হয়। বুঝলে ডাক্তার, রীণা চৌধুরীর সম্পর্কে একটু ভালভাবে খোঁজ-খবর নিতে হচ্ছে।

কেসটা কি তোমার জটিল বলে মনে হচ্ছে ?

জটিল বৈকি। দুটো বিষয় আলাদা আলাদা ভাবে চিন্তা করতে হবে। বাজিয়ে দুজন এঁদের ধরে নিয়ে যদি বা গেল, তবে ঐ ভাবে ছেড়ে দিল কেন ? তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল ? দ্বিতীয়—হত্যাকারী দুই বোনকেই খুন করতে চেয়েছিল, না অন্ধকারে ভুলক্রমে একটা গুলি নীনাদেবীর গায়ে লেগে গেছে ? না সে প্রকৃতপক্ষে নীনাদেবীকে খুন করতে চেয়েছিল, ভুলক্রমে রীণাদেবী মারা গেছেন ?

আমার মনে হয়, সে রীণাদেবীকেই খুন করতে চেয়েছিল। কারণ নীনাদেবী যে ও-ঘরে শোবেন তা আগে থেকে স্থির ছিল না, ভয় পাওয়ার দরুণ মাঝরাত্রে হঠাৎ তিনি গিয়ে পড়েছিলেন ! কাজেই—

মার্ভেলাস ডাক্তার ! তোমার এই অনুমানের মধ্যে জোরাল যুক্তি রয়েছে। সুতরাং আমরা হত্যাকারীর একমাত্র টার্গেট হিসাবে রীণা চৌধুরীকেই ধরে নিতে পারি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মোটিভটা কি ? তবে আশার কথা, ওই লোক দুটো সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কি ভাবে ?

যারা ভাল গাইয়ে-বাজিয়ে হয়, সাধারণত তারা গুণ্ডামি করতে যায় না। তবে কলকাতা বা অন্যান্য বড় শহরে এমন এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা ভাল গাইতে-বাজাতে পারে ; আবার প্রয়োজন হলে ছুরি চালাতেও পশ্চাৎপদ হয় না।

এই সমস্ত লোক নিষিদ্ধপল্লীর সঙ্গে সম্পর্কিত। পুলিস-দপ্তর থেকেই এ-কথা আমার জানা।

তা না হয় হল। কিন্তু কলকাতায় বহু নিষিদ্ধপল্লী আছে, তুমি লোক দুটোকে কিভাবে খুঁজে বার করবে?

আমার অনুমান যে কারেক্ট তা আমি বলতে চাই না। তবে ওই সমস্ত জায়গাতেই ওদের সাক্ষাৎ পাবার সম্ভাবনা আছে। এনায়েতকে তোমার মনে আছে?

কোন এনায়েত?

যার টেরিটিবাজারে মাংসর দোকান আছে?

ও, গুন্ডা এনায়েত যাকে তুমি একবার খুনের দায় থেকে বাঁচিয়েছিলে?

হ্যাঁ। লোকটা তারপর থেকেই আমার অনুগত হয়ে গেছে। 'বাজীব মার্ডার কেসে' আমাকে কিভাবে সাহায্য করেছিল, তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই। ওর কাছে গিয়ে খোঁজ-খবর নিলে বাব্বুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

অর্থাৎ তুমি কলকাতা যেতে চাও

মৃদু হেসে বাসব বলল, সম্ভব হলে কাল সন্ধ্যার দিকের কোন গাড়িতে। আর কথা নয় ডাক্তার, এবার বোধহয় আমাদের ঘুমের বাড়ি পাড়ি দেওয়া উচিত।

ইন্সপেক্টর আম্বাষ্ট বোল্ডার ভিলায় এলেন সকাল সাড়ে সাতটার সময়। বাসব কাল বলে এসেছিল তাঁকে আসতে। রীণা চৌধুরীর ঘরখানা একবার দেখা দরকার। পুলিসের সহযোগিতা না পেলে তো আর ও ঘরে ঢোকা যাবে না!

আম্বাষ্ট সীল ভেঙে দরজা খুললেন। ঘরে পা দেবার পরই মৃত্যুর শীতলতা অনুভব করা যায়। জানলাগুলো বন্ধ থাকায় আলো জেলে দেওয়া হল। বাসব তীক্ষ্ন চোখে দেখতে লাগল চারধার। সন্দেহজনক কিছুই নজরে পড়ল না।

চোখে পড়বার মত আসবাব খাট ছাড়া তার আছে ওয়ার্ডরোব। অবশ্য ড্রেসিং টেবিল আছে। যে জানলাটা সেদিন খোলা ছিল, সেটা পরীক্ষা করতেই একটা ব্যতিক্রম চোখে পড়ল। ছিটকিনি নেই। নেই মানে ছিল, পরে যে খুলে নেওয়া হয়েছে, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। হত্যাকারী বাগানে দাঁড়িয়েই যাতে কাজটা সেরে নিতে পারে, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

বাসব ওয়ার্ডরোব খুলে ভেতরটা একবার দেখে নেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল। ইন্সপেক্টর আম্বাষ্টের কাছে চাবি ছিল না। খোঁজ-খবর নিতে জানা গেল নীনার কাছ থেকে, রীণা চৌধুরী ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে চাবি রাখতেন। জায়গা মতই চাবি পাওয়া গেল।

ওয়ার্ডরোবে দামি জিনিসের মধ্যে আছে খুচরো কিছু গয়না, টাকা আর ভাঙানি মিলিয়ে দুশো চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা পাওয়া গেল। একটা তাকে বেশ কয়েকখানা শাড়ি রয়েছে। শাড়িগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিল বাসব। হঠাৎ একটা ভাঁজ করা কাগজের ওপর ওর দৃষ্টি পড়ল।

কাগজের ভাঁজ খুলে দেখল একখানা চিঠি। বাসব আড়চোখে দেখে নিল, ইন্সপেক্টর আম্বাষ্ট ভ্রূ কুঁচকে জানলার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এই বেসরকারী গোয়েন্দার কার্যকলাপে তিনি বিশেষ খুশি নন বুঝতে পারা যাচ্ছে।

বাসব দ্রুত হাতে চিঠিখানা পকেটস্থ করে ওয়ার্ডরোব বন্ধ করে সরে এল।

এ-ঘরে আমার কাজ শেষ হয়েছে।

আম্বাণ্ট কিছু বললেন না। জানলা বন্ধ করতে মনোযোগী হলেন। লনে বেতের চেয়ারে তিন ডিরেক্টার বসেছিলেন! শীতের সকালে রোদে পিঠ দিয়ে বসতে ভালই লাগে। বাসব ওঁদের সঙ্গে যোগ দিল। জানতে চাইল হেমব্রামের খোঁজে মংরু গেছে কিনা।

গেছে জানা গেল। স্থির হয়েছিল, আদিবাসী বস্তিতে গিয়ে মংরু হেমব্রামের খোঁজ করবে। পাওয়া গেলে তাকে ধরে নিয়ে আসবে এখানে। ঘর সীল করে এই সময় আম্বাণ্ট সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সাধারণ ভাবে দু চার কথা বলার পর বাসবকে ডেকে নিয়ে গেলেন দূরে!

ভারি গলায় বললেন, আপনি কি পদ্ধতিতে তদন্ত করছেন জানি না। আমি মোটামুটি একটা ডিসিশনে এসেছি।

তাই নাকি। কি ডিসিশন নিয়েছেন আমায় বলতে বোধহয় আপত্তি নেই?

আপত্তি কিসের? অনেক চিন্তা ভাবনার পর আমি নিশ্চিত হয়েছি, ওই তিনজন সেক্রেটারি ষড়যন্ত্র করে খুনটা করেছে। বুঝতেই পারছেন, এ একটা নারীঘটিত ব্যাপার। আজকালের মধ্যে ওদের গ্রেপ্তার করব ভাবছি।

তাহলে বলছেন, ডিরেক্টারদের লোপাটের সঙ্গে খুনের কোন সম্পর্ক নেই?

আমার তো তাই মনে হয়। লোক লাগিয়েছি বাজিয়ে দুজন ধরা পড়লেও কেসটাও সল্‌ভ হয়ে যাবে।

আপনি তো ব্যাপারটাকে একেবারে জল-ভাত্ত করে এনেছেন দেখছি। যাই হোক, আজ সন্ধ্যায় আমি কলকাতা যাচ্ছি। ফিরে না আসা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করবেন না। এই অনুরোধ উপেক্ষা করলে আপনি বেশ বেকায়দায় পড়ে যাবেন। জানেন না বোধহয়, আপনাদের উর্ধ্বতন মহলে আমার কিঞ্চিৎ খাতির আছে।

আম্বাণ্ট আর কিছু না বলে গম্ভীর মুখে জীপে গিয়ে বসলেন। বাসব ফিরে এল আবার আগের জায়গায়। সকলকে জানাল আজ সন্ধ্যাবেলায় কলকাতায় যাবে তদন্তের কাজে। সঙ্গে সোমপ্রকাশকে নিতে চায়। এই সময় মংরুর সঙ্গে জোসেফ হেমব্রামকে আসতে দেখা গেল। সেই একই ধরনের সাজপোশাক। নির্বিকার মুখ।

সকলের সামনে এসে এক লম্বা সেলাম ঠুকে কিরণশঙ্করের দিকে তাকিয়ে বলল, মেমসাহেব মারা গেছেন শুনে আমি খুব দুঃখিত স্যার। মাঝ থেকে এই গরীবের চাকরিটা গেল—

কিরণশঙ্কর বললেন, এই সময় তুমি এখানে কেন?

একটু বেড়াতে চলে এসেছি স্যার। আমার ভাগ্যে এখানে থাকে কিনা—

মেমসাহেবকে জানিয়ে এসেছিলে?

কই আর জানাতে পারলাম। তিনিও এখানে এসেছেন, আমিও কেটে পড়েছি। কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে স্যার—

ওর কথায় সকলে হেসে উঠলেন।

কিরণশঙ্কর বললেন, তোমার সাজপোশাকের এই অবস্থা কেন?

এখানে কাকে সাজপোশাক দেখাব স্যার। প্যুয়োরম্যানরা সব থাকে। ঠাকুরদার প্যাণ্ট-কোট পরে তাই চালিয়ে দিচ্ছি।

বাসব বিচিত্রদর্শন আগন্তুককে এতক্ষণ খুঁটিয়ে দেখছিল। এবার বলল, তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে। আমার সঙ্গে এস।

বক্তাকে হেমব্রাম চেনে না। তবু আদেশ লঙ্ঘন করতে সাহসী হল না। বাসবের পিছু পিছু চলল। পার্লারে পৌঁছবার পর বাসব বলল, আমি তোমার মেমসাহেবের খুনের তদন্ত করতে এসেছি। যা প্রশ্ন করব, তার ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। নইলে ভীষণ বিপদে জড়িয়ে পড়বে।

আমি তো বিশেষ কিছু জানি না স্যার, আমাকে নিয়ে টানাটানি করে কেন সময় নষ্ট করছেন?

ওভার চালাকি করবার চেষ্টা কর না। নার্সিংহোমে চাকরি পেয়েছিলে কিভাবে?

বছর দুয়েক আগে মেমসাহেব এখানে এলে আমি কেঁদে পড়েছিলাম চাকরির জন্যে। উনি আমায় চাকরি দিয়েছিলেন।

এই সময় শৈবাল এল পার্লারে।

সেদিন তুমি সন্ধ্যার পর এবাড়িতে ঢুকেছিলে কেন?

মংরুর সঙ্গে····

মিথ্যে কথা বল না। মংরু তোমাকে চেনে না। পুলিস স্বচ্ছন্দে তোমাকে গারদে পুরে রাখতে পারে। তোমার আচরণ অত্যন্ত সন্দেহজনক। এটা খুনের কেস মনে রেখ। একবার জড়িয়ে পড়লে সহজে কি রক্ষা পাবে ভেবেছ?

মুখের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারা গেল হেমব্রাম বেশ ভয় পেয়ে গেছে। তারপর ইতস্তত করে বলল, আমি মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আমি আর কিছু জানি না স্যার।

তোমাকে তো বাড়ির পিছন দিকে যেতে দেখা গিয়েছিল?

আমি মেমসাহেবের জানলার কাছে গিয়েছিলাম।

কি কথা হয়েছিল?

কথা স্যার? মানে····

মিস্টার হেমব্রাম, তুমি তোমার ভালর জন্যেই সঠিক উত্তরটা দেবে।

আমি তাঁকে একটা চিঠি পৌঁছে দিয়েছিলাম।

বাসব এই রকম উত্তর পেয়ে যেন খুশি হল। পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ঘনঘন কয়েকবার টানবার পর বলল, দীপঙ্কর লোকটা কে? - না, না, ইতস্তত করবার কিছু নেই। বল কে সে?

উনি মেমসাহেবের নার্সিংহোমের ডাক্তার।

পুরো নামটা কি?

দীপঙ্কর মিত্র।

জেরা করে আরো অনেক কথা হেমব্রামের মুখ থেকে বার করে নিল বাসব। জানা গেল, রীণা চৌধুরীর সঙ্গে দীপঙ্কর মিত্রর প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক ছিল। সেদিন মাঝরাত্রে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা করেছিলেন! তারপর

কখন তিনি বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন, হেমব্রাম তা জানে না। কারণ ওঁদের জঙ্গলের মুখে দেখা হবার পরই ও চলে গিয়েছিল।

ডাক্তার মিত্র এখানে আছেন?

দেখতে পাচ্ছি না তো। বোধহয় কলকাতা ফিরে গেছেন।

হেমব্রামকে বিদায় দিয়ে শৈবালের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বাসব বলল, ডাক্তার কি রকম বুঝলে?

ও কথার উত্তর দিয়ে শৈবাল বলল, তুমি দীপঙ্কর নামটা আবিষ্কার করলে কোথা থেকে?

ভাঁজ করা একটা কাগজ পকেট থেকে বার করে বাসব বলল, এটা পড়ে দেখ।

ভাঁজ খুলে চিঠিখানা পড়ল শৈবাল।

> রীণা,
>
> তুমি পনের দিন অনুপস্থিত থাকবে একথা মনে হতেই কলকাতায় আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আজই এসেছি। তুমি অবশ্য করে রাত সাড়ে এগারটার মধ্যে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে চলে আসবে। জোসেফ তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে আমার কাছে।
>
> নিশ্চয় আসা চাই।
>
> তোমার দীপঙ্কর

কি বুঝলে, ডাক্তার?

চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে শৈবাল বলল, মনে হচ্ছে, এই লোকটাকেই নীনাদেবী নিজের দিদির সঙ্গে দেখেছিলেন। এবং—

এবং দিদি ছোটবোনকে এক মনগড়া কাহিনী শুনিয়ে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন, লোকটা পিছু লেগে থাকায় তিনি অত্যন্ত আতান্তরের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।—এখন চল, একটু ঘুরে আসি।

কোথায়?

চলই না।

দুজনে 'বোল্ডার ভিলা' থেকে বেরুল। হেমব্রামের কাছ থেকে নির্দেশ নেওয়া ছিল। সেই মত কিছুক্ষণের মধ্যে গিয়ে পৌঁছল একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে। ঘরটা ছোট। খড় পাতা আছে মেঝেয়। একটা আধপোড়া মোমবাতির চারপাশে মোম জমা হয়ে রয়েছে। মোমের আলোয় আবছাভাবে আলোকিত এই ঘরে দীপঙ্কর মিত্র ও রীণা চৌধুরী কিছুক্ষণ কাটিয়ে গেছেন।

বাসব বলল, ডিরেক্টাররা যেখানে বন্দী ছিলেন, সেই ঘর তিনখানা দেখলে ভাল হত।

খোঁজাখুঁজি করলে সে তিনখানা ঘরও পাওয়া যাবে। চল না।

অনেকটা পথ যেতে হবে ডাক্তার। এখন থাক। কলকাতা থেকে ফিরে এসে যদি প্রয়োজন মনে করি, তাহলে যাওয়া যাবে।

এ-ঘরে কিছু পেলে?

কিছু পাব, এ আশা নিয়ে এখানে আসিনি। শুধু ঘরখানা একবার দেখতে চেয়েছিলাম। চল।

বাসব কলকাতায় পেঁছে সোমপ্রকাশকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বাড়িতে চলে এল। স্নান আহার সেরে, বেলা একটার সময় বেরুল দুজনে। হিসারনগর থেকে আসবার সময় শৈবালকে বলে এসেছে, চোখ যেন খোলা রাখে। হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীট থেকে টৌরিটিবাজার আর কতদূর। ওখানে পেঁছে রাধাবাজারের মোড়ে গাড়ি থামিয়ে বাসব নেমে গেল। পূর্ব ব্যবস্থা মত সোমপ্রকাশ রয়ে গেল গাড়িতে।

বাজারের নতুন বাড়িটা পেরিয়ে বাসব একটা গলিতে এসে পড়ল। কয়েক পা হেঁটে এসে থামল এনায়েত হোসেনের মাংসের দোকানের সামনে। এই অবেলায় দোকানে ক্রেতা থাকবার কথা নয়। চারধারে মাছি ভনভন করছে। এনায়েত কয়েক-জনের সঙ্গে দূরে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছিল। বাসবকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এল।

একগাল হেসে ডান হাতটা একটু তুলে বলল, সেলাম সাব।

ভাল আছ এনায়েত?

খোদার মেহেরবাণী। অনেকদিন পরে এলেন। আমি ভাবছিলাম গোলামকে ভুলে গেলেন বুঝি।

আরে না, না, তোমায় কখনও ভোলা যায়। একটা ব্যাপারে তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

হুকুম করুন?

বাস্বু বলে কাউকে চেন? বাজনা-টাজনা বাজায়।

এনায়েত ভ্রু কুঁচকে বলল, ওই নামে দুজনকে চিনি। বাস্বু ওস্তাদ আর বাস্বু গোঁসাই দুজনেই বাঈদের দালালী করে, আবার মুজরায় বাজায়ও।

ওই দুজনকে আমায় দেখিয়ে দিতে পার? বড় উপকার হয় তাহলে। শালারা খুনটুন করেছে নাকি?

না না, সেরকম কিছু নয়।

ওদের আমি দেখিয়ে দিতে পারি। তবে আপনি কি ওই নোংরা জায়গায় যেতে পারবেন?

ঠিক পারব। সাতটার সময় আসছি। তুমি কিন্তু কথাটা আর কাউকে বল না।

এনায়েতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসব গাড়িতে ফিরে এল।

আজ আপনার প্রচুর ভোগ আছে। সন্ধ্যা সাতটায় আবার আসতে হবে। এখন চলুন, লালবাজার ঘুরে আসি।

সোমপ্রকাশ বলল, আমার কোন অসুবিধা হবে না। কাজটা সুসম্পূর্ণ হলেই হল।

কাছেই লালবাজার। বাসব গাড়ির মুখ ঘোরাল। হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের সুবিখ্যাত মিঃ সামন্তকে অফিসেই পাওয়া গেল। বাসবকে তিনি সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করলেন। সোমপ্রকাশ আগেকার মতই গাড়িতে বসে রইল।

নিশ্চয় কোন প্রয়োজনে এসেছেন?

বাসব মৃদু হেসে বলল, তা আর বলতে। অবশ্য জানি, আপনি সাহায্য না করে থাকতে পারবেন না।

হাসতে হাসতে মিঃ সামন্ত বললেন, কিভাবে কাজ আদায় করতে হয়, তা আপনি ভালভাবেই জানেন। যাক, কি করতে হবে বলুন?

'বোল্ডার অ্যাণ্ড রুফ' কোম্পানির ক্যাশিয়ারকে জেরা করতে চাই। সঙ্গে একজন পুলিস কর্মচারি না থাকলে ভদ্রলোক আমার মনোমত কথাগুলো নাও বলতে পারেন। অবশ্য কাজটা বেআইনী হবে। তবে একটা জটিল তদন্তের অবসানের জন্য এই ধরনের নির্দোষ বেআইনী কাজ করা দোষনীয় নয়।

এরপর বাসব বিস্তারিতভাবে ঘটনাটা বলল।

সামন্ত ওর প্রস্তাবে রাজি হলেন। কথা রইল, কাল বেলা এগারটার সময় 'বোল্ডার অ্যাণ্ড রুফে' অভিযান চালানো হবে। বাসব লালবাজার থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসল। এবার ও বাড়ি ফিরবে।

ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে বাসব বসেছিল।

জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন দীপঙ্কর মিত্র। চল্লিশের কোঠায় সবে পা দিয়েছেন মনে হয়। গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী পুরুষ। চুল সামান্য পাতলা হয়ে এলেও ধারাল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

সেক্সপীয়ার সরণীতে এসে 'চৌধুরী নার্সিংহোম' খুঁজে বার করতে বাসবের বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়। ঠিকানাও হিসারনগরেই সংগ্রহ করেছিল। ইতিমধ্যে দীপঙ্কর মিত্রের সঙ্গে ওর অনেক কথাই হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে রীণা চৌধুরীর কি সম্পর্ক তা যে আর চাপা নেই, এবং তিনি যে হিসারনগরে গিয়ে এক গভীর রাত্রে মহিলাটির সঙ্গে দেখা করেছিলেন – এ-কথাও জানাজানি হয়ে গেছে, শোনার পর দীপঙ্কর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করেছিলেন।

তারপর যা বললেন তার সারমর্ম হল ঃ রীণার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন। যদিও তাঁদের দুজনের মধ্যেকার সম্পর্ক সামাজিক নিয়মে পবিত্র ছিল না। নার্সিংহোমে ডাক্তার হিসাবে যোগ দেবার পরই রীণা তাঁর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রথমে তিনি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে শক্ত করে রাখতে পারেননি। এই অবৈধ প্রণয়ের ভবিষ্যৎ কি এ নিয়েও তাঁদেব মনে কোন উদ্বেগ ছিল না। তাঁরা দুজনে দুজনকে কাছে পেয়েই খুশি ছিলেন। মাঝ থেকে কি মর্মন্তুদ ব্যাপার ঘটে গেল। সেদিন রাত্রে হিসারনগরে রীণার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল ঠিকই, তবে কোন হীন উদ্দেশ্য নিয়ে ওখানে যাননি গিয়েছিলেন হৃদয়তাড়িত হয়েই। হত্যাকারী ধরা পড়ুক তা তিনি চান, এবং এজন্য যে কোন রকম সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত আছেন।

আধ ঘণ্টাটাক বাসব নার্সিংহোমে রইল। এরপর কিছু জরুরী বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্তরের আদান প্রদান হল। বাসব বাড়ি ফিরে এল প্রায় সাড়ে ছটার সময়। সোমপ্রকাশ অপেক্ষা করছিল। সাতটার সময় আবার ওকে সঙ্গে নিয়ে এনায়েত হোসেনের কাছে যেতে হবে।

এনায়েত প্রস্তুত হয়েছিল। বাসব ও সোমপ্রকাশকে সঙ্গে নিয়ে বিডন স্ট্রীটের একটা সরু গলির মুখে এসে দাঁড়াল। অঞ্চলটা ভাল নয়। দুজনকে ওখানে দাঁড়াতে বলে এনায়েত ঢুকে গেল গলির মধ্যে।

ফিরে এল প্রায় আধঘণ্টা পরে। সঙ্গে দুজন লোক।

এদের মধ্যে কাউকে চিনতে পারছেন ?

সোমপ্রকাশ চিনতে পেরেছিলেন। বাসবের প্রশ্নের উত্তরে বলল, বাঁ ধারের লোকটা খাঁসাহেবের সঙ্গে সঙ্গত করেছিল।

এনায়েত এসে বলল, দুই বান্ধুকে সঙ্গে এনেছি সাব। কি কথা-টথা বলবার আছে বলে নিন।

একে যেতে বল।

যা বেটা গোঁসাই।

বান্ধু গোঁসাই চলে গেল। রইল বান্ধু ওস্তাদ।

এনায়েত আবার বলল, শোন শালা সাব যা জিজ্ঞেস করে তার ঠিক ঠিক উত্তর দিবি। নইলে তুই খুব ঝামেলায় পড়ে যাবি। আমায় চিনিস তো ?

বান্ধু ওস্তাদ বলল, ইনি কি পুলিসের লোক ? আমি তো

ভয় পাবার কিছু নেই। বাসব বলল, তবে আমার কথার সঠিক উত্তর না দিলে পুলিস তোমাকে গারদে পুরবে জেনে রেখ। তোমার কতকগুলো কথার ওপরই একটা খুনের কিনারা নির্ভর করছে।

আমি তো কোন খুনের কথা জানি না।

তুমি হিসারনগরে গিয়েছিলে খাঁসাহেবের সঙ্গে ?

আমি···মানে···

তোমার আর একজন সঙ্গী কোথায় ?

কার কথা বলছেন ?

যে তোমার সঙ্গে ওখানে গিয়েছিল ?

আপনি কি বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না তো ?

তুমি নিজেকে অতিমাত্রায় চালাক ভেব না, ইনি তোমাকে সনাক্ত করেছেন। খাঁসাহেব ও তাঁর দুই চেলা তোমাকে সনাক্ত করবে। হিসারনগরের ওঁরা সকলে তোমাকে সনাক্ত করবেন। তাই বলছিলাম, বিপদ যদি এড়াতে চাও তাহলে আমাকে সত্যি কথা বল। নইলে এনায়েতের সহযোগিতায় আমি তোমাকে লালবাজারে নিয়ে যেতে বাধ্য হব।

এবার বান্ধু ওস্তাদের মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল।

খুনটুনের কিছু জানি না, তবে আমি আর খোকা দাস ওখানে গিয়েছিলাম। অনেক টাকা পেয়ে গেলাম বলেই যেতে হয়েছিল। নইলে···

বাসব মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বলল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ সমস্ত কথা হওয়া ঠিক নয়। এস, ওই সামনের রেস্টুরেন্টটায়। এনায়েত, তুমিও এস। সোমবাবু, এবার আপনি নিজের বাড়ি চলে যান। কাল সকালে দেখা করবেন

সোমপ্রকাশ চলে গেল।

আর সকলে এগোল রেস্টুরেণ্টের দিকে।

পরের দিন প্রায় ঘণ্টা দশেক অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটল বাসবের। 'বোল্ডার অ্যাণ্ড রুফে'র ক্যাশিয়ারের সঙ্গে কথা বলে সে ছুটল ব্যাঙ্কে। পুলিসের সহযোগিতাতেই অবশ্য সেখানে ওর যেটুকু জানবার ছিল তা জানা সম্ভব হল। তারপর

গিয়েছিল টার্ফ ক্লাবে। ওখান থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে দেবীপ্রসাদের বাড়ি। দেবীপ্রসাদ রেসুড়ে মহলের একজন ঘোড়েল ব্যক্তি।

সোমপ্রকাশ বলল, আজ তাহলে যাওয়া হচ্ছে না।

রাত দশটা পর্যন্ত ট্রেন রয়েছে। অ্যাভেল করা যায়। তবে আজ আর যাব না। কাল সন্ধ্যার ট্রেনে গেলেই চলবে—

কাজ কি এখনও শেষ হয়নি?

হয়ে গেছে। বিশেষ কারণে অপেক্ষা করে যাব একদিন।

বাসব হিসারনগরে ফিরে এসে দেখল ডিরেক্টার তিনজনের মুখ বেশ গম্ভীর। তাঁরা ভেবেছিলেন, বেসরকারী গোয়েন্দা নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি সমস্ত কিছুর সমাধান হয়ে যাবে। কার্যক্ষেত্রে সেরকম কিছু না ঘটায় একটু বিরক্ত হয়েছেন।

বাসব তিনজনের মনের ভাব আঁচ করেছিল।

দুপুরের খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পর বলল, আপনারা আমার সম্পর্কে একটু নিরাশ হয়েছেন বুঝতে পেরেছি। তবে কি জানেন, এরকম একটা জটিল কেসের সমাধান তুড়ি মেরে করা যায় না। সময় একটু লাগবেই। তাছাড়া আমার স্বীকার করতে বাধা নেই, এরকম জটিল কেস আমি কমই হাতে পেয়েছি। কোন মূল্যবান সূত্র আবিষ্কার করাই হল কঠিন ব্যাপার এক্ষেত্রে…

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মণীন্দ্রনাথ বললেন, তার মানে আপনি এখনও পর্যন্ত কিছুই করে উঠতে পারেননি। আপনার সম্পর্কে আমাদের বেশ একটা উঁচু ধারণাই ছিল—

আপনাদের সেই ধারণার মূলে আমি ফাটল ধরিয়েছি—এতে ক্ষতি আমারই। যাই হোক, আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আর তিন-চারদিনের মধ্যেই আমি হেস্তনেস্ত কিছু করে ফেলতে পারব।

এই সময় সাইকেল সমেত পোস্টম্যানকে গেটের কাছে দেখা গেল।

বাসব আর ওখানে অপেক্ষা না করে দ্রুতপায়ে নিজের ঘরে গিয়ে পৌঁছল। শৈবালও এসেছিল পিছু পিছু।

তুমি কি সমস্ত আজেবাজে বকে এলে ও খানে?

পাইপ ধরাতে ব্যস্ত বাসব বলল, অবাক হয়ে গেছ, না?

তোমাকে না চিনলে অবাক হতাম না। কেসটা অত্যন্ত জটিল বলে তুমি শেষ পর্যন্ত হয়তো কিছুই করতে পারবে না, একথা বিশ্বাস করতে হবে?

তুমি আমাকে ভালভাবে চিনেও কেন অবাক হচ্ছ বুঝতে পারছি না। আসল কথা কি জান ডাক্তার, এত সহজ কেস আমি বহুদিন হাতে পাইনি। হত্যাকারী বেশি চালাকি করতে গিয়ে এত স্থূল সূত্র চতুর্দিকে ছড়িয়ে রেখেছে কি বলব। লোকটা নিশ্চয় ভেবে বসে আছে, সে এমন চাল চেলেছে যে তাকে কখনই ধরা সম্ভব হবে না।

তুমি তাহলে জান কে খুন করেছে?

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে মৃদু হেসে বাসব বলল, বাঃ, জানব না? তাহলে কলকাতায় গিয়ে এত ছুটোছুটি করলাম কি জন্যে। ওকথা থাক, এখন আমাদে

বেরুতে হবে ডাক্তার —

কোথায় ?

যে ঘরগুলোতে ডিরেক্টাররা বন্দী হয়েছিলেন, সেগুলো দেখে আসতে চাই। বাড়ির উত্তর দিকের রাস্তা ধরে কিছুদূর এগোলেই কুঁড়েগুলোর সন্ধান পাওয়া যাবে বলে শুনেছি।

দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে—

ত্রিলোকনাথ তখন অন্য দুজন পার্টনারকে বলছেন, আপনাদের অবশ্য খারাপ লাগবে, তবু আমার না বলে উপায় নেই। এখান থেকে রেহাই পেলেই আমি কোম্পানি ছেড়ে দিচ্ছি।

কিরণশংকর ও মণীন্দ্রনাথ - দুজনেই অবাক।

ছেড়ে দিচ্ছেন !!

হ্যাঁ। ভেবে দেখলাম, এইভাবে মিলেমিশে আমার পক্ষে ব্যবসা করা সম্ভব হবে না। আমি একলাই একটা ব্যবসা খাড়া করতে চাই। আমার শেয়ারে যা প্রাপ্য আপনারা তা বুঝিয়ে দেবেন।

কিরণশংকর বললেন, এ সমস্ত আপনি কি বলছেন ? জানেন তো' এই রকম দলাদলির দরুণ বাঙালিদের যৌথ ব্যবসা আর নেই বললেই চলে।

তাছাড়া আমরা জানতে চাই, আপনি কি কারণে কোম্পানি ছেড়ে চলে যাবেন ?

মণীন্দ্রনাথের কথায় ত্রিলোকনাথ গম্ভীর গলায় বললেন, ধরুন কারণটা ব্যক্তিগত—

তা বললে কি চলে ? একটা নামকরা কোম্পানিকে ভেঙে ফেলতে চাইছেন পার্টনারদের কারণ দেখাবেন না ?

নিতান্তই শুনতে চান ? ক্ষুন্ন হবেন না—আমি আপনাদের আর সহ্য করতে পারছি না।

অপমানে বাকি দুজনের মুখ কালো হয়ে উঠল।

গম্ভীর মুখে কিরণশংকর প্রশ্ন করলেন, আমাদের অপরাধ ?

কারুর অপরাধের হিসাব আমি দিতে পারব না। একথা তো স্বীকার করতেই হবে, কোম্পানিতে যে গোলযোগ দেখা দিয়েছে, তারজন্য নিশ্চিত ভাবে দায়ী আমরা ?

মণীন্দ্রনাথ বললেন, আপনার কথা শুনলাম, এবার আমার কথা শুনুন। কোম্পানিতে যে গোলযোগ দেখা দিয়েছে, তার পেছনে কার ফাউল প্লে আছে, তা আমি আন্দাজ করেছি। আপনি- আপনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কোটেশন লিক আউট করে কোম্পানিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেয়েছেন।

চিৎকার করে উঠলেন ত্রিলোকনাথ।

মুখ সামলে কথা বলবেন ! আর টাকা- ভুয়ো কোম্পানি ? এগুলোও কি আমার ঘাড়ে চাপাতে চান ?

একটা বিশ্রী ঝগড়ার অবতারণা হচ্ছে লক্ষ্য করে কিরণশংকর দুজনের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। কি থেকে কি দাঁড়াল পরিস্থিতি। অনেক বলে-কয়ে দুজনকে শান্ত করলেন। ত্রিলোকনাথ অবশ্য আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না। জোরে জোরে

পা ফেলে চলে গেলেন নিজের ঘরের দিকে।

দুপুর গড়িয়ে ক্রমে বিকেল হল।

শীতকালে এখানে বিকেলের আয়ু কম। সাড়ে পাঁচটার সময় মনে হয় গভীর সন্ধ্যা। ন'টা বাজতে না বাজতেই সকলে ডিনার সেরে নিলেন। তারপর আশ্রয় নিলেন যে যার ঘরে। আজ ঠাণ্ডাও পড়েছে অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি।

বাসব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, আজ ঘুমোবার আশা ত্যাগ কর ডাক্তার, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আমাদের বেরুতে হবে।

তা তো জানি। কিন্তু ভাই, এই ঠাণ্ডায়…

উপায় তো নেই। মহাপ্রভুর সাক্ষাত পেতে হলে এই ঠাণ্ডায় আমাদের অন্ধকার হাতড়াতেই হবে। আমাদের কিন্তু ঘর থেকে বেরুতে হবে বাথরুমের গরাদহীন জানলা দিয়ে।

কেন?

তাহলে ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ রাখা সম্ভব হবে। বুঝছ না, আমি চাইছি, কেউ যাতে বুঝতে না পারে যে আমরা ঘরে নেই। এই সাবধানতা অবলম্বন না করলে প্রতিপক্ষ সতর্ক হয়ে যাবে।

সময় অতিক্রম করে চলল।

বাসব পার্লারের দিকে জানলা ফাঁক করে ঠায় দাঁড়িয়েছিল। ঘড়ি মাস্টারে কাঁটায় কাঁটায় এগারটা লক্ষ্য করে জানলা বন্ধ করে সরে এল।

ডাক্তার?

ঘর অন্ধকার। শৈবালের তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সময় হয়ে গেছে?

হ্যাঁ, এখনও পর্যন্ত কাউকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখলাম না। চল, এইবেলা আমরা বেরিয়ে পড়ি—

গরম কাপড়ে শরীরকে আগে থেকেই মুড়ে রাখা হয়েছিল। দুজনে বাথরুমের জানলা টপকে বেরিয়ে এল বাগানে। সামনের গেটের দিকে ওরা গেল না, পেছন দিকে যে ছোট দরজা আছে, তাই দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

এ ক'দিনের থালার মত চাঁদ ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছোট হয়ে গেছে। আলোর আর তেমন তেজ নেই। ওরা এগিয়ে চলল। টপ টপ করে শিশির ঝরে পড়ছে গাছের পাতা থেকে। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটবার পর ওরা এসে থামল সেই কুঁড়ে তিনটের কিছু দূরে। একটা কুঁড়ের মধ্যে থেকে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

দুজনে তার কাছাকাছি গোটা কয়েক গাছের সঙ্গে গা মিলিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। অদ্ভুত নিস্তব্ধ চারধার। সময় আবার কেটে চলল। একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভাল লাগে না। মশার উপদ্রবও রয়েছে। কিন্তু উপায় কি?

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল এইভাবে।

মৃদু শব্দ হচ্ছে না? বাসব কান খাড়া করে রইল। পায়ের শব্দ। কেউ একজন আসছে। মিনিট কয়েক পরেই আবছা আলোর মধ্যে একজনকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ওভারকোটে তার সারা শরীর ঢাকা। মাথায় হ্যাট। ফেল্টের কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

ছায়ামূর্তি আলোকিত কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়াল। একবার চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ঢুকে গেল কুঁড়ের মধ্যে। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে বাসব ও শৈবাল দ্রুত এগিয়ে এল। ভেতরে তখন কথা চলেছে।

তোমাদের সঙ্গে আমার হিসাব শেষ হয়ে গেছে, আবার বিরক্ত করতে এসেছ কেন?

আমাদের সামান্য কিছু দিয়ে আপনি লক্ষ টাকার ওপর রোজগার করেছেন। কাগজগুলো জ্বালিয়ে ফেলিনি, সুটকেশ সমেত সঙ্গেই রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। আরো কুড়ি হাজার টাকা দেন ভাল, নইলে এই সুটকেশ আমি জায়গা মত পৌঁছে দেব।

আমাকে ব্ল্যাকমেল করছ?

আপনি যা ইচ্ছে ভেবে নিতে পারেন। টাকাটা এক হপ্তার মধ্যে পাচ্ছি কিনা তা আমার জানা দরকার।

আগন্তুক অল্প শব্দ তুলে হাসল।

আমাকে একটু বেশি আন্ডার এস্টিমেট করে ফেলেছ। টাকা পাওয়া তো দূরের কথা, ওই সুটকেশও তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। আমার হাতে কি দেখতে পাচ্ছ? তিনটে গুলি এই রিভলবার থেকে বেরিয়েছে, আরেকটা না হয় বেরুবে।

মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন। আমার কিছু হলে আপনি রেহাই পাবেন না, আমি একা এখানে আসিনি। বাইরে লোক আছে।

তারপরই আলোটা নিভে গেল। ঝটাপটির শব্দ হচ্ছে ঘরের মধ্যে। শৈবাল অধৈর্যভাবে বাসবকে ঠেলা দিচ্ছে, ও কিন্তু নির্বিকার। ওদিকে সুটকেশ হাতে নিয়ে আগন্তুক কুঁড়ের দরজার সামনে পৌঁছেই বাধা পেল। কে একজন তাকে ধরবার চেষ্টা করছে, আর উপায়ন্তর না দেখে—নির্জন রাত রিভলবারের শব্দে খান খান হয়ে গেল।

আক্রমণকারীর গায়ে গুলি লেগেছে কিনা বুঝতে পারা না গেলেও তাকে পড়ে যেতে দেখা গেল। আগন্তুক রাস্তায় পা না দিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। তৎক্ষণে চারধার জেগে উঠেছে। অনেক লোক ছুটোছুটি করছে আঁচ পাওয়া যায়। আগন্তুক অন্ধকার হাতড়ে কয়েক পা এগিয়েছে মাত্র খানপাঁচেক টর্চ ঝলসে উঠল চারধার থেকে।

বাসব বলল, পুলিসবাহিনী আপনাকে ঘিরে রয়েছে। গুলি ছুঁড়বেন না, রাইফেল আপনার শরীর ঝাঁজরা করে দিতে পারে। মিস্টার আম্বাণ্ট, আমার কাজ বোধহয় শেষ হয়েছে। ষড়যন্ত্র করে হত্যা করার অপরাধে আপনি কিরণশঙ্কর চৌধুরীকে স্বচ্ছন্দে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

কিরণশঙ্কর কিছু বলতে গিয়েও থামলেন। তার ডান হাত থেকে খসে পড়ল সুটকেশ। তারপর মুখ নিচু করে কি যেন বললেন বিড়বিড় করে। তৎক্ষণে ইন্সপেক্টর আম্বাণ্ট তাঁর হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে দিয়েছেন।

কামরায় ভিড় নেই বললেই চলে। দিনেরবেলায় প্রথম শ্রেণীতে রিজার্ভেশন

দরকার হয় না, তবু মাত্র পাঁচজনই যাত্রী আছেন। বাসব শরীরকে আরো একটু হেলিয়ে জানলার বাইরে তাকাল। তখন ঝড়ের বেগে ডাউন পাঠানকোট এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে।

শৈবাল বলল, এখনও মুখ সেলাই করে থাকবে, না আমার কৌতূহল দূর করবার চেষ্টা করবে—আমি জানতে চাই?

বাসব মৃদু হেসে বলল, মনে মনে চটেছ মনে হচ্ছে ডাক্তার? এমন কোন কেস আমার হাতে এসেছে কি যার নেপথ্য কাহিনী তোমায় শোনাইনি? এবার তাহলে আরম্ভ করা যেতে পারে, কি বল?

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ও বলতে আরম্ভ করল, আমরা আগেই অনুমান করতে পেরেছিলাম, হত্যাকারী ভুলক্রমে নীনাদেবীকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল, প্রকৃত উদ্দেশ্য তার ছিল রীণা চৌধুরীকে হত্যা করা। আমরা একথাও বুঝতে পেরেছিলাম, নিজের বোনের কাছে মিথ্যা কথা বলেছিলেন রীণা চৌধুরী, প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজের নার্সিংহোমের ডাক্তার দীপংকর মিত্রের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন এবং অনেক সময় হেমরাম তাঁদের যোগসূত্র ছিল। আমি চিন্তা করে দেখতে লাগলাম, হত্যা এবং বাজিয়ে দুজনের নাটকীয় কার্যকলাপের মধ্যে কোন যোগ আছে কিনা। রীণা চৌধুরী নিশ্চিতভাবে হত হয়েছেন কোন ঈর্ষাকাতর পুরুষের হাতে। এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে কাউকে সন্দেহ করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রথমে তাঁর স্বামীর কথা মনে পড়বে।

কিন্তু তিনি এ কাজ করবেন কিভাবে? তিনি তো সেই সময় বন্দী হয়েছিলেন আর দুজনের সঙ্গে অন্যত্র। বান্ধুকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে, এ নিয়ে আমাদের মধ্যে আগেই আলোচনা হয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় গিয়ে এনায়েতের সাহায্যে সহজেই সাক্ষাত পাওয়া গেল। তার সঙ্গে কথাবার্তা হবার পরই বুঝতে পারলাম, দুষ্কৃতকারী কি প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ের রোগে ভুগছে। তার ধারণা হয়েছিল, এই বিরাট দেশে পুলিস কোথায় খুঁজে বেড়াবে দুজন বাজিয়েকে। আর যদি কোনক্রমে আন্দাজ করে নেওয়া হয় তারা কলকাতার অধিবাসী, তাহলেও সত্তর লক্ষ লোকের মধ্যে থেকে দুজনকে খুঁজে বার করা কখনই সম্ভব হবে না। তাই সে নিজেকে আড়ালে না রেখে, বান্ধু আর খোকা দাসের সামনে উপস্থিত হয়ে কিভাবে কাজ করতে হবে বুঝিয়ে বলছিল।

বাসব একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগল, কিরণশংকর ওদের দিয়ে অফিসের কাগজপত্রগুলো চুরি করিয়েছেন, একথা জানার পর সমস্ত কিছু সরল হয়ে গেল। বান্ধু আরো একটা কথা বলেছিল। তাতেই আমি দুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পেলাম। ডিরেক্টারদের আলাদা আলাদা তিনটে কুঁড়েঘরে বন্ধ করে রাখার পর—পূর্বব্যবস্থা মত কিছুক্ষণ পরে কিরণশংকর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান। ফিরে আসেন প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে। তারপর তাদের তিনজনকে আবার গাড়িতে চাপিয়ে অনেক দূরে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়। বান্ধু বা খোকা দাস জানে না, তিনি আর দুজনের অলক্ষ্যে কোথায় গিয়েছিলেন।

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ, তিনি কোথায় গিয়েছিলেন? ধোকারটাটি ওখানেই। মিঃ চৌধুরী চমৎকারভাবে প্ল্যান ছকে ছিলেন এক চালে তিনি দুই বাজি

জতবেন। তাই আলাদা আলাদা ঘরে তিনজনকে বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা। মণীন্দ্রনাথ বা ত্রিলোকনাথ বুঝতেও পারলেন না, কিরণশঙ্কর ইতিমধ্যে নিজের চরিত্রহীনা স্ত্রীকে খুন করে এলেন। স্বাভাবিক নিয়মেই পুলিস বিভ্রান্ত হবে। দুটো ঘটনাকে তারা আলাদাভাবে বিচার করবে। কিরণশঙ্করকে খুনের দায়ে জড়ানো দূরের কথা সন্দেহ করাই চলবে না। তিনি তো সে সময় আর দুজনের সঙ্গে অন্যত্র বন্দী ছিলেন। ইতিমধ্যে অবশ্য আমি জানতে পেরেছিলাম, কেন তাঁর অতিরিক্ত টাকার দরকার হয়েছিল। দীপঙ্কর মিত্র অকপটেই রীণা চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের কথা স্বীকার করে নিলেন। কিছু জেরা করার পর জানতে পারলাম, রীণা চৌধুরী নাকি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন. তাঁর স্বামী আজকাল রেস খেলছেন এবং টার্ফক্লাবেও যাওয়া-আসা করেন।

বুঝতেই পারছ আমার টার্ফক্লাবে যেতে হল। ওখানে জানতে পারলাম, ওই লাইনের মহা ঘোড়েল দেবীপ্রসাদের সঙ্গে মিঃ চৌধুরীর মাখামাখি আছে। ঠিকানাও পাওয়া গেল। সঙ্গে পুলিসের লোক থাকায় সহজেই আমি দেবীপ্রসাদকে নার্ভাস করে তুলতে কৃতকার্য হলাম। তার মুখ থেকে জানা গেল, রেসের মাঠে ও বাইরে উন্মাদের মত বাজির পর বাজি ধরে কিরণশঙ্কর লাখ খানেক টাকা হেরেছেন কিছুদিনের মধ্যে। বাব্বু আর খোকা দাসকে সেই জোগাড় করে দিয়েছিল তার এক বন্ধুর সহযোগিতায়।

পাইপ কিছুক্ষণ আগেই নিভে গিয়েছিল। ধরিয়ে নিয়ে বাসব আরম্ভ করল, 'বোল্ডার অ্যান্ড রুফের' ক্যাসিয়ারের কাছ থেকে জানা গেল, গত কয়েক মাসের সমস্ত দরকারী কাগজপত্র নিয়ে কর্তারা হিসারনগর গেছেন। নিখুঁতভাবে কোন হিসাব তিনি দিতে পারবেন না। তবে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে কর্তারা সাসপেন্স একাউণ্টে টাকা নিয়ে থাকেন। সময় মতই সে সমস্ত টাকার হিসাব তাঁরা দাখিল করেন। কয়েক মাসের মধ্যে কিরণশঙ্কর বেশ মোটা মোটা অঙ্কের টাকা সাসপেন্স একাউণ্টে নিয়েছেন। হিসেব এখনও দেননি। কোন কোন ব্যাঙ্কে টাকা তিনি রাখেন সোমপ্রকাশের কাছ থেকে জানা গেল। সে সমস্ত জায়গায় খোঁজ নিয়ে দেখলাম, এক লক্ষ দূরের কথা, বিশ হাজার টাকাও তিনি ছ' মাসের মধ্যে তোলেননি। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম ব্যক্তিগত টাকায় হাত না দিয়ে তিনি কোম্পানির টাকা রেসের মাঠে নষ্ট করেছেন। কিরণশঙ্কর জানতেন এই কারচুপি চিরকাল চাপা থাকতে পারে না। সুতরাং তাঁকে সমস্ত ব্যাপারটাকে ওইভাবে ম্যানিপুলেট করতে হল।

শৈবাল এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, চুরির ব্যাপারটাকে তুমি বেশি প্রাধান্য দিয়েছ। খুন সম্পর্কে তো কিছু বলছ না।

এবার বলব। কিরণশঙ্কর কোম্পানির কাগজ কায়দা করে চুরি করিয়েছেন সন্দেহাতীত ভাবে তা প্রমাণিত হলেও, তিনি যে নিজের স্ত্রীকে খুন করেছেন, তা প্রমাণ করা যাচ্ছিল না। তাই কোন একটা প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য আমাকে জাল ফেলতে হল। আমি বাব্বুকে বললাম, অজান্তেই সে আর খোকা দাস খুনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে হত্যাকারীকে ধরার ব্যাপারে পুলিসকে সাহায্য না করলে তাদের দীর্ঘ মেয়াদী কারাবাস কেউ ঠেকাতে পারবে না।

পুলিসের পক্ষে থাকলে এবং পরে রাজসাক্ষী হলে মুক্তি কিম্বা সামান্য সাজার ওপর দিয়ে বিপদ কেটে যাবে। রাজি হওয়া ছাড়া বান্ধবের সামনে আর কে পথ খোলা ছিল না। কিরণশঙ্কর বলে রেখেছিলেন, সুটকেশ ভর্তি কাগজ পত্র যেন জ্বালিয়ে ফেলা হয়। তাই তারা করেছিল। আমি কিন্তু ওই কাগজ গুলোকেই টোপ হিসেবে গ্রহণ করলাম।

একটা চিঠি লেখা হল কিরণশঙ্করকে। যাতে বান্ধবু জানাচ্ছে, কাগজগুলে সে পুড়িয়ে ফেলেনি, কাছেই আছে। যে টাকা উনি দিয়েছেন তাতে তাদে মন ভরেনি। আরো টাকা তাদের চাই। এই সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবার জন্য কিরণশঙ্কর যেন আগামী অমুক দিন রাত বারটার পর হিসারনগরের অমুক জায়গায় উপস্থিত হন। বান্ধবুও কাগজ ভর্তি সুটকেশটা সঙ্গে নিয়ে যাবে তবে এ-কথাও জানিয়ে রাখা ভাল, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হলে সমস্ত কিছু চলে যাবে পুলিসের হাতে। কলকাতা থেকে একজন পুলিস কর্মচারির সঙ্গে বান্ধবুকে পরেশনাথ পাঠানো হল। চিঠি ওখান থেকে সে পোস্ট করে দিল কিরণশঙ্কর চিঠিখানা পেলেন পরের দিন। তারপর যা ঘটেছে, তা তো চোখের ওপরই দেখলে। চিঠি পেয়ে কিরণশঙ্কর নিশ্চয় প্রথমে ভড়কে ছিলেন, তারপর নিজেকে বাঁচাবার প্ল্যানটা খাড়া করে নেন। বান্ধবুকে (করে দিয়ে স্যুটকেশটা হাতিয়ে নিলেই তো ...মলা চুকে যায় আম্বাণ্ দলবল নিয়ে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থাকতে বলে রেখেছিলাম। চৌধুরী ওখা ধরা পড়ায় পুলিসের দুটি লাভ হয়েছে। এক - অন একশানে তিনি অ্যারে হলেন। দুই- তাঁর কাছ থেকে যে রিভলবারটা পাওয়া গেছে, পরী । করে জা যাবে ওই দিয়ে রীণা চৌধুরীকে খুন করা হয়েছে, এবং এ র্কেও নিশ্চিন্ত যে ওই রিভলবারের কোন লাইসেন্স নেই। কারণ নিজের নামে লাইসেন করা রিভলবার দিয়ে তিনি কখনই স্ত্রীকে খুন করার ঝুঁকি নেবেন না।

পাঠানকোট এক্সপ্রেসের গতি মন্থর হয়ে আসছে।

একেই বলে স্বখাত সলিলে।

এক্‌জ্যাক্টলি। জ্যোৎস্না-স্নাত নিরালা রাতে যখন স্বামীরা স্ত্রীদের আদ সোহাগে ভাসিয়ে দেয়, তখন কিরণশঙ্কর নিজের স্ত্রীর জীবন-দীপ নির্মমভাবে নিভিয়ে দিলেন। আমার কি মনে হয় জান ডাক্তার, পৃথিবীর শেষ দি পর্যন্ত সন্দেহ, ঈর্ষা, উপেক্ষা, অবজ্ঞা আর বোঝাপড়ার অভাবে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে অবিরাম খুন করে যাবে। যাক ও সমস্ত, বকে বকে গলা শুকিয়ে উঠল। ঝুঁকে দেখ তো কোন স্টেশন আসছে। চা খেয়ে নিতে হবে।

ট্রেনের গতি আরো মন্থর। প্ল্যাটফর্ম ছুঁয়েছে ইঞ্জিন।

গলা বাড়িয়ে দেখে নিয়ে শৈবাল বলল, ধানবাদ।